লোককবি লালন

লোককবি লালন

তপনকুমার বিশ্বাস

রায়-পণ্ডিত পাবলিকেশনস্

সূচীপত্র

পরিশিষ্ট :

লালন পরিচিতি ও লালনচর্চার সংক্ষিপ্ত ইতিহাস

লোকসাহিত্য গবেষণায় লালন শাহ্ এক অবিস্মরণীয় নাম। কিন্তু তাঁর ব্যক্তি জীবন রহস্যাবৃত। মানুষ মরণশীল হলেও যশের মন্দিরে অমর হয়ে থাকতে চায় প্রায় সকলেই। মাইকেল মধুসূদন দত্ত নিজের যশের প্রতি সন্দেহে, সংশয়ে ভেবেছিলেন—

"লিখিনু কি নাম মোর বিফল যতনে
বালিতে, রে কাল, তোর সাগরের তীরে?
ফেন-চূড় জল-রাশি আসি কি রে ফিরে,
মুছিতে তুচ্ছেতে ত্বরা এ মোর লিখনে?" ১

তিনি বঙ্গ-ভারতীর কাছে প্রার্থনাও জানিয়েছিলেন, 'রেখো, মা দাসেরে মনে।'

আর রবীন্দ্রনাথ চেয়েছিলেন আপন অনুরাগ-সিক্ত হৃদয়ানুভূতি শতবর্ষ পরের পাঠক-কবির চেতনায়, হৃদয়-স্পন্দনে যেন প্রতিধ্বনিত হয়ে ওঠে—

"তবু তুমি একবার খুলিয়া দক্ষিণ দ্বার
বসি বাতায়নে
সুদূর দিগন্তে চাহি কল্পনায় অবগাহি
ভেবে দেখো মনে—
একদিন শতবর্ষ আগে

সেদিন উতলা প্রাণে হৃদয় মগন গানে,
কবি এক জাগে—
কত কথা পুষ্প প্রায় বিকশি তুলিতে চায়
কত অনুরাগে
একদিন শতবর্ষ আগে।।" ২

মধুসূদন-রবীন্দ্রনাথের মতো লালন শাহ্ও কবি, ভাববাদী লোককবি। মানবপ্রেম, দর্শন-ভাবনা ও দেহসাধনার ত্রিবেণী সঙ্গমে, শতরঙে প্রস্ফুটিত হয়েছে তাঁর গানের কলি। তিনি 'কোন আলোকে প্রাণের প্রদীপ জ্বালিয়ে' ধরায় এসেছিলেন তা আমাদের উপলব্ধি করতে হবে, তাঁর কবি-প্রাণের প্রকাশের মধ্যেই। মধুসূদন-রবীন্দ্রনাথের মতো তাঁরও অমর হবার স্বপ্ন থাকা অস্বাভাবিক কিছু নয়। কিন্তু লালন ছিলেন অন্তর্মুখী, প্রচারবিমুখ— তাই তিনি কোথাও আপন ব্যক্তি-পরিচয় রেখে যাননি। ফলে পরবর্তী গবেষকেরা নানা মত পোষণ করেছেন এবং লালনের ব্যক্তি-পরিচয় জটিল থেকে জটিলতর হয়েছে। এই প্রসঙ্গে সুধীর চক্রবর্তী 'ব্রাত্য লোকায়ত লালন' গ্রন্থে বলেছেন—'১৮৯০ সালে প্রয়াত লালনের জীবন বিবরণ ও জাতি পরিচয় আজও কিন্তু সকলের

কাছে রহস্যাচ্ছন্ন। তিনি নিজেই আসলে এ বিষয়ে রেখেছিলেন একটা আড়াল। তাই লালন ফকিরকে নিয়ে গড়ে উঠেছে কল্পিত আখ্যান ও মিথ্। লোকায়ত এই গুহ্যসাধক সম্পর্কে শিক্ষত মানুষরা অনেক বই লিখেছেন, গল্প-উপন্যাস-নাটক লিখেছেন, তাঁর কল্পিত প্রতিকৃতি এঁকেছেন, বানানো পুঁথি লিখে মিথ্যা জীবন-কাহিনী প্রচার করেছেন। অন্যদিকে গবেষকরা লালনকে নিয়ে থিসিস লিখে ডক্টরেট করেছেন, কেউ কেউ তাঁর গান অনুবাদ করে বিশ্বময় ছড়িয়ে দিয়েছেন। কেউ তাঁব গানের খাতা নিয়ে ফেরৎ দেননি, কেউ আবার তাঁকে নিয়ে করেছেন ডকুমেন্টারি ফিল্ম। নদীয়া জেলায় গত এক দশক ধরে লালনজীবনী অবলম্বনে পুতুল নাচের দল তৈরি হয়েছে। লালনের ছেঁউরিয়া গ্রামের জীর্ণ সমাধি পাকিস্তান আমলে হঠাৎ ইসলামি সৌধে রূপান্তরিত হয়েছে সরকারি বদান্যতায়। সহসা এই অন্তর্মগ্ন গোপনচারী সাধকের গানে খোঁজা হচ্ছে ইসলামি পরম্পরা। কিন্তু আসল সত্য কোথায়? প্রকৃত লালন কে? তিনি জন্মসূত্রে হিন্দু না মুসলমান? তাঁর জন্ম বাস্তু কোথায়? তাঁর স্বকীয় গান ঠিক কোন্‌গুলি? এসব প্রশ্নের সংগত আর সর্ব-গ্রহণীয় মীমাংসা আজও মেলেনি। কেবলই এসব নিয়ে জট পাকিয়ে উঠেছে। অথচ তাঁর গানের ধারা বয়ে চলেছে লোকশিল্পীদের কণ্ঠে। ক্রমশই প্রতিভাত হচ্ছে লালনগীতির অন্তর্গত মানবতা, ধর্মনিরপেক্ষতা, গাঢ় উচ্চারণের মহিমা। তাঁর গানে নিম্নবর্গের প্রচ্ছন্ন প্রতিবাদ এবং জাতি-বর্ণ-ধর্মের বিরুদ্ধে দ্রোহ আধুনিক মানুষকে টানছে।"[৩]

আমরাও চাই, নিষ্ঠাবান গবেষকের দৃষ্টি নিয়েই লোকসাহিত্যে লালনের অবদান বিশ্লেষিত হোক। লালনের ব্যক্তি পরিচয় তারই অবতরণিকা।

বিশিষ্ট গবেষক উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য তাঁর 'বাংলার বাউল ও বাউল গান' গ্রন্থে লালনের জন্মকাল সম্পর্কে বলেছেন যে, "তাঁহার জন্ম হয় বাংলা ১১৮১ সালে, ইংরেজী ১৭৭৪ খ্রীষ্টাব্দে।" ড. শশিভূষণ দাশগুপ্ত, ড. আনিসুজ্জমান প্রমুখ বিশিষ্ট লালন বিশারদেরা এই মতই পোষণ করেছেন। ডঃ এস. এম. লুৎফর রহমানও গবেষণামূলক বিশ্লেষণ করে প্রমাণ করেছেন যে, 'বাঙলা ১১৮১ সালের ১লা কার্তিক (১৭৭৪ খ্রীষ্টাব্দের ১৭ই অক্টোবর) শুক্রবার লালন শাহ জন্মগ্রহণ করেন এবং বাঙলা ১২৯৭ সালের ১লা কার্তিক (১৮৯০ খ্রীষ্টাব্দের ১৭ই অক্টোবর) শুক্রবারে তাঁর মৃত্যু হয়। অদ্যাবধি আবিষ্কৃত লিখিত ও মুদ্রিত তথ্যের ভিত্তিতে লালনের প্রকৃত আয়ুষ্কাল ১১৬ বছর স্বীকার করেই মাত্র ঐ সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায়।"[৫]

কুষ্টিয়া লাহিনী পাড়া থেকে প্রকাশিত 'হিতকরী' পাক্ষিক পত্রিকায় ১৮৯০ খ্রীষ্টাব্দের ৩১শে অক্টোবর সংখ্যাতে লালনের মৃত্যু সংবাদ বেরিয়েছিল। পত্রিকাটির সম্পাদক ছিলেন মীর মশার্‌রফ হোসেন এবং শোনা যায় তা পরিচালনা করতেন রাইচরণ দাশ (মতান্তরে বিশ্বাস)। ঐ পত্রিকায় লালনজীবনী সম্পর্কে সম্পাদকীয় নিবন্ধে বলা হয়েছিল—"ইনি ১১৬ বৎসর বয়সে গত ১৭ই অক্টোবর শুক্রবার প্রাতে মানবলীলা সম্বরণ করিয়াছেন।"[৬]

লালনের জন্মস্থান ও জাতি পরিচয় নিয়েও নানা মত প্রচলিত আছে। একদলের মত,

লালন যশোর জেলার হরিশপুর গ্রামের অধিবাসী ছিলেন এবং জন্মসূত্রে মুসলমান ছিলেন। অন্যদের মত হল, লালন কুষ্টিয়া জেলার অদূরে ভাঁড়ারায় জন্মগ্রহণ করেন এবং তিনি হিন্দুসন্তান ছিলেন।

"Another renowned and the most melodious versifire, whose 'dhuyas' are the rage of the lower classes and sung by boat-men and others, was the far famed "Lalan Shah". He was a disciple of "Siraj Shah" and both were born at the village Harispur, Sub-Division Jhenidah, District Jassore."[7]

— লালনের জন্মস্থান সম্পর্কে এইরূপ মন্তব্য করেছেন মরহুম মৌলভী আবদুল ওয়ালী।

এস. এম. লুৎফর রহমান ১৯৬১ খ্রীষ্টাব্দের অক্টোবর মাসে যশোহর জেলার মাগুরা মহকুমার প্রৌঢ় ব্যক্তি জনাব আমিনউদ্দীন বিশ্বাসের—গ্রাম কুশখালি, ডাকঘর ছান্দরা, জেলা যশোর—কাছ থেকে একটা প্রাচীন খাতা সংগ্রহ করেন। সেখানে লালন শাহের পরিচিতি দেওয়া আছে স্পষ্টভাবে :

"শ্রী শ্রী লালন সা ফকির
সাং হরিশপুর—
কলম
জেলা যশোহর—
মলম
পিতার নাম মৃত্যু
দেয়নেত্ কাজী
লালন সা'র পরিবারের নাম
বিসখা
সাসড়ির নাম সৌরবী
গা, গা
সশুরের গোলাম সা।"

রহমান সাহেব দেখান, দুদ্দুশাহের রচিত পাণ্ডুলিপিতেও "লালন শাহকে বলা হয়েছে বংশানুক্রমিক মুসলমান।"[৮] তাই তিনি শেষ পর্যন্ত সিদ্ধান্তে আসেন—"অতএব নিঃসন্দেহে বলা যায়, লালন শাহের জন্মভূমি যশোহর জেলার ঝিনাইদহ মহকুমার হরিশপুর গ্রাম।"[৯]

কিন্তু সুধীর চক্রবর্তী তাঁর "ব্রাত্য লোকায়ত লালন" গ্রন্থে প্রমাণ করে দেখিয়েছেন যে লুৎফর রহমান আবিষ্কৃত দুদ্দুশাহের লেখা লালনজীবনী জাল। তিনি আরও বলেন যে লালনকে মুসলমান বলে চালানোর চেষ্টা হয় উদ্দেশ্য প্রণোদিতভাবে। তিনি বলেছেন—"লালনকে জন্মগত-ভাবে মুসলমান যাঁরা বলতে চান তাঁদের মধ্যে সবচেয়ে উচ্চকণ্ঠ যিনি সেই অধ্যাপক আবু তালিব তাঁর 'লালনচরিতের উপাদান : তথ্য ও সত্য' প্রবন্ধে ওয়ালীর মন্তব্য উদ্ধৃত করেছেন

খণ্ডিতভাবে। তাতে বড়জোর প্রমাণিত হয়েছে যে লালন ও সিরাজ সাঁই যশোহরের হরিশপুরের মানুষ। জন্মগতভাবে মুসলমান প্রমাণিত হয়নি, কেননা সেকথা তো ওয়ালী লেখেননি। আবু তালিব তাঁর 'লালন পরিচিতি' (১৯৬৮) বইতে আরেক কাণ্ড করেছেন। বইয়ের ৫ পৃষ্ঠায় ওয়ালীর উদ্ধৃতি দিয়েছেন এমনতর যদৃচ্ছ বিন্যাসে যে : 'he was a disciple of Serāj Shāh, and both were born at the village Harishpur, Sub-division Jhenāidha, District Jessore........where he died some ten years ago.

ওয়ালীর মূল উদ্ধৃতি বিচার করলে দেখা যাবে আবু তালিব... চিহ্ন দিয়ে যে ফাঁক রেখেছেন তাতে লেখা আছে—Having travelled long and made pilgrimages to Jagannath and other Shrines, and met with all sorts of devotees, he at last settled at Mauza Siuriyā, near the sub-divisional headquarter of Kushtiya (Nadya). Here he lived, feasted sang and worshipped and known as a Kayastha and where he died some ten years ago.

অধ্যাপক তালিবের অভিসন্ধিমূলক অনুদ্ধৃতি কী ভয়ানক উদ্দেশ্য বহন করেছে! তাঁর খণ্ডিত উদ্ধৃতি অনুসরণ করলে তো মনে হবে লালনের মৃত্যুও হয়েছিল যশোহরের হরিশপুরে। তাই নয় কি?

এইসব দেখে সন্দেহ হওয়া স্বাভাবিক যে ১৮৯০ সালে প্রয়াত লালন ফকির সম্পর্কে হঠাৎ ১৯৫৩ সাল থেকে যে আবু তালিবদের উৎসাহিত হতে দেখা গেল তার প্রকৃত উদ্দেশ্য অন্য কিছু নয়তো? খুব তলিয়ে বিচার করলে দেখা যাবে —১৯৫৩ সাল নাগাদ তাঁকে মুসলমান বলে দাবি ওঠে; ১৯৬৩ সালে লালনের খড়ে ছাওয়া দীন সমাধি বৃহৎ সৌধে রূপান্তরিত হয় ইসলামি আদলে এবং ১৯৬৭ সালে এস. এম. লুৎফর রহমান হঠাৎ প্রকাশ করেন একখানি কলমী পুঁথি. 'লালন চরিত'। এই 'লালন চরিত' পয়ারে লেখা ১৪৮ পংক্তির লালনজীবনী, রচয়িতা লালনশিষ্য দুদ্দু শাহ। তাতে লালনের মুসলমানিত্ব, সিরাজের শিষ্যত্ব গ্রহণ, পিতামাতার নাম. হরিশপুরের জন্মসূত্র সবই সুচারুভাবে সংগ্রথিত। অনেকের মতে পুঁথিটি জাল।"[১০]

লালন শাহের জন্মস্থান সম্পর্কে উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য বলেছেন—"কুমারখালি থানার অধীন কুষ্টিয়া হইতে চারপাঁচ মাইল দক্ষিণপূর্ব কোণে গোরাই নদীর তীরবর্তী ভাঁড়ার গ্রামে লালনের জন্ম।"[১১]

বসন্তকুমার পাল 'ফকির লালন শাহ'তে দেখিয়ে দিয়েছেন যে লালনের জন্ম ভাঁড়ারা বা ভাণ্ডারিয়া গ্রামে। সুধীর চক্রবর্তী বলেছেন যে "লালন সম্পর্কে বসন্তকুমারের প্রদত্ত বিবরণ ও মতামত খুব গুরুত্বপূর্ণ এইজন্য যে পরবর্তী কালের লালন-গবেষকদের মধ্যে গরিষ্ঠসংখ্যক ব্যক্তি তাঁর পরিবেশিত তথ্যকে প্রামাণিক বলে মেনে নিয়েছেন। ঐতিহাসিকভাবে একথাও উল্লেখযোগ্য বসন্তকুমারই সর্বপ্রথম লালন সম্পর্কে জনশ্রুতি ও কিংবদন্তীর ধূসর পর্যায়গুলির মধ্যে একটা ঘটনাবিন্যাসের স্পষ্টতা এনে তাঁর জীবন বিবরণের সম্পূর্ণতা সাধন করেন।"[১২]

বসন্তকুমার পালের প্রদত্ত লালনজীবনীকে সমর্থন করেছেন মনসুরউদ্দীন। তাঁর রচিত

লালনজীবনী সংক্ষেপে নিম্নরূপ :

"লালন ফকির অবিভক্ত নদীয়া জেলার কুষ্টিয়ার অন্তর্গত কুমারখালিসংলগ্ন গড়াই নদীর তীরে ভাঁড়ারা (চাপড়া-ভাঁড়ারা) গ্রামে জন্মান। তাঁর জন্ম কায়স্থ পরিবারে, পদবী কর (মতান্তরে রায়)। বাবা-মার নাম মাধব ও পদ্মাবতী। বাবা-মার একমাত্র সন্তান লালন শৈশবে বাবাকে হারান এবং সেই কারণে বিধিবদ্ধ বৈদ্যালয়িক শিক্ষা পাননি। তাঁর মাতুল বংশ ছিল চাপড়ার ভৌমিকরা। দুই গ্রামেই ছিল লোক ঐতিহ্যের সগর্ব পরম্পরা এবং গানের ধারা। ছোটবেলা থেকে লালন ভালবাসতেন গানবাজনার পরিমণ্ডল বিশেষত কীর্তন ও কবিগান। ধর্মভাবও ছিল স্বভাবগত। অল্প বয়সে পিতৃহীনতার ফলে লালন অকালেই সংসারে জড়িয়ে পড়েন এবং বিবাহিত হন। কিন্তু আত্মীয়-পরিজনদের সঙ্গে বিরোধ বিতর্কে বিরক্ত হয়ে স্ত্রী এবং মাকে নিয়ে নিজের গ্রামেই দাসপাড়া অঞ্চলে আলাদা বাসস্থান বানান।

পরবর্তী কোনো সময়ে দাসপাড়ার সঙ্গীসাথীদের নিয়ে তিনি বহরমপুরে গঙ্গাস্নানে যান এবং বাড়ি ফেরার পথে আক্রান্ত হন বসন্ত রোগে। আচ্ছন্ন ও অচৈতন্য লালনকে ফেলে সঙ্গীদল সম্ভবত রোগের ভয়ে পালিয়ে আসেন গ্রামে এবং লালনের মৃত্যুর খবর রটিয়ে দেন। তাঁরা হয়ত লালনকে মৃত মনে করে নদীর জলে ভাসিয়ে দিয়েছিলেন।"

এরপর লালনের জীবনে এল অভিনব রূপান্তর, "মৃতকল্প সংজ্ঞাহীন লালনের দেহ নদীর কূলে ভাসমান দেখতে পেয়ে একজন স্নেহশীলা মুসলমান নারী উদ্যম করে তাঁকে নিজের ঘরে নিয়ে গিয়ে সেবা করে বাঁচিয়ে তোলেন। কেবল বসন্তরোগ রেখে যায় তার দাগ। কিন্তু আরও বড় হৃদয়ক্ষত লালনের জন্য অপেক্ষা করছিল। সুস্থ হয়ে নিজের গ্রামে ফিরে সমাজের শাস্ত্র-কঠোর নির্দেশে নিজের পরিবারে লালন স্থান পেলেন না, কেননা বাড়ীতে তাঁর শ্রাদ্ধকার্য হয়েছে এবং তিনি মুসলমানের অন্ন খেয়েছেন। ব্যথিত সন্তপ্ত লালন জাতি ধর্ম সম্পর্কে আস্থা হারালেন। ক্রমে সিরাজ শাহ্ নামে এক তত্ত্বজ্ঞের কাছে লোকায়ত মতে দীক্ষা নিয়ে সব রকম সাম্প্রদায়িক ধর্ম সম্পর্কে অনুৎসাহী হয়ে পড়েন। পরে সিরাজের নির্দেশে কুষ্টিয়ার সন্নিহিত ছেঁউড়িয়া গ্রামে ১৮৮৩ সাল নাগাদ আখড়া বানান। আশপাশের কারিকর সম্প্রদায় তাঁকে বরাবর পোষকতা করেছেন। নিভৃত সাধনা ও ঐশী অনুভবের নির্জনতায় লালন একরকমের সিদ্ধতা অর্জন করেন, যার রূপায়ণ হতে থাকে অন্তরস্বভাবী বহুতর নিগূঢ় মর্মের গানে। হিন্দু মুসলমান দুই তরফ থেকেই শিষ্যসেবক জুটতে থাকে। লালন পূর্ব ও উত্তরবঙ্গের নানা অংশে ভ্রমণশীল হন। বাউল বা মারফতি সাধকরূপে তাঁর বিপুল জনপ্রিয়তা ঘটে। অবশেষে ১৮৯০ সালে তাঁর তিরোধান ঘটে।"

লালন কোন জাতির লোক ছিলেন? এ প্রসঙ্গে মুহম্মদ আবু তালিব বলেছেন, "লালন শাহ শুধু মুসলিম সন্তানই ছিলেন না তিনি বংশানুক্রমে মুসলমান ছিলেন।"[১৩]

আর, লুৎফর রহমান প্রমাণ করেছেন যে, "লালন মুসলিম বংশোদ্ভূত ছিলেন।" তিনি বলেছেন যে, দুদ্দুশাহ লিখেছেন—

'দরীবুল্লাহ দেওয়ান তাঁর আব্বাজীর নাম।

আমিনা খাতুন মাতা এবে প্রকাশিলাম।' আরো নানা তথ্যসূত্র উল্লেখ করে তিনি সিদ্ধান্তে

এসেছেন—"অতএব, ভণিতা-বিশ্লেষণ, দুদ্দুশাহের বিবরণ, নবদ্বীপের ঘটনা, লালন পরিচিতির বর্ণনা, দানপত্রের উল্লেখ, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের অঙ্কিত চিত্রের ইঙ্গিত, বসন্তকুমার পালের অভিযোগ, সর্বোপরি লালন শাহের স্বরচিত ও শিষ্য বিরচিত কবিতার ভণিতা-রীতি এবং জীবন-যাপন প্রণালী থেকে নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হয় যে—লালন শাহ মুসলিম-সন্তান ছিলেন।"[১৮]

কিন্তু দুদ্দুশাহের নামে প্রচলিত লালনজীবনী নির্ভরযোগ্য নয়—সুধীর চক্রবর্তী তা প্রামাণ করে দিয়েছেন। আর লালনজীবনীকার মতিলাল দাশ *"মুরশিদ বিনে কি ধন আর আছে রে মন এ জগতে"*— গানটি আলোচনা কালে বলেছেন যে—"এই কবিতায় মুসলমান ধর্মের অনেক রীতিনীতি উল্লেখ আছে কিন্তু লালন মুসলমান ছিলেন বলিলে ভুল হইবে।...... লালন ফকির হওয়ার পূর্বে হিন্দু ছিলেন এবং পরে সিরাজ সাঁই দরবেশের নিকট দীক্ষিত হন।... কিন্তু আসলে তিনি মুসলমান নন। (কারণ).... তাহার সাধনায় নমাজের স্থান নাই।"[১৫]

আর লালনের বংশ পরিচয় সম্বন্ধে বসন্তকুমার পাল 'ফকির লালন শাহ'-তে বলেছেন,—"সাঁইজী কায়স্থকুলে জন্মগ্রহণ করেন।... সাঁইজীর জননীর নাম পদ্মাবতী এবং মাতামহের নাম ভস্মদাস। ....সাঁইজীর বাল্যনাম লালন দাস।"[১৬]

তাছাড়া লালনকে মুসলমান মনে করা হলেও তিনি নিষ্ঠাবান মুসলমান ছিলেন না। এ প্রসঙ্গে মওলানা রেয়াজউদ্দীন আহমদ বলেছেন যে—"তিনি মোছলমানের অন্নভোজন ব্যতীত এছালাম গ্রহণ করেন নাই বা মোছলমান বলিয়া নিজেকে স্বীকার করেন নাই বা এছলামের আবিদা, বিশ্বাস ও নামাজ-রোজা প্রভৃতির কোন চিহ্নই কিম্বা আচার ব্যবহার কিছুই তাঁহার মধ্যে বর্তমান ছিল না, যদ্দ্বারা তাঁহাকে মোছলমান বলা যাইতে পারে। তিনি মোছলমানের হোলিয়া অনুসারে মোছলমানের দরবেশ ফকির হওয়া দূরে থাক, একজন মোছলমান বলিয়াও পরিগণিত হইতে পারেন না। তিনি যত বড়ই মুনি ঋষি উদাসীন হউন না কেন, মোছলমানের তিনি কেহই নহেন। ....সুতরাং বাউল বা নাড়ার ফকিরগণ যে লালন শাহকে মোছলমানের সেরা পীর দরবেশ বলিয়া তাঁহার পদাঙ্ক অনুসরণ করতঃ মোছলমানের দরবেশ ফকিরের দাবী করিয়া দুনিয়াটাকে তোলপাড় করিয়া তুলিয়াছেন ইহা তাঁহাদের সর্বৈব পথভ্রষ্টের পরিচয় মাত্র।"[১৭]

লালন শাহের জীবদ্দশাতেই লালন বিরোধী আন্দোলন শুরু হয়ে গিয়েছিল। তিনি হিন্দু মুসলমান উভয় ধর্মের লোকের কাছেই লাঞ্ছনা-গঞ্জনা, ঘৃণা, নিন্দা ও শত্রুতামূলক আচরণই লাভ করেছিলেন। মুসলিম সমাজে তিনি যে ঠাঁই পাননি সে বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন আবুল আহসান চৌধুরী। তিনি বলেছেন—"বাউল ধর্ম বাংলার জনপ্রিয় লোকধর্ম। সর্বাপেক্ষা জনপ্রিয় বললেও বোধ করি অত্যুক্তি করা হয় না, অথচ এই জনপ্রিয় লোকধর্মকে লোকমানসপট থেকে মুছে ফেলার জন্য বিভিন্ন সময়ে অনেক চেষ্টা করা হয়েছে। এই কারণে বাউল সম্প্রদায়ের লোকদের সমাজে বিচ্ছিন্নভাবে অনাদৃত ও নিঃগৃহীত হতে হয়েছে। বাউলরা শরিয়ত পন্থী মুসলমান ও হিন্দু ধর্মাচারীদের দ্বারা যুগপৎ উৎপীড়িত হয়েছেন। এই বিরোধিতা ও নিগ্রহের দু'টি প্রধান কারণ হল—বাউলদের প্রভাবে শাস্ত্রশাসিত ধর্মানুশাসনকারীদের সংখ্যা হ্রাস এবং সেই হেতু

মোল্লা মৌলবী পুরুতদের সার্বভৌম প্রতিষ্ঠা প্রতিপত্তি ক্ষয়। প্রথম কারণটি ধর্মীয়; দ্বিতীয় কারণটি অর্থনৈতিক। বাউল বিরোধী আন্দোলনে এযাবৎ মুসলমান ধর্ম ও সমাজসংস্কারক এবং মোল্লা মৌলবীরাই মুখ্য ভূমিকা পালন করে এসেছেন। বাউল ধর্মে দীক্ষিতদের মধ্যে মুসলমান ধর্মাবলম্বীদের সংখ্যাধিক্য এবং বাংলার প্রখ্যাত বাউলদের অধিকাংশই মুসলমান সম্প্রদায়ভুক্ত হওয়ায় এর কারণ। যদিও বাউলদের মধ্যে হিন্দু ও মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের লোকই দেখা যায়।"[১৮]

আহসান চৌধুরী আরো বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছেন যে "বাউলরা ভাব বিদ্রোহী। তারা আচারিক ধর্মকে অস্বীকার ও বর্জন করে সহজ সাধনায় ব্রতী হয়েছে। শাস্ত্র তাদের পরিচালিত করেনি, হৃদয় তাদের পথ দেখিয়েছে।.... জাতিভেদ, ছুঁৎমার্গ ও ধর্মীয় আভিজাত্য নিম্নশ্রেণীর মানুষকে বিশেষভাবে পীড়িত ও ব্যথিত করে তুলেছিল। তাই সহজেই তারা সহজিয়া সাধনার প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পড়ে। ....সনাতন শাস্ত্র আচার ও প্রচলিত সমাজ ধর্মের বিরুদ্ধে তারা বিদ্রোহ ঘোষণা করেছে। সম্প্রদায় ধর্মের প্রাচীর ভেঙে তাঁরা পেয়েছে এক উদার মিলন ময়দানের সন্ধান। সমাজ ও ধর্ম থেকে স্বেচ্ছা বিশ্লিষ্ট এই সাধক সম্প্রদায়ের একতারায় ধ্বনিত হয়েছে শাস্ত্রমুক্তির সুর।"[১৯]

আসলে লালনকে কোন সংকীর্ণ গণ্ডীর সীমাবদ্ধ পরিসরে বিচার করা ঠিক হবে না। 'হিন্দু না ওরা মুসলিম'—এই দৃষ্টিতে না দেখে লালনকে আমরা যথার্থ মানবতার দূত হিসাবেই গণ্য করতে পারি। ধর্মসাধনা তাঁর অন্তর্দৃষ্টি খুলে দিয়েছিল। তাই হিন্দু-মুসলমান, বৌদ্ধ-ব্রাহ্ম কোন গণ্ডীতেই তাঁকে বাধা যায় না। তিনি আসলে বিশ্বপ্রেমের আলোকবর্তিকা—মহামানব, মহাকবি। অন্নদাশঙ্কর রায় বলেছেন—"নিঃসন্দেহে লালন বাউল কবিদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। শতবর্ষ ধরে নিবিড়ভাবে অন্তরের প্রেরণায় গান রচনা করে গেছেন, গান গেয়ে গেছেন, এমন মানুষ কি দ্বিতীয় কেউ আছেন আমাদের ইতিহাসে?"[২০]

তাই ভাঁড়ারা বা হরিশপুর নয়, হিন্দু বা মুসলমান নয়, আমরা লালনের মূল্যায়ন করব কবি হিসাবে। আর তা করতে গিয়ে লালনের ব্যক্তি জীবনেরও বিস্তারিত বিশ্লেষণের প্রয়োজন আছে বলে মনে হয় না। কারণ, কবিরে খুঁজো না তাঁর জীবনচরিতে—এ ঋষি বাক্য আমরা জানি; তবুও ইতোপূর্বে বহু গবেষক লালনের জীবনী নিয়ে বিস্তারিত গবেষণা করেছেন—কেউ কেউ তা থিসিস্ হিসাবে দাখিল করে ডক্টরেট ডিগ্রীও লাভ করেছেন। কিন্তু আমরা লালনের জীবনচরিতের অরণ্যে দিশেহারা না হয়ে, তিনি কিভাবে 'অচিন পাখি' ধরার কাব্যজাল রচনা করেছেন তারই সূক্ষ্ম রস-বিশ্লেষণ দেবার চেষ্টা করব। ব্যক্তি কবি নয়; তাঁর সৃষ্টিই আমাদের আলোচ্য। কেননা আমরা জানি সংসার আমাদের কর্মকেই গ্রহণ করে ব্যক্তিকে নয়। রবীন্দ্রনাথ দেখিয়েছেন যে 'সোনার তরী' আমাদের 'সোনার ধান'-কেই গ্রহণ করে; আমাদের নয়। ব্যক্তি-কবি যখন বলেন--'এখন আমারে লহো করুণা করে' তখন মাঝি স্পষ্টই জানিয়ে দেয়—"ঠাঁই নাই, ঠাঁই নাই-ছোটো সে তরী।"[২১] ব্যক্তি, শূন্য নদীর তীরে পড়ে থাকে, তাঁর সৃষ্টি অমর হয়। তাই ব্যক্তি লালন নয়;

স্রষ্টা লালনের কবিকর্মই আমাদের কেন্দ্রীয় আলোচ্য বিষয়।

লালন তাঁর জীবদ্দশাতেই বেশ জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিলেন। তাঁর গানের সুর ও বাণী সমসাময়িক রসিক জনের হৃদয়-মন লুঠ করে নিয়েছিল। তাই লালনের প্রসঙ্গ আলোচিত হয়েছে নানাস্থানে, নানাভাবে।

কাঙাল হরিনাথের রচনাতেই প্রথম লালন শাহের উল্লেখ পাওয়া যায়। 'গ্রামবার্তা প্রকাশিকা' নামক সাপ্তাহিক পত্রিকায় 'জাতি' নামক সংবাদ নিবন্ধে হরিনাথ লিখেছেন :

"সকলেই ব্রাহ্ম ও ধর্মসভার নাম শুনিয়াছেন। গৌরসভা নামে নিম্ন শ্রেণীর লোকেরা আর এক সভা স্থাপন করিয়াছে। ইহার নির্দিষ্ট স্থান নাই। গৌরবাদী বক্তা এক ২ পল্লীগ্রামে উপস্থিত হইয়া, সভা করিয়া গৌরাঙ্গের চরিত ও লীলাদী বর্ণনা করে, স্ত্রী পুরুষে ৩/৪ শত লোক এক ২ সভায় উপস্থিত থাকে। ইহারা স্বধর্মের মধ্যে জাতিভেদ স্বীকার করে না। কুলি, কামার, কুমার, তেলি, জালিক, ছুতার প্রভৃতি সকলেই এক সঙ্গে আহার করে। এই দলে মুসলমান আছে কিনা জানিতে পারা যায় নাই। লালন শা নামে এক কায়স্থ আর এক ধর্ম আবিষ্কার করিয়াছে। হিন্দু-মুসলমান সকলেই এই সম্প্রদায়ভুক্ত। আমরা মাসিক পত্রিকায় ইহার বিশেষ বিবরণ প্রকাশ করিব। ৩/৪ বৎসরের মধ্যে এই সম্প্রদায় অতিশয় প্রবল হইয়াছে। ইহারা যে জাতিভেদ স্বীকার করে না, যে কথা বলা বাহুল্য। এখন পাঠকগণ চিন্তা করিয়া দেখুন, এদিকে ব্রাহ্মধর্ম জাতির পশ্চাতে খোঁচা মারিতেছে, ওদিকে গৌরবাদীরা তাহাকে আঘাত করিতেছে, আবার সেদিকে সাম্প্রদায়ীরা, ইহার পরেও স্বেচ্ছাচারের তাড়না আছে। এখন জাতি তিষ্ঠিতে না পারিয়া, বাঘিনীর ন্যায় পলায়ন করিবার পথ দেখিতেছে।"

—এখানে জাতির বিপদ বোঝাতে গিয়েই প্রসঙ্গক্রমে লালনের কথা এসেছে।

হরিনাথ মজুমদার কৃত 'কাঙ্গালের ব্রহ্মাণ্ডবেদ'. ১ম ভাগ, ১ম সংখ্যাতে লালন ও তাঁর নিম্নের গানটির উল্লেখ আছে—

"কে বোঝে সাঁইয়ের লীলা খেলা;
সে যে, আপনি গুরু হয় অপনি চেলা।"

এরপর দেখি মীরমশাররফ হোসেনকৃত "সঙ্গীত লহরী" র (১৮৮৭) ৮৯ সংখ্যক গানে লালনের উল্লেখ রয়েছে। যেমন—

"আরে ভাই না পাই দিশে, কলির শেষে,
কিসে কার মন মজেছে।
ফিকির চাঁদে আজব চাঁদে,
রসিক চাঁদে সব মেতেছে।
কোথা আর পাগল কানাই, লালন গোঁসাই
সব সাঁই এতে হার মেনেছে।"

—লক্ষণীয়, গানটি লালনের মৃত্যুর আগে রচিত।

তবে, মশাররফ হোসেনের পাক্ষিক 'হিতকরী' পত্রিকাতেই (৩১শে অক্টোবর, ১৮৯০) 'মহাত্মা লালন ফকির' নামক সম্পাদকীয় নিবন্ধে লালনের জীবনী সংক্রান্ত মূল্যবান তথ্য পাওয়া

২১। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, সোনার তরী।

যায়।

ঠাকুর বাড়ি থেকে প্রকাশিত মাসিক 'ভারতী' পত্রিকার ভাদ্র সংখ্যা, ১৩০২-এ সরলা দেবীর "লালন ফকির ও গগণ" প্রবন্ধটি প্রকাশিত হয়। এতে অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়র সংগৃহীত লালন সম্পর্কে একিট সংক্ষিপ্ত জীবনী সহ লালনের আটটি, গগণ হরকরার ২টি ও অজ্ঞাতনামা কবির একটি গান ছিল। লালনের গানের প্রথম ছত্রগুলি নিম্নরূপ :

১। (কেনে) কাছের মানুষ ডাকছ সোর করে,
ক্ষ্যাপা তুই যেখানে সেও সেখানে, খুঁজে বেড়াও কারে রে?

২। কথা কয়, কাছে দেখা যায় না।
নড়ে চড়ে হাতের কাছে, খুঁজলে জনমভোর মেলে না।

৩। আমি একদিনও না দেখিলাম তারে।
আমার বাড়ীর কাছে আরসীনগর, এক পড়শী বসদ্ করে।

৪। আমার আপন খবর আপনারে হয় না।
সে যে আপনারে চিনলে পরে. যায় অচেনারে চেনা।

৫। গৌর কি আইন আনিল নদীয়ায় এত জীবের স্বভাব নয়।
সে যে আনখা আচার আনখা বিচার শুনে জীবের লাগে ভয়।

৬। জগন্নাথে দেখরে যেয়ে
জাত কেমনে রাখে বাঁচিয়ে।

৭। সব লোকে কয় লালন কি জাত সংসারে।
লালন ভাবে জেতের কি রূপ দেখ্‌লাম না এই নজরে।

৮। ক্ষম অপরাধ ওহে দীননাথ কেশে ধরে আমায় লাগাও কিনারে।
তুমি হেলায় যা কর তাই কর্তে পার তোমা বিনে পাপী তারণ কে করে।

—এখানে সরলা দেবী এবং অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় দু'জনেই লালন চর্চার ইতিহাসে উত্তরকালের গবেষকদের পথ প্রদর্শকের মর্যাদায় ভূষিত হতে পারেন।

মৌলবী আবদুল ওয়ালী ৩০শে নভেম্বর ১৮৯৮-এ এসিয়াটিক সোসাইটির এক সাধারণ অধিবেশনে 'On some curious Tenets and practice of certain class of Fakirs in Bengal' নামে একটি প্রবন্ধ পাঠ করেন। সেখানে তিনি বলেন যে লালন ও তাঁর গুরু সিরাজ শাহ্ দুজনেই হরিশপুর গ্রামে (ঝিনাইদহ মহকুমা, জিলা যশোহর) জন্ম গ্রহণ করেন এবং লালন ছিলেন 'কায়স্থ' সন্তান।

প্রবাসীর হারামণি বিভাগে বাংলা ১৩২২ সালের আষাঢ় সংখ্যায় শ্রীসতীশচন্দ্র দাসের প্রেরিত দু'টি লালনগীতি প্রকাশিত হয়—এটাই হল লালনগীতি সংগ্রহের প্রথম পর্যায়। এরপর যথাক্রমে ভাদ্র সংখ্যায় প্রকাশিত হয় করুণাময় গোস্বামী প্রেরিত লালনের ২টি গান। আশ্বিন সংখ্যায় রবীন্দ্রনাথ প্ররিত ৫টি গান —এটি লালন চর্চার ইতিহাসে নবদিগন্ত উন্মোচন করে। এরপর রবীন্দ্রনাথ প্রেরিত লালনগীতিগুলি যথাক্রমে অগ্রহায়ণ সংখ্যা (৩টি), পৌষ সংখ্যা (৫টি), মাঘ

সংখ্যাতে (৫টি) প্রকাশিত হয়। এইভাবে রবীন্দ্রস্পর্শে লালন চর্চা সুধী সমাজে সমাদৃত হয়ে ওঠে এবং লালন গবেষণা বিস্তৃত হতে থাকে। রবীন্দ্রনাথ নানা প্রবন্ধে ও বক্তৃতায় (১৯৩০) লালনের তত্ত্ব দর্শন ও গানের বিস্তারিত আলোচনা করেন। রবীন্দ্রনাথের হাতেই লালনের দর্শন, সঙ্গীত-সাধনা ও মানব-চিন্তা সুধী সমাজে মর্যাদা পায়—বিশ্বব্যাপ্তি লাভ করে।

দুর্গাদাস লাহিড়ীর 'বাঙ্গালীর গান' (১৩১২) এবং অনাথ দেবের 'বঙ্গের কবিতা' (১৩১৮) গ্রন্থে লালনের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি ও গান সংকলিত হয়। কুমুদনাথ মল্লিকের 'নদীয়া কাহিনী'তে লালনের সংক্ষিপ্ত পরিচয় ও একটি গান পাওয়া যায়। জলধর সেনের 'কাঙ্গাল হরিনাথ' (১ম খণ্ড, ১৩২০) গ্রন্থে লালনের কাছ থেকে প্রত্যক্ষভাবে 'ফিকির চাঁদের বাউলদল' গঠনের প্রেরণা কিভাবে পেয়েছিলেন, তা বলা হয়েছে।

কাঙাল হরিনাথের ভ্রাতুষ্পুত্র ভোলানাথ মজুমদার লালনের জীবন ও গান সংগ্রহ করেছিলেন। এখান থেকে উপাদান সংগ্রহ করেছেন উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য, বিশ্বনাথ মজুমদার প্রমুখ।

লালন চর্চা ও গবেষণায় বসন্তকুমার পাল, মুহম্মদ মনসুরউদ্দীন ও উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্যের অবদান সত্যিই অসামান্য। ১৩৬২ সালে প্রকাশিত বসন্তকুমার পালের 'মহাত্মা লালন ফকির'ই লালন সম্পর্কে প্রথম ও পূর্ণাঙ্গ গ্রন্থ। তাই লালন গবেষণায় এটির মূল্য ও গুরুত্ব অসীম। এখানে বারীনকুমার ঘোষের আশীর্বচনসহ অবতরণিকা, ষট্‌চক্রভেদ সাধনা, লালনের জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত বিস্তারিত কাহিনী আলোচিত হয়েছে।

মুহম্মদ মনসুরউদ্দীনের 'হারামণি'র বেশ কয়েক খণ্ডে লালনের সহস্রাধিক গান প্রকাশ পেয়েছে। লালন চর্চাতেই তাঁর জীবনের প্রায় সবটা অতিবাহিত হয়েছে। উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য তাঁকে লালন চর্চার 'পথিকৃৎ' হিসাবে চিহ্নিত করেছেন।

উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্যের 'বাংলার বাউল ও বাউলগান' (২টি খণ্ড) —তাঁর ৩০ বছরের অক্লান্ত পরিশ্রমের ফলস। এই গ্রন্থের জন্যই তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে 'ডক্টর অব ফিলসফি' (১৯৫৮) উপাধিতে ভূষিত হন। প্রথম খণ্ডে বাউল শব্দের উৎপত্তি ও তাৎপর্য, বাংলায় ধর্মের ক্রম বিবর্তন, বাউল ধর্মের উপাদান, বাউল ধর্মের সাধনা, উত্তর ভারতে সন্তগণ ও বাংলায় বাউল সম্প্রদায় প্রভৃতি বিস্তারিত আলোচিত হয়েছে। দ্বিতীয় খণ্ডে কবি পরিচয় ও ২১০টি (প্রথম সংস্করণে ১৬০টি ছিল) পদ রয়েছে। লালন সম্পর্কে তিনি বলেছেন :

"সব দিক দিয়ে বিবেচনা করিলে বাউল গান রচয়িতা হিসাবে... লালন ফকিরই সর্বশ্রেষ্ঠ। মূল তত্ত্বজ্ঞতা, সাধনের দীর্ঘ অভিজ্ঞতালব্ধ দিব্যদৃষ্টি, বৈষ্ণব শাস্ত্র ও সূফীতত্ত্ব সম্বন্ধীয় জ্ঞান, বক্তব্য ও ইঙ্গিত ব্যঞ্জনাময় করিয়া বলিবার কৌশল, সহজ কবিত্বশক্তি প্রভৃতিতে তাঁহার গানগুলি বাংলা সাহিত্যের একটি সম্পদ। ....সুর সংযোগে অভিব্যক্ত তাঁহার গানের অকৃত্রিম আবেগের মধ্যে একটা অনির্বচনীয়ত্বের বিদ্যুৎ খেলিয়া গিয়া আমাদের চিত্তকে অপূর্ব ভাবলোকে যেন উত্তীর্ণ করিয়া দেয়।"

—এখানে লালনের কবি প্রতিভার রস-বিশ্লেষণ দেওয়া হয়েছে।

বাংলাদেশে লালন গবেষক হিসাবে যাঁরা খ্যাতি অর্জন করেছেন, তাঁদের মধ্যে মুহম্মদ আবু তালিব, ডক্টর আনোয়ারুল করীম, ডক্টর এস. এম লুৎফর রহমান, আবুল আহসান চৌধুরী, ডক্টর খোন্দকার রিয়াজুল হক প্রমুখের নাম এখানে উল্লেখ করা যায়।

মুহম্মদ আবু তালিব 'লালন শাহ ও লালন গীতিকা' প্রথম খণ্ডে লালনের জীবন কথা, ধর্মমত, কাব্য প্রতিভার বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। দ্বিতীয় খণ্ডে ২৩ পৃষ্ঠা ভূমিকাসহ ৩৪৬টি গীতিসংকলিত হয়েছে। তাঁর দ্বিতীয় গ্রন্থ হল 'লালন পরিচিতি'।

আনোয়ারুল করীম লালন চর্চায় এক বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব। তাঁর 'বাউল কবি লালন শাহ' গ্রন্থে লালন শাহের জীবনী, কবি প্রতিভা, কবির ধর্মমত, সৃষ্টি রহস্য, হিন্দু-মুসলমান সম্প্রীতি প্রভৃতি লালন সংক্রান্ত নানা তথ্য পরিবেশিত হয়েছে। এছাড়াও তাঁর অন্যান্য গ্রন্থগুলি হল 'লালনগীতি,—গানের সংকলন; 'বাউল সাহিত্য ও বাউল গান'; 'ফকির লালন শাহ'; 'রবীন্দ্রনাথের শিলাইদহ'; 'The Bauls of Bangladesh', 'লালনের গান,' 'কবিতার কথা' প্রভৃতি। এসব গ্রন্থের মধ্যে বাউল এবং ব্যক্তি লালন সম্পর্কে নানা গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা স্থান পেয়েছে।

ডক্টর এস.এম. লুৎফর রহমান ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পি-এইচ্.ডি. ডিগ্রী পেয়েছেন 'বাউলতত্ত্ব ও লালনশাহ' শীর্ষক অভিসন্দর্ভ রচনা করে। তবে তাঁর প্রকাশিত গ্রন্থের মধ্যে 'লালন শাহ : কবি ও গান; 'লালন জিজ্ঞাসা', 'লালনগীতি চয়ন' প্রভৃতি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। তিনি দুদ্দুশাহ রচিত লালন জীবনী সংগ্রহ করে প্রমাণ করেছেন যে লালন শাহ যশোহর জেলার হরিশপুর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেছিলেন এবং তিনি জন্মসূত্রে মুসলমান ছিলেন।

আবুল আহসান চৌধুরী ছাত্রাবস্থাতেই 'কুষ্টিয়ার বাউল সাধক' গ্রন্থটি রচনা করে বেশ জনপ্রিয়তা লাভ করেন। এখানে বাউল ধর্মের ইতিহাস, কুষ্টিয়ার লোক সংস্কৃতি, রবীন্দ্রনাথ ও কুষ্টিয়ার বাউল সম্প্রদায় এবং লালনসহ কুষ্টিয়া অঞ্চলের লোককবিদের পরিচিতি ও গান উপস্থাপিত হয়েছে । তাঁর রচিত অন্যান্য গ্রন্থের মধ্যে 'লালন শাহ', 'লালন স্মারক গ্রন্থ' (সম্পাদিত), 'মনের মানুষের সন্ধানে' (প্রবন্ধ সংকলিত) প্রভৃতিতে লালন চর্চার নানা বিষয় বর্ণিত হয়েছে।

ডক্টর খোন্দকার রিয়াজুল হক লালন গবেষক হিসাবে বিশেষ সুপরিচিত। বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় তাঁর অসংখ্য প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে। রচিত ও সম্পাদিত গ্রন্থও কম নয়। 'লালন শাহের পুণ্যভূমি : হরিশপুর', 'লালন-সাহিত্য ও দর্শন', 'লালন-সঙ্গীত স্বরলিপি,' 'লালন-সঙ্গীত চয়ন', 'ঝিনাইদহ জেলার মরমী কবি', 'লালন মৃত্যুশতবার্ষিকী স্মারক গ্রন্থ' (সম্পাদিত) প্রভৃতি এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য।

অন্নদাশঙ্কর রায় কুষ্টিয়ার মহকুমা শাসক ছিলেন। লালন সম্পর্কে তাঁর যথেষ্ট আগ্রহ ও সহানুভূতি ছিল। তাঁরই উদ্যোগে লালনের দ্বিশত-জন্ম-বার্ষিকী উদ্‌যাপিত হয় কলকাতায়। 'লালন ফকির ও তাঁর গান' অন্নদাশঙ্করের লেখা বিশিষ্ট গ্রন্থ। এখানে তিনি লালনের গানের মূল্যায়ন করেছেন, নিরপেক্ষ দৃষ্টিতে। অন্নদাশঙ্কর রায়ের পত্নী লীলা রায়ের 'The Bauls of Bengal' গ্রন্থটি এ প্রসঙ্গে উল্লেখ্য। এটি ক্ষিতিমোহন সেনের 'বাংলার বাউল' গ্রন্থের ইংরেজী অনুবাদ।

মোমেন চৌধুরী লালন চর্চার এক সুপরিচিত নাম। তাঁর 'লালন বিষয়ক রচনাপঞ্জী' গ্রন্থটি বাংলা একাডেমী, ঢাকা থেকে প্রকাশিত হয়। এই গ্রন্থে এপর্যন্ত প্রকাশিত লালন বিষয়ক প্রায় সমস্ত গ্রন্থ, প্রবন্ধ, উপন্যাস, নাটক, ছোটগল্প, কবিতা সংকলন প্রভৃতি স্থান পেয়েছে,—যা জিজ্ঞাসু লালন গবেষকদের সঠিক পথনির্দেশ দিতে পারে।

লালন চর্চায় অপরাপর উল্লেখযোগ্য লেখক ও তাঁদের গ্রন্থের পরিচয় নিম্নে দেওযা হলো :

১। ইন্দিরা দেবী, শ্রীমতী—'বাংলার সাধক বাউল'

২। এনামুল হক, মুহম্মদ—'বঙ্গে সূফী প্রভাব'

৩। তৃপ্তি ব্রহ্ম— 'লালন পরিক্রমা', 'Lalon : His melodious' মরমীয়া লালন', 'লালন শতাব্দীর ফুল', 'লালন পরিক্রমা', 'মরমী ব্যক্তিত্ব লালন ফকির'।

৪। মনিরউজ্জামান, ম.— 'লালন-জীবনী ও সমস্যা', 'লালন ফকিরের গান'।

৫। যতীন্দ্রনাথ রায়— 'শঙ্খচিল', 'মনের মানুষ', 'মানুষ-রতন'।

৬। রফিউদ্দীন, খোন্দকার —'ভাব সঙ্গীত'। সংগৃহীত ও সংকলিত

৭। রেয়াজউদ্দীন আহমদ— 'বাউল ধ্বংস ফতওয়া'

৮। শক্তিনাথ ঝা— 'ফকির লালন সাঁই' : দেশ কাল এবং শিল্প'।

৯। শান্তিময় ঘোষাল— 'লালন ফকির'।

১০। সনৎকুমার মিত্র— 'লালন ফকির : কবি ও কাব্য', 'লোক সংস্কৃতি গবেষণা পত্রিকা' (সম্পা), 'বাউল লালন রবীন্দ্রনাথ' (সম্পা)।

১১। সুধীর চক্রবর্তী— 'গভীর নির্জন পথে,' 'বাংলা দেহতত্ত্বের গান', 'বাংলা গানের চার দিগন্ত', 'ব্রাত্য লোকায়ত লালন', 'লালন।'।

১২। সুশান্ত হালদার— 'লালন প্রয়াণ শতবর্ষ স্মারক গ্রন্থ,' 'অচিন পাখি'।

১৩। সোমেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়— 'বাংলার বাউল : কাব্য ও দর্শন'।

১৪। সোলারমান আলী সরকার— 'বাউল দর্শন', 'বাংলার বাউল দর্শন', 'লালন শাহের মরমী দর্শন'

১৫। তুষার চট্টোপাধ্যায়— 'লালন স্মরণিকা'। (সম্পা)

—এসব গ্রন্থতালিকা থেকেই বোঝা যাচ্ছে লালন চর্চার ইতিহাসের প্রবাহ কিভাবে শতধারায় বিকশিত হয়ে চলেছে।

লালন চর্চার ইতিহাসে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের ভূমিকাও উল্লেখযোগ্য। বাংলা একাডেমী প্রতিষ্ঠান থেকে আবু তালিবের 'লালনশাহ ও লালন গীতিকা' (২-খণ্ড) প্রকাশিত হয়েছে। এছাড়াও মুহম্মদ মনসুরউদ্দীনের' হারামণি'র বেশ কয়েক খণ্ড, আবু রুসদের 'Songs of Lalon Shah' প্রভৃতি প্রকাশ করে লালন চর্চায় সহায়তা করেছে। কুষ্টিয়ার 'ফোকলোর রিসার্চ ইনস্টিটিউট'ও (১৯৭০)লালন গবেষণায় সহায়তা করে চলেছে।

লালনের দ্বিশততম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে 'লালন একাডেমী হরিশপুর' ঝিনাইদহের হরিশপুরে বিরাট অনুষ্ঠানের আয়োজন করে। ছেঁউড়িয়ার লালন প্রাঙ্গণেও দ্বিশততম জন্ম বার্ষিকী পালিত হয়, উদ্যোক্তা ছিল 'লালন একাডেমী'।

লালন চর্চায় রেডিও, টেলিভিশনের ভূমিকাও উল্লেখযোগ্য। লালনের গান, নাটক, গল্প, প্রভৃতি রেডিও-টেলিভিশনে প্রচারিত হয়ে চলেছে নানাভাবে।

শুধু তাই নয়, গ্রামে-গঞ্জে অভিনীত হয়ে চলেছে যে সব নাটক তার মধ্যে আসকার ইবনে

শাইখের 'লালন ফকির', কল্যাণ মিত্রের 'লালন ফকির', তৃপ্তি ব্রহ্মের 'অধীন লালন বলে', দেবেন্দ্রনাথের 'সাঁই সিরাজ বা লালন ফকির', মন্মথ রায়ের 'লালন ফকির', 'লালনামৃত' প্রভৃতি বাঙালীর হৃদয়-মন হরণ করে নেয়। রণজিৎ কুমার সেনের 'বাউল রাজা' উপন্যাসটি বেতার নাট্যরূপ দেন দিগিন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়— নাম দেন 'লালন ফকির'। নাটকটি নিউ এম্পায়ারসহ বিভিন্ন স্থানে অভিনীত হয়।

লালনের জীবনী ভিত্তিক উপন্যাস লিখেছেন পরেশ ভট্টাচার্য 'বাউল রাজার প্রেম'। ছোটগল্প লিখেছেন শওকত ওসমান— 'দুই মুসাফির'; সুনির্মল বসু— 'লালন ফকিরের ভিটে' প্রভৃতি। কবিতা সংকলন করেছেন, তৃপ্তি ব্রহ্মা—'লালন শতাব্দীর ফুল', স্বতন্ত্র কবিতা লিখেছেন আবুল আহসান চৌধুরী —'লালন ফকির'; আলমাহমুদ—'সোনালী কাবিন'; আসাদ চৌধুরী—'বিস্ময় নেই প্রতীক্ষায়'; আহমদ রফিক— 'লালনের সমাধিতে'; নুরুল হুদা মুহম্মদ— 'লালনের একতারা'; ফরহাদ মজহার—'খোকন তার প্রতি পুরুষ'; বসন্তকুমার পাল— 'লালন ফকির'; মহাদেব সাহা— 'লালন থেকে ফিরে এসে'; শামসুর রহমান—'লালনের গান'; সৈয়দ উদ্দীন 'লালন'— প্রমুখ লালন প্রেমী কবিরা।

লালন সতিাই আমাদের প্রাণ—মন হরণ করে নিয়েছেন, তাঁকে কেন্দ্র করেই জমে উঠছে কত লোকউৎসব, কত লোকনাট্য। আমরা দেখতে পাচ্ছি নদীয়া জেলার ভীমপুর ও আসাননগরের মাঝে কদমখালি মহা-শ্মশানে প্রতি বছরই জম-জমাট হয়ে উঠছে লালন মেলা; এপার বাংলা-ওপার বাংলার লালন প্রেমী মানুষের ঢেউ উপছে পড়ছে সেখানে—এ যেন দুই বাংলার সংস্কৃতির সেতু বন্ধন। আর নদীয়ারই বগুলা—হাসখালি—মাজদিয়া অঞ্চলের পুতুল নাচের দল লালনের নামে দেশ—বিদেশ মাতিয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছে।

বোঝা যাচ্ছে যে, লালন আমাদের কত আপনার, কত গর্বের বিষয়। আমাদের চিন্তা চেতনায়, আবেগ- অনুভূতিতে, শিক্ষা-সংস্কৃতিতে লালন অমর হয়ে আছেন, থাকবেন। তাঁকে নতুন করে চিনে-চিনে আমাদের জীবন ভরে উঠবে অফুরন্ত আনন্দে। তাঁর গানের ডালিই যোগাবে সেই স্বর্গীয় আনন্দধারা— 'চির পরিচয় মাঝে নব পরিচয়' লাভ করে আমরা পরিতৃপ্ত হব; উপলব্ধি করব লোককবি লালনের মহিমা।

লোকসাহিত্য ও বাউল : লালন ও রবীন্দ্রনাথ

বাউল গানকে লোকসাহিত্যের অন্তর্গত করা সম্ভব কিনা তা আলোচনা করে সিদ্ধান্ত নেবার পূর্বে আমাদের এই বিষয়ে বিশ্লেষণ করা প্রয়োজন যে লোকসাহিত্য বলতে আমরা কি বুঝি।
গণতন্ত্রের সংজ্ঞার অনুসরণে লোকসাহিত্য সম্পর্কে বলা যায় যে—

> *"যে সাহিত্য লোকদের জন্য, লোকদের দ্বারা, লোকদের নিয়ে সৃষ্ট তাই হল লোক সাহিত্য, ...ইংরাজীতে যাকে Folk বলা হয়, বাংলায় তাকেই আমরা 'লোক' বলে থাকি।"*[১]

তাই লোকসাহিত্যের পরিভাষায় 'লোক' বলতে আমরা বুঝব—

> *"এমন একটি সংহত সমাজ যে তার নিজস্ব জন-অংশের* (Racial) *মধ্যে থেকেও এবং তাদের সঙ্গে পারস্পরিক নির্ভরশীলতার ভিতর দিয়েও চিরাচরিত প্রথায় আপন বিশিষ্টতা অক্ষুণ্ণ রাখতে পারে বা পেরেছে।"*[২]

এই লোক অভিধার অন্তর্গত সমাজ বাইরের সম্প্রদায়, গোষ্ঠী বা মানবাংশের সংস্কৃতির নিত্যনতুন উপাদান নিজেদের সমাজের উপযোগী করে নিয়ে থাকে, এখানেই এদের বিশিষ্টতা বা স্বকীয়তাও বটে এবং এই বিশিষ্টতা বা স্বকীয়তা থেকে যে সাহিত্যের উৎপত্তি হয়, তাকেই আমরা লোকসাহিত্য বলে গ্রহণ করতে পারি। ছড়া, ধাঁধা, প্রবাদ, গীতিকা, কিংবদন্তী, লোকনাট্য, লোকসংগীত, লোক পুরাণ, রূপকথা, উপকথা, ব্রতকথা প্রভৃতি এই লোকসাহিত্যের অন্তর্গত এই লোকসাহিত্য—

> *"সংহত সমাজের সামগ্রিক সৃষ্টি, ব্যক্তি বিশেষের একক সৃষ্টি নহে, উচ্চতর সাহিত্যের সঙ্গে এইখানেই ইহার মূল পার্থক্য।"*[৩]

লোকসাহিত্যের প্রকৃতি বা স্বরূপ আলোচনার প্রথমেই যেগুলি নজরে আসে তা নিম্নরূপ:

১। নৈর্ব্যক্তিকতা লোকসাহিত্যের অন্যতম বৈশিষ্ট্য, একের সৃষ্টি দশ জনের হাত বেয়ে সমগ্র সমাজের সম্পত্তিতে পরিণতি লাভ করে থাকে। কোন কোন ক্ষেত্রে রচয়িতার নাম পেলেও তা শুধু নাম মাত্রই—সেখানে সচেতন ব্যক্তিত্ব থাকে না। ছড়া, ধাঁধা, প্রবাদ, প্রসঙ্গে একথা সহজেই বোঝা যায়।

২। লোকসাহিত্যের আর একটি বিশেষত্ব হচ্ছে তার অলিখিত বা মৌখিক রূপ, লোকসাহিত্য মুখে মুখে সৃষ্টি হয়ে স্মৃতিকে নির্ভর করে এক কণ্ঠ থেকে আর এক কণ্ঠে ঘুরে বেড়ায়। উচ্চসাহিত্যের মত লোকসাহিত্যকেও লিখে নেওয়া যায়। তবে লেখক যেমন শোনেন তেমনি লিখতে হয়, যেমন বোঝেন তেমনি নয়।

৩। 'লোকসাহিত্য' একটি মাত্র ভাব বা বক্তব্যের ওপর দৃঢ় হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে না বা থাকতে পারে না। কার্যকারণ যোগহীন বক্তব্য এক বিষয় থেকে আর এক বিষয়ে চলাফেরা করে।

৪। লোকসাহিত্যের সঞ্চরণ ক্ষমতা আছে। একই ছড়া, ধাঁধা, প্রবাদ বা লোক কথা রূপে, ভাবে বা ভাষায় সামান্য কিছু পরিবর্তিত ভাবে বা অবিকৃত ভাবে বাংলাদেশ তথা পৃথিবীর এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্ত পর্যন্ত ঘুরে বেড়ায়, এই সঞ্চরণশীলতার জন্য লোকসাহিত্য কোনদিন প্রাচীন হয়ে যাবে না।

৫। লোকসাহিত্য হল সাধারণ মানুষের স্বতস্ফূর্ত রচনা। সেখানে কোথাও কোনো ভাবেই চেষ্টা চর্চিত বা কষ্ট কল্পিত কোন বকম বুদ্ধির অথবা মননের কসবৎ লক্ষা করা যায় না।

৬। সাধারণত নিরক্ষর গ্রামবাসীদের রচনা হওয়ায় লোকসাহিত্য আটপৌরে ধরনের সহজ সরল হয়, কিন্তু উচ্চসাহিত্যের ক্ষেত্রে ভাষা, ছন্দ, অলংকার ইত্যাদি প্রসাধন কলার দিকে স্রষ্টার তীক্ষ্ণ নজর থাকে। তাই বলা যায় লোকসাহিত্য হয়ে ওঠা সাহিত্য, আর উচ্চসাহিত্য গড়ে তোলা সাহিত্য।

৭। লোকসাহিত্য সাধারণত নিরক্ষর মানুষের সাহিত্য। এর সৃষ্টি হয় সাধারণত গ্রাম থেকে। আর উচ্চসাহিত্য শিক্ষিত মানুষের দ্বারা অগ্রবর্তী সমাজ থেকে বা নগর থেকে সৃষ্টি হয়।

৮। লোকসাহিত্যের সিদ্ধরস হচ্ছে উদ্ভটরস (nonsense)। আর উচ্চসাহিত্য অলংকার শাস্ত্রের নয়টি রসের এক বা একাধিক রসসিদ্ধ রস।

রবীন্দ্রনাথের পূর্বে বাংলাদেশে লোকসাহিত্য চর্চায় উল্লেখযোগ্য সচেতনতা লক্ষ্য করা যায় না। তিনটি প্রবন্ধ গ্রন্থ,একটি গীতিকা, দুটি ইংরাজীতে লেখা বাংলার গ্রাম জীবনের উপর ভিত্তি করে রচিত গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে। ১৮৮৩ সালে রেভারেন্ট লালবিহারী "Folk Talks of Bengal" বইটি প্রকাশ করেন। রবীন্দ্রনাথ 'বাংলার গাঁথা' গ্রন্থের সমালোচনা করে 'বাউলের গান' নামক একটি প্রবন্ধ লিখেছিলেন।

এখন দেখা যাক বাউল গানকে এই লোকসাহিত্যের অন্তর্ভুক্ত করা যায় কিনা। এই প্রসঙ্গে বলে নেওয়া প্রয়োজন, বাউল গান যদি সাহিত্যের অন্তর্গত হয় তবে তা গ্রাম্য সাহিত্য, কেননা এর উদ্ভব বিকাশ সবই এই গ্রাম্য পরিবেশে। লোক সংগীতকে লোকসাহিত্যের অন্তর্ভুক্ত করা যায়, তাই বাউল গানকে লোক সংগীত বলা চলে। কেননা বাউলেরা বিশেষ করে লালন, মুখে মুখে গান রচনা করতেন। অধিকাংশ বাউলই নিরক্ষর ছিলেন। এই বাউল গান লোকসাহিত্যের ন্যায় মুখে মুখে প্রচার হয়ে তা পরিবর্তিত হয়েছে এমন অনেক দৃষ্টান্ত আছে। এই বাউল গান মোটের উপর কোন ভাবেই চেষ্টা চর্চিত বা কষ্ট কল্পিত রচনা নয়, এ একেবারে স্বতঃস্ফূর্ত রচনা, সাধারণ ভাবে অশিক্ষিত গ্রাম্য মানুষের কাছেই এর জনপ্রিয়তা সব থেকে বেশি।

বাউলের দর্শন যেহেতু জীবনকে আশ্রয় করে প্রকাশ পায়, সেই কারণে তাকে সাহিত্য বলতে হবেই। তাই বাংলার বাউল গানের মধ্যে যে গভীর তত্ত্ব আছে তা বাদ দিয়েও এর সংগীত জাতি, ধর্ম নির্বিশেষে মানুষের মনে যে আবেদন সৃষ্টি করে তাতে একে সাহিত্যের পর্যায়ে ফেলতেই হবে। বাউলদের সাধনার মধ্যে ঐক্য থাকলেও কিছু কিছু ক্ষেত্রে এদের মধ্যে বিভাজন লক্ষ্য করা যায়, ফলে বিভিন্ন ধরনের বাউল গোষ্ঠীর সূচনা হয়। যেমন মুসলমান বাউল, বৈষ্ণব বাউল। বৈষ্ণব বাউলের আবার দুটি শাখা নবদ্বীপি আর রাঢ়ী।

এঁদের মধ্যে যেমন পার্থক্য আছে তেমনি এঁদের ধর্মসংগীতকে দুই ভাগে ভাগ করা যায়— ১। আচার মূলক ধর্ম সংগীত, ২। লৌকিক ধর্মসংগীত।

গুরুশিষ্য পরম্পরা নিজস্ব গণ্ডীর মধ্যে সীমাবদ্ধ সংগীত হল আচার মূলক ধর্মসংগীত। আর লৌকিক ধর্মসংগীত লোক সংগীতের ন্যায় স্বাধীন ভাবে বিকাশ লাভ করে। বাউলের মূল কথা হল বাউলের গান। তাই বাউলের গানেই বাউলের তত্ত্ব প্রকাশিত। বাউলের গান হল একেবারেই লোক সাধারণের গান।

লোকসাহিত্যের মূল শর্ত হল সর্বজনীনতা, যে গানের ভাষা একের কণ্ঠের হয়েও দশের বলে প্রতিভাত হয়, সেই গানই হল লোকসংগীত। যেমন এই গানটি—

"প্রেম করো, মন, প্রেমের মর্ম জেনে
প্রেম করা কি কথার কথারে
গুরু লহ চিনে
চণ্ডীদাস আর রজকিনী
তারাই প্রেমের শিরোমণি
একমরণে দুজন মলোরে
প্রেম পূর্ণ প্রাণে।"

এটি একটি মুসলমান বাউলিনীর গান। লালনের গানগুলি ছিল একেবারে সাধারণ মানুষের গান। সেই গান গ্রামের নিরক্ষর মানুষদের মনের কথা ব্যক্ত করেছে। যেমন এই গানটিও—

"এসো এসো প্রাণের বন্ধু গো
আমি দেইখ্যা মনের সাধ মিটাই
আমার দেহ পুইর‍্যা হইল অঙ্গার
তুমি আমার কিসের বন্ধু গো।
এসো এসোরে প্রাণের.বন্ধু গো
আমি দেইখ্যা মনের সাধ মিটাই।
চাতক থাকে মেঘের আশে
মেঘ বর্ষিল অন্য দেশে গো
তোমার জলবিনে চাতকী মলো
তুমি আমার কিসের বন্ধু গো
এসো এসোরে বন্ধু গো
আমি দেইখ্যা মনের সাধ মিটাই।
লালন বলেন ওগো স্বামী
জীবনের জীবনই তুমি গো
তুমি দেও দরশণ
এই চাঁদ বদন
শীতল করো কৃপাসিন্ধু
এসো এসোরে প্রাণের বন্ধু গো
আমি দেইখ্যা মনের সাধ মিটাই।"

—লালন।

বাংলার লৌকিক সংগীতগুলোর মধ্যে অন্যতম হল বাউল সংগীত। এই সংগীত বা গান ধর্মীয় সাধনার একটা প্রণালী বিশেষ। বাংলাদেশের জনজীবনের ক্রম পরিণতির সাথে সাথে এই বাউল সাধনারও ক্রমবিকাশ শুরু হয়েছে। রবীন্দ্রনাথের হাতে লোকসাহিত্য হিসাবে যে বাউল গানের চর্চা শুরু হয়েছিল সেই চর্চা আজও হয়ে চলেছে ক্রম পর্যায়ে। সেই কারণে বহু পুরনো বাউল গান আজও আমাদের মুখে মুখে ঘোরে। এইজন্য একে লোক সংগীত ছাড়া আর কী বা বলতে পারি?

'বাউল' এই শব্দটির ব্যবহার বাংলা সাহিত্যে প্রথম পাই মালাধর বসুর 'শ্রীকৃষ্ণ বিজয় কাব্যে'-

'মুকুল (৩) মাথার চুল নাংটা যেন বাউল
রাক্ষসে রাক্ষসে বুলে রণে।'

আবার 'চৈতন্য চরিতামৃত' কাব্যতেও বাউল শব্দের ব্যবহার লক্ষ্যণীয়—

"বাউলকে কহিও লোক হইল আউল,
বাউলকে কহিও হাটে না বিকায় চাউল।।
বাউলকে কহিও কাযে নাহিক আউল,
বাউলকে কহিও ইহা কহিয়াছে বাউল।।

—*অন্ত্যলীলা*

'বাউল' শব্দের উৎপত্তি সম্পর্কে বিভিন্ন মতামত পাওয়া যায়। কারো মতে বাউল শব্দটি এসেছে হিন্দী 'বাউর' শব্দ থেকে, এর অর্থ পাগল। বাউল সর্বদা আত্মমগ্ন, বহিঃজগতের কোনো প্রভাব তার উপর পড়ে না। সে ভাবের পাগল। সংস্কৃত 'ব্যাকুল' বা 'বাতুল' শব্দ থেকে বাউল শব্দের উদ্ভব বলে অনেকে মনে করেন। এর অর্থও উন্মাদ বা পাগল।

ডঃ এস. এম. লুৎফর রহমানের মতে চর্যাগীতি ও অবহট্‌ঠ রচনায় ব্যবহৃত বিভিন্ন শব্দ যেমন বাজির, বাজ্জিল, বাজিল, বাজুল, এগুলিকে বাউল শব্দের আদি রূপ হিসাবে গণ্য করা যেতে পারে। এর ক্রমপর্যায়টি তার মতে এইরকম : বাজ্রী-বাজ্জির-বাজির-বাজ্জিল-বাজিল-বাজুল-বাউল। আদি বাংলায় শব্দটির রূপ ভিন্ন হলেও বাংলাতে বাউল শব্দটির দ্বারা ভাবের উন্মাদ বা বিবশ ব্যক্তিকেই বোঝায়।

বাউল একটা সম্প্রদায় বা শ্রেণীর মানুষ। একটি সম্প্রদায়কে নির্দেশ করতেই বাউল শব্দের ব্যবহার। আনুমানিক প্রায় তিনশ বছর আগে থেকে একটি শ্রেণীকে বা ধর্ম সম্প্রদায়কে বোঝাবার জন্যই 'বাউল' শব্দটির ব্যবহার শুরু হয়। এদেরকে একটি পৃথক শ্রেণীভূক্ত করা যায় কিসের ভিত্তিতে সে প্রসঙ্গে বলা যায়, এরা কোনো বিশেষ ধর্মকে আদর্শ বলে মনে করে না। এরা সর্বদা আপন ভাবে বিভোর হয়ে থাকে। দেব-দেবী, পূজা, আচার, আল্লা, মসজিদ কোনো কিছুই এরা মানে না, এরা নিজেদেরকে এসবের উর্ধ্বে বলে মনে করে। এদের পোষাক পরিচ্ছদ, কথা-বার্তা, আচার-আচরণ, সাধারণ সমাজবদ্ধ মানুষের থেকে সম্পূর্ণ পৃথক।

আসলে আমাদের দেশে কতকগুলি কথা ব্যবহৃত হতে হতে প্রচলিত হয়ে গেছে। সেরকমই একটি কথা হল 'বাউল'। এরা সমাজমুক্ত, গৃহী নয়। এদের সম্পত্তিতে লালসা নেই, এদের সন্তান হয় না। এদের কাজ শুধু গান গাওয়া এবং রাত্রি হলে আখড়ায় ফিরে আসা। এদের বৃত্তি মূলত

ভিক্ষাবৃত্তি। বাউল মাত্রই কিন্তু ফকির নয়, আবার ফকির মাত্রই বাউল নয়। মুসলমানদের সাধরণত ফকির বলা হয়। যদিও কিছু হিন্দুকেও ফকির আখ্যা দেওয়া হয়। যদিও হিন্দু বাউল, মুসলমান বাউল এভাবে তাদের পরিচয় দিলে বাউলদের প্রতি অবিচার করা হবে। কারণ তারা সাধারণত এই জাতপাতের ভেদা-ভেদীর উর্ধ্বে। এরা কেউ মুসলমান, কেউবা হিন্দু, কিন্তু বাউল ধর্মে দীক্ষিত হবার পর তারা তাদের পরিচয়ের সাথে হিন্দু বা মুসলমান কথাটা মুছে দেয় তখন তারা হয় কতকটা সুফী, কতকটা বৈষ্ণব, কতকটা বৌদ্ধ-সহজিয়া। মুসলিম হলেও সুফীরা আনুষ্ঠানিক নন। কিন্তু অনেক হিন্দু সুফী সাধক হলেও মুসলমান নন। হিন্দু, মুসলমান এই বিভাগের মধ্যে লালনের মতো ফকিরের অবস্থান। শাস্ত্র এরা মানেন না, তাই এদেরকে বলা হয় 'Non-conformist'.

তবুও বাউলের জাত সম্বন্ধে আগ্রহের শেষ ছিল না, তা লালনের ক্ষেত্রেই বোঝা যায়। মুসলিমরা তাকে মুসলমান বলে দাবি করে, হিন্দুরা তাকে হিন্দু বলে মানে, তাইতো লালন বলেছে—

"সব লোকে কয় লালন কি জাত সংসারে
লালন ভাবে জাতের কি রূপ দেখলেম না এ নজরে।"

"বাউলদের এক প্রকার বিচিত্র প্রকার দেহ দর্শন আছে। নারী—দেহকেই তাঁহারা মুক্তির সোপান বলিয়া মনে করেন। (পাঞ্জু শাহ কর্তৃক 'মেয়ে'র গৌরব ঘোষণাত্মক পদ বা 'মেয়ে ভজতে পারলে, পারে যাওয়া যায়'— প্রভৃতি পদ দ্রষ্টব্য) তাঁহাদের দেহতত্ত্বের মতে, স্ত্রী ধর্মের তিনটি দিনে নারী দেহে 'সহজ মানুষ' 'মনের মানুষ' বা 'অধর চাঁদে'-র আবির্ভাব হয়। চতুর্থ দিনেই মনের মানুষ পালাইয়া যায়। সাধক নারীদেহ অবলম্বন করিয়া তিনদিন ধরিয়া ত্রিবেণী ধারায় বসিয়া মনের মানুষরূপী মৎস্য শিকার করিবেন। সহজ অর্থে, স্ত্রী ধর্মের বিশেষ দিনে স্ত্রী পুরুষের বিশেষ দৈহিক প্রক্রিয়ার দ্বারা সঙ্গত হইলে বাউল সাধনার সিদ্ধি নিকটতর হইবে।"[৮]
অন্যত্র দেখি,

"এই তিনদিনেই বাউলের সাধনার প্রশস্ত সময়, ইহাই 'মানুষ' ধারার সময়। এই তিনদিনের শেষে পূর্ণ ভাবে সহজ মানুষের আবির্ভাব হয়। ইহা সাধকের অনুভূতি সাপেক্ষ। এই সহজ মানুষের স্বরূপের অনুভূতি শৃঙ্গারে অচঞ্চল বীজোদ্ভূত আনন্দানুভূতি। এই আনন্দানুভূতিকে যোগ ক্রিয়ার দ্বারা ক্রমাগত উর্ধ্বমুখী করিয়া দ্বিদলপদ্ম পর্যন্ত উঠাইলে অটল বীজরূপী ঈশ্বর রূপের সঙ্গে শৃঙ্গার লীলাময় সহজ মানুষ রূপের মিলনে নিরন্তর অপরিসীম শৃঙ্গারানন্দের অনুভূতি জাগে। মূলতঃ পরমতত্ত্বের স্বরূপই এই প্রকৃতি পুরুষের মিথুন ঘটিত মহোল্লাসময় অবস্থা। এই অবস্থা লাভই বাউল সাধনার চরম লক্ষ্য। ইহাই তাহার আত্মোপলব্ধি—সহজ অবস্থা লাভ"[৫]

এই সূত্র ধরেই ডঃ অসিতকুমার বন্দোপাধ্যায় বিশ্লেষণ করে বলেন— "লালন, পাঞ্জু শাহ প্রমুখ বাউল গুরুগণ তাহাদের গানে, ত্রিবেণীর ঘাট অধরমানুষ (মীন), জোয়ার, জোয়ারের জলে মীনরূপী অধরমানুষ বা সহজ মানুষের ভাসিয়া আসা, সময় থাকিতে থাকিতে তিনদিনের মধ্যে

সাধক কর্তৃক সাধিকার দেহতীর্থ হইতে সাধনামৃত লাভ- প্রভৃতি গূঢ় ব্যাপারের ইঙ্গিত দিয়াছেন,.... এ বিষয়ে ডঃ উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য দীর্ঘদিন ধরিয়া বাউল সম্প্রদায়ের মধ্যে ঘুরিয়া তাহাদের নিকট সাহচর্যে আসিয়া উহাদের 'কায়া সাধনার' মোটামুটি পরিচয় উদ্ধার করিয়াছেন। স্ত্রীলোকের 'নীর' (অর্থাৎ রজঃ) এবং পুরুষের ক্ষীর (অর্থাৎ শুক্র)- এই নীরে ক্ষীরের মিলিত সত্তার নাম সহজসত্তা, নীরে কামের অধিকার, ক্ষীরে প্রেমের অধিকার। সাধককে প্রক্রিয়া বিশেষের সাহায্যে 'নীর' হইতে 'ক্ষীর' বাহির করিয়া লইতে হইবে, অর্থাৎ স্ত্রী পুরুষের দৈহিক আসক্তিকে প্রেমের দ্বারা জয় করিতে হইবে। এই সাধনায় 'চারিচন্দ্র ভেদে'র প্রথা, পানপ্রথা প্রভৃতি কোন কোন সম্প্রাদায়ে গোপনে অনুষ্ঠিত হয়। ইহার বর্ণনা আধুনিক সমাজে নিতান্ত ঘৃণ্যব্যাঞ্জক, পন্থা অঘোর বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে। আধুনিক শিক্ষিত ব্যক্তি ইহাতে বিবমিষা বোধ করিবেন। এই প্রসঙ্গে একটি প্রসঙ্গের অবতারণা করা যাইতেছে। কয়েক বৎসর পূর্বে আমাকে কয়েক দিনের জন্য কুষ্টিয়ায় লালন শাহের মাজারে অনুষ্ঠিত বাউল সম্মেলনে যোগ দিতে হইয়াছিল। সেখানে প্রবীণ বাউলগণ আমাকে বলেন যে, পণ্ডিত গবেষকেরা তাঁহাদের গ্রন্থে বাউল সাধ্য সাধনা সম্বন্ধে যাহা লিখিয়াছেন, তাহার সহিত তাঁহাদের সাধনার কোনো যোগাযোগ নাই। এই সমস্ত গ্রন্থের অধিকাংশই লেখকদের স্বকপোলকল্পিত ব্যাপার''।[৮]

প্রবীণ বাউলগণের এই দাবি একেবারে সঠিক নয়, কারণ বাউল সম্রাট লালন সাঁই স্বয়ং একটি গানে বলেছেন—

> ''সমাএ গেলে রে ও মন সাদন হবে না।
> দিন ধরিএ তিনের সাধন কেনে কল্য না।।
> জানো না মন খালে বিলে,
> মীন থাকে না শুকালে
> কি হয় তারো বান্দাল দিলে শুকন মহানা''।।

এই প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন—

''একদা পাড়া গাঁয়ে যখন বাস করতুম তখন সাধু সাধকের বেশধারী কেউ কেউ আমার কাছে আসত, তারা সাধনার নামে উচ্ছৃঙ্খল ইন্দ্রিয় চর্চার সংবাদ আমাকে জানিয়েছেন, তাতে ধর্মের প্রশ্রয় ছিল। এই প্রশ্রয় সুড়ঙ্গ পথে শহর পর্যন্ত গোপনে শিষ্যে প্রশিষ্যে শাখায়িত।''

তবে রাঢ়ের বাউল সম্পর্কে বলা যায়—

এরা নিজেদেরকে বৈষ্ণব বলে পরিচয় দেন। আসলে বাউলের বিভিন্ন শুদ্ধাচারণ তাদের ক্রমশ বৈষ্ণব করে তোলে। প্রত্যেক সাধু বাউলরা নিজেদেরকে 'বৈষ্ণব বাউল' হিসাবে পরিচয় দেন। এই কারণে বাউল বোষ্টম কথাটির প্রচলন আছে। এই কারণে বাউলদের সঙ্গিনীকে বোষ্টুমী বা বৈষ্ণবী বলা হয়। এদের মতে নারী পুরুষের সম্পর্ক একটাই সেটা যৌন সম্পর্ক। এই সম্পর্কটি একমাত্র প্রাকৃতিক সত্য, এর কোনো ন্যায় অন্যায় হয় না। অন্যান্য প্রাণীর সম্পর্কও এই রকম। তাছাড়া বাউলরা মনে করে যে ধর্মীয় সামাজিক সম্পর্ক প্রাকৃতিক নয়, এই কারণে তারা নারী পুরুষের ধর্মীয় সামাজিক সম্পর্কে বিশ্বাসী নয়। তাই তাদের ঘর সংসার কিছু নেই, যখন যে যার কাছে থাকে তখনই সে তার দুঃখের সাথী, দূরে চলে গেলে আর নয়। এরা সবাই সাবলম্বী, যতদিন

এরা বাঁচে মনের মানুষের সঙ্গ নিয়ে বাঁচে।

ইমতিয়াজ আমেদ বলেছেন—

"বাউল বলে একদল আখড়া আশ্রমধারী সাধু গায়ককে দেখা যায়, এরা কি বাউল? যারা গায়ক তাদের প্রায় সকলেরই ছেলে পিলে আছে। বাউলের ছেলে হয় কি করে? সাধুদের অবশ্য ছেলে পুলে দেখা যায় না।...... আমার যতদূর মনে হয় আসলে বাউল হচ্ছে একটা তত্ত্ব। মানুষ তো তত্ত্ব নয় বাস্তব। মানুষ কখনো তত্ত্বে পৌঁছতে পারে না, সে পৌছানোর যত চেষ্টাই করুক। তাই সে। অর্থে প্রকৃত বাউল বা সাধু কিছু হয় না। বাউল যারা রয়েছে তারা বাউল গায়ক মাত্র। সাধুরা ঐ রকম সাধু। বাউল বলতে অথচ আমরা আত্মভোলা উদাসী ভাবোন্মাদ কত কি না বুঝি।"

এই মন্তব্য থেকে আমাদের মনে হতে পারে যে বাউল কি মনগড়া কোন কিছু! এ প্রসঙ্গে বলা যায় রাঢ় অঞ্চলের বাউল যারা মূলত বৈষ্ণব, তারা জনজীবনে আদরনীয়। কিন্তু নদীয়া মুর্শিদাবাদের বাউলরা মূলত নিম্ন বর্ণের দরিদ্র কৃষিজীবী, অথবা ফকির, এরা সমাজে উপেক্ষিত। তাই এদেরকে ফকির বাউল বলা হয়। বাংলার বাউলদের জীবন ধারণ পদ্ধতি বিচিত্র জটিল। এরা বিভিন্ন সম্পদায়ে বিভক্ত। এই বিভাজন ক্রমশই বিস্তারিত হচ্ছে। ফলে বৌদ্ধ সহজিয়া, বৈষ্ণব সহজিয়া, নাথপন্থ, তন্ত্র ও সুফিবাদ মিলে মিশে তৈরি হয়েছে দরবেশ ফকির বাউলদের জটিল জগৎ।

কিন্তু বাউল সম্রাট লালন তাঁর গীতিগুলিতে কোথাও বাউল কথাটি ব্যবহার করেননি। তাঁর শিষ্য দুদ্দু শাহ বৈষ্ণব ও বাউলদের পার্থক্য পরিষ্কার করে বুঝিয়েছেন—

"বাউল বৈষ্ণব ধর্ম এক নহে তো ভাই
বাউল ধর্মের সাথে বৈষ্ণবের যোগ নাই।
বিশেষ সম্প্রদায়ে বৈষ্ণব
পঞ্চতত্ত্বে করে যপ তপ
তুলসী-মালা-অনুষ্ঠান সদাই।
বাউল মানুষ ভজে
সেখানে নিত্য বিরাজে
বস্তুর অমৃতে মজে
নারী সঙ্গ তাই।"

অর্থাৎ বৈষ্ণবরা মালা-তিলক-কণ্ঠিধারী, পঞ্চতত্ত্বে বিশ্বাসী। বাউলদের সাধনা হল—

'যে বস্তু জীবনের কারণ
তাই বাউল করে সাধন
জীবনই তীর্থ ধর্ম পথ
এই কথা বাউলের মত" —দুদ্দু শাহ।

লালন কিন্তু এসব কিছুই বলেননি। কারণ তিনি সব কিছুতেই একটা পর্দা রাখতে চেয়েছেন। লালন যেমন জাত সম্পর্কে সকলকে আঁধারে রেখেছেন, ধর্মের ক্ষেত্রেও ঠিক তাই।

লালন বাউল না ফকির এই মীমাংসার প্রাক্কালে বলা উচিত, লালনের গানগুলি হল যুক্তি

প্রতিষ্ঠা ও প্রতিবাদ সমন্বিত। তাই দেখতে হবে তিনি নদীয়া যশোহরের কোন্ গীতি ঐতিহ্য সূত্রে তাঁর গান লিখেছেন। এ প্রসঙ্গে হাবিবুর রহমান ঠিক করেছেন—

"সমগ্র কুষ্টিয়া, যশোর, খুলনা (সুন্দরবনাঞ্চল অর্থাৎ রামপাল, সরোন খোলা, মোরেল গঞ্জ, পাইক গাছা, দাকোপ ও শ্যামনগর থানা ব্যতীত) ঢাকা, টাঙ্গাইল (মধুপুর থানা ব্যতীত) ময়মন — সিংহের জামালপুর মহকুমা (শ্রীবর্দী, ঝড়িয়াগীতি, নাকলা দেওয়ানগঞ্জ, শেরপুর ও নালতাবাড়ি ব্যতীত) মৌলভী বাজার মহকুমা এবং সুনামগঞ্জ মহকুমার ছাতক, জগন্নাথপুর ও সুনামগঞ্জ থানা এবং হবিগঞ্জ মহকুমার সদর, চুনারুঘাট, বাহুবল ও নবীনগঞ্জ থানা নিয়ে বাউল সংগীতাঞ্চল রূপায়িত হয়েছে।"

তবে কুষ্টিয়া অঞ্চল ছিল নানা ধরনের লৌকিক গানের উৎসভূমি। এই অঞ্চলে লালন ছাড়া গগন হরকরা পাণ্ডুশাহ, পাগলা কানাই, কাঙাল হরিনাথ, দুদ্দুশাহ, গোঁসাই গোপাল আবির্ভূত হন।

তাই বলা যায় বাউল সম্প্রদায়ের বিকাশে এই অঞ্চলের ভৌগোলিক মাহাত্ম্য অনেক। এখন বাউলের কথা বেশ প্রসিদ্ধি লাভ করেছে। কিন্তু এই বাউল জগতের সঙ্গে আমাদের শিক্ষিত মনের পরিচয়ের ক্ষেত্রে আমরা যার কাছে সব থেকে বেশি ঋণী তিনি হলেন ভাবুক শ্রেষ্ঠ রবীন্দ্রনাথ।

বাউল সম্প্রদায়ের আলোচনায় বসে বাউল সাধনায় মহিলাদের ভূমিকা সম্পর্কে আলোচনা না করলে বোধ হয় বাউল বিষয়ক আলোচনা সম্পূর্ণতা পাবে না। আমরা যে রকম পুরুষ-বাউলদের পাই সেই রকম কি মহিলা-বাউল আছে? বোধ হয় না। কারণ বাউলদের সম্পর্কে তথ্যানুসন্ধান করে দেখা গেছে যে এখানে নারীর ভূমিকা কেবল সঙ্গিনী রূপে। তারা তাদের সঙ্গী বা গুরু দ্বারা পরিচালিত। তাদের স্বতন্ত্র কোনো মত বা দৃষ্টিভঙ্গি সেখানে প্রতিফলিত হয় না।

বাউল সাধনায় নারীর ভূমিকা অনস্বীকার্য। কিন্তু উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য তাঁর 'বাংলার বাউল ও বাউল গান' (১৩৬৪) বইতে এমন বাউলদের কথাও বলেছেন যারা প্রকৃতির সঙ্গ করে না। কিন্তু বাউল সাধনার সমস্ত রীতি মেনে চলে, ব্যভিচারের আশঙ্কায় তাঁরা প্রকৃতির সঙ্গ ত্যাগ করেছেন, কিন্তু এখন বাউল মানে তার সঙ্গিনী থাকবেই।

বাউল সম্মিলনে ঘুরলে দেখা যায় তাদের সঙ্গিনীদের উপস্থিতি। যদিও তাদের নাম বা স্বতন্ত্র পরিচয় পাওয়া যায় না। ভাবতে আশ্চর্য লাগে উপস্থিতি সত্ত্বেও বাউল সাধনার ক্ষেত্রে ঐ সব মহিলা-বাউলরা উপেক্ষিত কেন? বাউলদের সাধন ক্রিয়ায় নারী সঙ্গের কথা উল্লেখ থাকলেও কোথাও কখনও এ নারী বা সাধিকার নাম উল্লেখ নেই। যেমন লালন ফকিরের সাধিকার নাম উল্লেখ আমরা কোথাও দেখি না। চণ্ডীদাসের মত লালনও তাঁর সাধিকাকে অমর করে রেখে যেতে পারতেন তাঁর গানগুলিতে।

বাঁকুড়া জেলার নবাসন গ্রামের হরিপদ গোস্বামী রাঢ় অঞ্চলের বিখ্যাত বাউল গুরু। তিন দিনের সাধনায় নারীর ভূমিকা সম্পর্কে তিনি বলেন যে, 'প্রবর্ত' স্তরে তারা যোগাসন, বিন্দু ধারণ, মন্ত্র প্রকৃতি সঙ্গ করার শিক্ষা গ্রহণ করেন। এবং সাধক অবস্থায় যুগল ভজন করেন। সিদ্ধির স্তরে উঠে গেলে তাদের আর নারীর প্রয়োজন হয় না। তাই তিনি আরও বলেন যে নারী সিদ্ধস্তরে পৌঁছানোর মাধ্যম মাত্র। ফলে নারীর আলাদা কোনো সিদ্ধিলাভ হয় না। তাই তাদেরকে বাউল

সাধিকা বলা যায় না।

আসলে বাউল সম্প্রদায়ের কেউ বাউলদের সঙ্গিনী হয় না। বাউলদের যে সমস্ত সঙ্গিনী দেখা যায় তারা আসে গ্রাম বাংলার অসহায় পরিবার থেকে, যারা বেশির ভাগই বিধবা। এমন মহিলা সঙ্গিনী বিরল, যারা সঙ্গিনী হবার আগে কুমারী ছিলেন।

বাউল সম্প্রদায়ের কিছু অংশকে ফকির বলা হয়। এই ফকির শব্দটি হল আরবী শব্দ। এর অর্থ যিনি স্বেচ্ছায় দারিদ্র্যকে বরণ করে নিয়েছেন। সাধারণত মুসলমান বাউলদের ফকির বলা হয়ে থাকে। যদিও অক্ষয় কুমার দত্ত মহাশয় ফকির সম্প্রদায় নামে একটি সম্প্রদায়ের উল্লেখ করেছেন। তিনি 'ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায়' গ্রন্থে বলেছেন—

"কিছুদিন হইল গোয়াড়ী কৃষ্ণনগর অঞ্চলে ফকির নামে একটি উপাসক সম্প্রদায় প্রবর্তিত হইয়াছে। ইহার মধ্যে হিন্দু মুসলমান উভয় জাতির লোকই আছে। অধিকাংশই মুসলমান, হিন্দুর ভাগ অতি অল্প। হিন্দু ফকিরের সকলেই গৃহী, মুসলমান দিগের মধ্যে উদাসীনের অংশ অতি অল্প। ইহারা ঘোষ পাড়ার মতের অনুরূপ মতাবলম্বী।... বোধ হয় ইহারা ছদ্মবেশী কর্তাভজা.... ইহারা পীর পয়গম্বর কিছুই মানে না।"

তবুও এদেরকে কোনো সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত করা যায় না। বর্তমানে আমরা ফকির বলতে গরীব লোক বুঝি। মুসলমান সাধক হিসাবে পরিচয় দেবার জন্য তাদের নামের আগে ফকির শব্দটা ব্যবহার করা হয়। যেমন ফকির পাঞ্জু শাহ্, ফকির মহম্মদ বিশ্বাস, ফকির মিঞাজান, ফকির আকবর শাহ্ প্রমুখ। উপেন্দ্র নাথ ভট্টাচার্যের মতে—

> "ফকিরের ধর্ম হল আউল বাউলের ধর্ম - জাতি ধর্ম সংস্কার
> নির্বিশেষে একটা নির্দিষ্ট সাধন মার্গের ধর্ম।"

বাউল সাধনার প্রসারে সুফী ধর্মের গুরুত্ব অশেষ। সুফী দর্শন- তত্ত্ব হল বিশাল। এই মত বাউল কবি কীর্তনীয়াদের গানে যথার্থতা লাভ করেছে। সুফী কথার অর্থ হল শাস্ত্র পন্থা, দর্শন, মরমিয়াবাদ। অন্যান্য অনেক সাধনার মতো সুফী সাধনাতেও গুরুর ভূমিকা রয়েছে। এখানে গুরুকে বলা হয় মুরশিদ বা পীর বা শেখ। আর শিষ্যকে বলা হয় 'মুরিদ, দীক্ষা গ্রহণের পর তিনি হন সালিখ, যার দায়বদ্ধতা থাকবে ধর্মের কাছে। এই দায়বদ্ধতা বাউলেরা তাদের গানের মধ্যে দিয়ে প্রকাশ করেছেন। সে সম্বন্ধে ডঃ শশীভূষণ দাশগুপ্ত তাঁর Obscrue Religious cult (1969) বইতে বলেছেন—

"In the Murshid- songs of the Baul we find a mixture of the Indian sprit with the sprit of sufism. The excellence of the Murshid a songs of the Bauls consists in their pathos, in their expression of the groaning and the beating heart of the restless aspirers, additional charm has been imparted to the songs by the unconditional self-reignation of the murid or the disciple, who has accepted the Murshid as a sure most in the boundless hearing sea of existence - like a lamp in the abyss of darkness."

বাউল সাধনা জীবনের দর্শনে সমৃদ্ধ। বাউলের তত্ত্ব ও জীবন সম্বন্ধে দর্শনগুলি প্রায় সমপর্যায়ের। তাই বাউল তত্ত্ব আলোচনা করতে গিয়ে আমাদের অবগত হওয়া প্রয়োজন তাদের

জীবন দর্শন প্রসঙ্গে। আমাদের জানা উচিত যে বাউল সাধনা কোনো ধর্মের সাধনা বা তত্ত্ব নয়। এই সাধনা অনুযায়ী ভোগের বিষয়টি সিদ্ধিলাভের মাধ্যম হিসাবে বিবেচিত। এখানে ভালবাসা আসক্তিহীন, সাধক এখানে সব দান প্রতিদানের উর্ধ্বে, কোনো কিছু পাওয়া বা না-পাওয়ার নিরাশা তাকে স্পর্শ করে না। এই ভালবাসাকে বাউল 'নিহেতু' প্রেম বলেছে—

"মহাভারতের মানুষ হয় যে জনা
তারে দেখলে যায় রে চেনা।
ও তার আঁখি দুটি ছল ছল
মুখে মৃদু হাসি খানা।
সদাই রে তার শান্তরতি
হৃদে কমলে জ্বলছে বাতি
রসিক সুজনা,
ও তার কাম-নদীতে চর পড়েছে
প্রেম নদীতে জল ধরে না
দেখলে যায়রে চেনা।
ফুলের আশা করো না যে
ফুলের মধু পান কর সে
রসিক সুজনা।
ও সে অনুরাগের কপাট মেরে
নিহেতু বেচা কেনা
দেখলে যায় রে চেনা।"

জীবনকে গভীর ভাবে না জানলে এই তত্ত্ব সম্পর্কে অবহিত হওয়া সম্ভব নয়। জীবন সমুদ্রের অতলে অবগাহন করে জীবন রহস্যের জট খোলাই বাউলের কাজ।

আমাদের একটা বড় ভুল এই যে, আমরা কোনো অখণ্ড সত্য বা তত্ত্বকে আমাদের জীবনের প্রয়োজনের তাগিদে তাদেরকে খণ্ড উদ্দেশ্যে ব্যবহার করি। কিন্তু 'বাউল' বলেছে—

'নিঠুর গরজী
তুই কি মানস মুকুল।
ভাজবি আগুনে?
তুই ফুল ফুটাবি-বাস ছুটাবি সবুর বিহনে।"

বাংলার মাটিতে বাউল একটি বিশিষ্ট সম্প্রদায় হিসাবে পরিচিত, তাদের জীবন দর্শন হল অভিন্নতা, সংঘাতের মধ্যে সমন্বয়, অন্ধকারের মধ্যে আলোর সন্ধান। বাংলার বাউলরা সারা বিশ্বে এক বিস্ময়। বাউল জীবনদর্শনের মূল বৈশিষ্ট্য মানব প্রেম। তাদের পোষাক পরিচ্ছদ, জীবন ধারণ পদ্ধতি সব কিছুতেই রয়েছে স্বাতন্ত্র্য বৈশিষ্ট্য।

বাউলেরা কখনো মানুষের মধ্যে অসমতাকে প্রশয় দেননি। তারা সর্বদা ছিল জাতিভেদ প্রথার বিরুদ্ধে। বাউল জাতিভিত্তিক সংস্কার থেকে মুক্ত, তারা তাদের ভাবাদর্শে ও কর্মক্ষেত্রে জাতিভেদ প্রথাকে উপেক্ষা করে চলে। তাদের মতে সকলেই স্পৃশ্য, অস্পৃশ্য কেউই নয়। এই

ভেদ করার ক্ষমতা মানুষের নেই। মানুষ পৃথিবীতে আসে কিছু কাজ করার জন্য। সেই কাজ সর্বদা মানুষের মঙ্গলকে লক্ষ্য করেই হওয়া উচিত, কিন্তু এই ভেদ প্রথা মানব তথা মানব সমাজের অমঙ্গল সূচিত করে। তাই তারা বলে—

"নোংরা মন আমার, মুদলে আঁখি দেখতে পাবি
জাতের মিথ্যা অভিমান।
ওরে সবার উপরে মানুষ সত্য
ওরে মন সবার পিতাই ভগবান
কেউবা ফরসা কেউবা কালো
আবার কেউ কুৎসিত, কেউ যে ভালো।
ওরে মন, এক ঘরের ছেলে সবাই
মূলে দেখ এক পিতার সন্তান।"

ঠিক একই ভাবে বাউল, ধর্মের গোঁড়ামিকে প্রশয় দেয় না। বাউলের তত্ত্ব অনুযায়ী তারা মূর্ত্তি পূজার পরিবর্তে মানব প্রেমেই বিশ্বাসী। রামকৃষ্ণের মূর্তির পরিবর্তে তাদের যে প্রেমের বন্ধন সেটাই তাদের উপাস্য। তারা সংগীতের মাধ্যমে তাদের প্রেম নিবেদন করেন, ধর্মের ভেদকে তারা এক কথায় অস্বীকার করে বলেছেন—

"কেউবা ডাকেন মসজিদে, আবার কেউবা ভজেন মন্দিরে,
আর কেউবা যপেন গির্জাতে, আর কেউবা বৌদ্ধ বিহারে,
ওরে পথ মতে হোক না প্রভেদ, মূলে দেখা নাইকো ব্যবধান।
কেউবা বলেন গড, কি বুদ্ধ, আর কেউবা বলেন হরি,
আবার কেউবা ডাকেন খোদাতাল্লা, ওরে ভিন্ন পথ ধরি
ওরে, রাম রহিমের এক ঠিকানা, ডাকলে সাড়া পান।"

ধর্ম সম্পর্কে বাউল সাধকের এটাই হল তত্ত্ব বা মূল কথা, তাই তারা মানুষের মধ্যে ধর্মের বিভাজন সৃষ্টিকে অন্যায় কাজ বলে মনে করেন। তাই তারা বলেন—

"আমি মরছি খুঁজে সেই দোকানের
সহজ ঠিকানা
যেথা আল্লা, হরি, রাম, কালী, গড্
এক থালাতে খায় খানা।"

তাই আমরা বলতে পারি বাউলদের এই মানব প্রেমের মন্ত্রই হবে, সাধারণ মানুষের একমাত্র উপাস্য।

কবীর বলেন,—

"মন্দিরে বা মসজিদে যদি ভগবানকে খোঁজ কর তবে ঝগড়া মিটিবে না। তিনি সবার অন্তরে। সকল মানব দেহের মধ্যেই ভগবানকে পাইলে সব ঝগড়াই মিটিয়া যাইবে। অন্তরে খোঁজ কর। খোদা যদি মসজিদেই থাকনে তবে বাকী জগত কাহার? তীর্থের মূর্তিতেই রাম থাকিলে কেহ-ই তো তাহাকে পাইবে না? পূর্বে থাকেন হরি, পশ্চিমে থাকনে আল্লাহ। আরে অন্তরের

মাঝেই খুঁজিয়া দেখ সেখানেই রাম রহিম।"

"ঔর খুদাই মসজিদে বস্তু হৈ
ঔর মুলুক কিসকো
তীরথ মূরত রাম নিবাসী দুহুমেঁ
কিনহুঁন হেরা।
পুরব দিসা হরিকা বাসা পছিম অলহ মুকামা
দিলহী খোঁজি দিলে দিল
ভিতরী ইহা রাম রহিমানা।"

বাউল মতের সব কথাই কবীরের মধ্যে পাওয়া যায়। তেমনি হিন্দু মুসলমানের মিলন কামনা করে দাদূও বলেছিলেন—

"হিন্দু তুরুক না হোইবা সাহিব সেতী কাম' অর্থ হল, না হিন্দু না মুসলমান স্বামীর সঙ্গেই তোমার কাজ।

এইবার বাউলের ধর্মতত্ত্ব ও সাধন তত্ত্ব সম্পর্কে আলোচনা করা যাক। এই প্রসঙ্গে প্রথমেই আমাদের মানুষের কথা ব্যাখ্যা প্রয়োজন। অন্তর্যামী অর্থেই বাউল তত্ত্বে 'মানুষ' শব্দটি ব্যবহৃত হয়। মানুষ শব্দটির তিন প্রকার অর্থ আছে—

১। ঈশ্বর, ২। অন্তর্যামী, ৩। অক্ষর পুরুষ বা সাক্ষী সত্তা

ঈশ্বর : মানব জীবনের আশ্রয় হল ঈশ্বর। আমাদের সমস্ত সাধনার মূল লক্ষ্য তিনি।

অন্তর্যামী : আমাদের অন্তরে নিভৃতে যাকে একা পাই; আমাদের সুখ, দুঃখ, চিন্তা সমস্ত কিছু যার সঙ্গে মনের মধ্যে ভাগ করে নিতে পারি তিনি হলেন অন্তযমী। এই অন্তর্যামীই হল 'মনের মানুষ'।

অক্ষর পুরুষ : আমাদের মধ্যে দুটি আমিত্ব আছে। এক আমি সংসারে সুখ দুঃখ উচ্ছ্বাস আলোড়নে আলোড়িত হয়, আর এক আমি এসব কিছুর মধ্যেও নিজেকে স্থির রাখে; সেই আমিই হল অক্ষর পুরুষ।

আমাদের জানা প্রয়োজন যে, বাউলের সাধনা কতগুলি তত্ত্বের মধ্যে দিয়ে বিস্তার লাভ করেছে। সেগুলি হল (১) **সহজতত্ত্ব**, (২) **মানুষতত্ত্ব**, (৩) **গুরুতত্ত্ব**, (৪) **রূপতত্ত্ব**, (৫) **রসতত্ত্ব**, (৬) **রসিকতত্ত্ব**, (৭) **দেহতত্ত্ব**। আমরা এগুলি নিয়ে স্ববিস্তারে আলোচনা করতে পারি—

সহজতত্ত্ব : যেহেতু বাউল সাধনা সহজের সাধনা, সেই জন্য তাদের সহজিয়া বলা হয়। কিন্তু এই সহজ তত্ত্বটি কি তা জানা যাক।

প্রথমত, বাউলের ধর্ম কোনো সাম্প্রদায়িক ধর্মকে অবলম্বন করে নয়। মানুষের মনের সহজাত ধর্মই হল বাউল ধর্ম। যে ধর্ম কোন জাতপাতের গণ্ডীর মধ্যে সীমায়িত নয় সেই ধর্মই হল বাউল ধর্ম।

দ্বিতীয়ত, এই ধর্ম কোনো তথাকথিত শাস্ত্রানুযায়ী নয়। এই তত্ত্ব অনুযায়ী হৃদয়ের অনুপ্রেরণা থেকে এই ধর্মের উদ্ভব।

তৃতীয়ত, বাউলেরা কোনো নির্দিষ্ট ধর্মীয় আচার আচরনে বিশ্বাসী নয়।

চতুর্থত, এরা শরীর মনকে কষ্ট দিয়ে সাধনার পক্ষপাতী নন। এরা ভোগের মধ্যে দিয়ে

সাধনার পক্ষপাতী।

মানুষতত্ত্ব : এর আগে বাউলের ধর্মে মানুষ শব্দের ব্যাখ্যা দিয়েছি। এই তত্ত্বটি বাউল সাধনার শ্রেষ্ঠ তত্ত্ব। ঈশ্বরকে আমরা সাধারণ মানুষের থেকে দূরে রাখি এবং তিনি যে আমাদের কাছে সহজলভ্য নন তা আমরা জানি। তাই আমাদের পূজাই তাকে আমাদের থেকে ব্যবধানে রাখে—

"দেবতা বলে দূরে রই দাঁড়ায়ে
বন্ধু বলে দুহাত ধরিনে।" —*রবীন্দ্রনাথ, 'গীতাঞ্জলি'*

রবীন্দ্রনাথের মতে, বাউল তার মনের মানুষকে তার মনের কাছে টেনে আনে বন্ধু রূপে। ফলে তাঁকে সে মনের মানুষ করে নিয়েছে—

"আমার মনের মানুষ যে রে,
আমি কোথায় গেলে পাব তারে
হারায়ে সেই মানুষে
দেশ বিদেশে বেড়াই ঘুরে।"

গুরুতত্ত্ব : বাউলের সাধনা মুখ্যত গুরু কেন্দ্রিক, অর্থাৎ কোনো শাস্ত্র দ্বারা এই সাধনা নিয়ন্ত্রিত নয়। এখানে গুরুর কাছ থেকে শিক্ষার মাধ্যমে এই সাধনা কার্যকারী।

"মন লওরে গুরুর উপদেশ
জানতে পার সহজে।

আমাদের দেশের সকল প্রকার সাধনাতে গুরুর একটা বিশেষ ভূমিকা আছে। গুরু এখানে একটা তত্ত্ব স্বরূপ। প্রতিদিনের নানা আলোড়নে জীবন বিক্ষুব্ধ হচ্ছে। তা আমাদের দৃষ্টিকে রুদ্ধ করে সত্যের শুদ্ধ রূপকে আমাদের থেকে দূরে সরিয়ে নিয়ে যায়। আমাদের ব্যক্তিগত স্বভাবের জন্য সত্যকে আমরা বদলাতে চাই, আমাদের মনের মতো করবার জন্য। এই ব্যক্তিগত প্রভাব দূর করার এক মাত্র উপায় হল নিজেকে পুরোপুরি নিষ্ক্রিয় করে, মনকে আলোড়ন-হীন করে সেই সত্যকে তুলে ধরা।

এই তত্ত্বের মর্ম হল, গুরুই পরম পুরষ—

গুরু রূপের পুলক ঝলক দিচ্ছে যার অন্তরে
কিসের আবার ভজন সাধন লোক জনিত করে
অধীন লালন বলে গুরু রূপে নিরূপ মানুষ ফেরে।
এই ভবে নিরূপ মানুষ ফেরে—

রূপতত্ত্ব : এই তত্ত্ব অনুযায়ী তিনিই অরূপ ও অসীম, যাকে ধরা যায় না। যাকে ধরা যায় সেগুলি হল রূপের জগৎ, সীমার জগৎ, কিন্তু যিনি অসীম তাব লীলা কিন্তু এই সীমার জগতেই।

"সীমার মাঝে অসীম তুমি
বাজাও আপন সুর।" —*রবীন্দ্রনাথ, 'গীতাঞ্জলি'*

রসতত্ত্ব : রস সাধনাই হল বাউল সাধনা। বাউল সাধনার পথ হল রসের দ্বারা, প্রেমের দ্বারা, আনন্দের দ্বারা স্পন্দিত। তাই বাউলরা নিজেদের 'অনুরাগী' বলে পরিচয় দেন।

"মরি রাগে অনুরাগের বাতি
জ্বালগে নিজ ঘরে
কোন ধামেতে আছে মানুষ
চিনে নেও গে তারে।"

আবার—

"অনুরাগ নইলে কি সাধন হয়
ভজন সাধন সুখের কর্ম
ঐ দেখ তার সাক্ষী চাতক হে
অন্য বারি খায় না সে।"

রসের উপলব্ধির মধ্যে দিয়ে লাভ করা যায় বাউল সাধনার স্বার্থকতা।

রসিকতত্ত্ব : রসের স্বরূপ নির্ণয় হল রসিক তত্ত্বের কাজ। বাউল সাধনার রস হল প্রেমের রস —

'প্রেমের সন্ধি আছে তিন
সরল রসিক বিনে জানা হয় কঠিন।"

অথবা—

"শুদ্ধ শান্ত রসিক হলে
তবে অধর মানুষ মেলে
রূপ নেহারে গোল করিলে
এসে মানুষে যায় ফিরে,
কত জন পার হব বলে
বসে আছে নদীর কূলে
হঠাৎ করে নামতে গেলে
ধরে খায় কাম কুম্ভীরে।"

যে রসিক সেই কেবল প্রেমের আস্বাদ লাভ করতে পারবে।

দেহতত্ত্ব : বিষয়টি বেশ জটিল। এই তত্ত্ব আমাদের মানবদেহের ভেতরের পরিচয় দিয়ে থাকে। আমাদের দেহের ও মনের স্বরূপ, প্রকৃতি ইত্যাদির বর্ণনা বা ব্যাখ্যা দিয়ে এক এক বিভাগ রচিত হয়—

"সে ঘরের আট কুঠুরী
দরজা সারি সারি,
বলিহারী কুদরত তার
ঘরামীর উদ্দেশ করা ভার।
সে ঘরের চিলে কোঠা
সপ্ততালায় আয়না আঁটা
তার রূপের ছটা চমৎকার-

ঘরামীর উদ্দেশ করা ভার
মানিক মুক্তা লাল জওহরা
সেই ঘরে আছে পুরা
ষোল জন দেয় পাহারা
দুইজনে তার চৌকিদার
ঘরামীর উদ্দেশ করা ভার।"

এটা হল ভিতরের ব্যাপার। আবার তার প্রকৃতি এবং সম্ভাবনা সম্বন্ধে বলা হচ্ছে :

"আছে চাঁদ মেঘে ঢাকা
চাঁদের নীচে বিন্দু সখা।
মেঘের আড়ে চাঁদ রয়েছে
মেঘ কেটে চাঁদ উদয় করা
সেটা কেবল কথার কথা।"

এখানে প্রাকৃত দেহের ভিতর যে অপ্রাকৃত এক প্রকাশ্য অবস্থার সৃষ্টি হয় সেই সৃষ্টির যে কৌশল তারই ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে।

আমাদের মনের মধ্যে এক ধরনের মানুষ থাকে যার কাছে আমাদের এই মানব দেহটাই হল মন্দির স্বরূপ। আমরা তাকে খুঁজে খুঁজে হয়রান হচ্ছি। কিন্তু তিনি সর্বদা আমাদের মনের মধ্যেই অবস্থান করছেন—

"আছে যার মনের মানুষ মনে
সে কি জপে মালা
অতি নির্জনে বসে বসে
দেখছে খেলা
কাছে রয় ডাকে তারে উচ্চস্বরে
কোন পাগলা।
ওরে যে যা বোঝে তাই সে বুঝে
থাকলে ভোলা।
যথা যার ব্যথা নেহাৎ সেইখানে হাত
ডলামলা।
ওরে তেমনি জেনো মনের মানুষ
মনে তোলা।"

আসলে—

"আমাদের বাঙলার নিরক্ষর পল্লীতে, এই গভীর মরমী সাধনা, শিক্ষিত লোকচক্ষু এবং লক্ষ্যের অগোচরে একান্তে, নিভৃতে তার অমূল্য সম্পদ নিয়ে অবস্থান করছে। দেখে মন বিস্ময়ে আবিষ্ট হয় যে, এমন একটি অজ্ঞাত, অখ্যাত পল্লী সাধনার মধ্যে জীবনের শ্রেষ্ঠতম, সূক্ষ্মতম, উচ্চতম, এবং আধুনিকতম তত্ত্ব এবং সত্যগুলি এমন সহজে সৌন্দর্যে পুষ্পিত হয়ে আছে।"—বিচিত্রা, চৈত্র, ১৩৪৩।

চর্যাপদের সমকাল থেকে বাংলা সাহিত্যে ও সংস্কৃতিতে বাউল ও তার সমার্থক শব্দ ও সাধনার অস্তিত্ব আবিষ্কার করা যায়। নাথ সাহিত্যেও বিশিষ্ট দেহ সাধক হিসাবে বাউল শব্দের ব্যবহার আছে। আবার বৈষ্ণব আন্দোলনের সঙ্গেও বাউল মতবাদের একটি বিশেষ সম্পর্ক আছে। 'চৈতন্য চরিতামৃতে' ডঃ সুকুমার সেন বাউল বা ভিখারীর পূর্ণাঙ্গ চিত্র খুঁজে পেয়েছেন। সন্ন্যাসী, উন্মাদ প্রভৃতি অর্থে বাউল শব্দ ব্যবহৃত হয় 'চৈতন্য চরিতামৃত' কাব্যে। কিন্তু বাউল সাধনার বিকাশ ঘটে আরও অনেক পরে। উনিশ শতকের শেষের দিকে যখন মধ্যবিত্তের মনে ইংরেজ বিরোধী মনোভাব দেখা দিয়েছিল এবং সেকালের রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান ইণ্ডিয়ান এ্যাসোসিয়েশন বা কংগ্রেস মধ্যবিত্তদের পথ দেখাতে পারছিল না, ইংরেজী শিক্ষা মধ্যশ্রেণীকে জনগণ থেকে বিচ্ছিন্ন করে দিয়েছিল সেই সময় বিহারীলাল জটিল আত্মকথার আবেগকে প্রাধান্য দিয়ে বাউল হিসাবে নিজেকে কল্পনা করে লিখলেন 'বাউল বিংশতি'। রবীন্দ্রনাথ তাঁর সূত্রেই বাউল ভাবনার উত্তরাধিকার লাভ করেন। এর পর থেকেই বাউল গীতির প্রসার ঘটতে শুরু করে। একথা বলা বাহুল্য যে, বাউল গানকে সর্বজন গ্রাহ্য করে তোলার মূলে যাঁদের অবদান সর্বাধিক তাঁরা হলেন রবীন্দ্রনাথ ও লালন শাহ।

আটের দশকে মুদ্রাযন্ত্রের প্রসার ঘটার ফলে পূর্ব ও পশ্চিমবঙ্গে বেশ কিছু বাউল গীতি সংকলন প্রকাশিত হয়। গোঁসাই গোপাল, লালন, হাউড়ে (মতিলাল সান্যাল) দুদ্দু শাহ, পাঞ্জু শাহ প্রভৃতি মানুষেরা ছিল বাউলের স্বীকৃত মহাজন, তবে মূলত লালনের হাত ধরেই বাউল গান বিশ্বের দরবারে স্বীকৃত হতে থাকে। তাই আমরা লালনের গানের মূল্যায়নের মাধ্যমে বাউল সাধনার শ্রেষ্ঠ সময়টাকে তুলে ধরতে চাই। তবে প্রতিটি বস্তুর মূল্যায়নের কিছু সূত্র থাকে, সাহিত্য সংস্কৃতি প্রভৃতি মানসিক গুণের মূল্যায়নের ক্ষেত্রে আর্থ সামাজিক ব্যবস্থা, স্থান কাল প্রভৃতিকে স্বীকার করে নেওয়া হয়।

লালন গীতিসাহিত্যকে ধর্মসাহিত্য বলা হয়। ফলে এর মূল্যায়ন হবে আধ্যাত্মিক মানদণ্ডকে স্বীকার করে নিয়ে। এই ধর্ম সংগীত শাখার অন্তর্ভুক্ত হল- বাউল গান, কর্তাভজাদের ভাবের গীত, চর্যাপদ, বৈষ্ণব পদাবলী, শাক্ত পদাবলী প্রভৃতি। এই সংগীত সাধারণ লৌকিক বা সাহিত্য সংগীত থেকে আলাদা, এক ধরনের ধর্মীয় বিশ্বাস বা প্রেরণা এই ধরনের সংগীতের মূলে কাজ করে। বৈষ্ণব সাহিত্যের মূল্য নির্ধারণে যেমন শ্রীরূপ গোস্বামীর 'উজ্জ্বল নীলমণি', 'ভক্তি রসামৃতসিন্ধু' প্রভৃতি গ্রন্থ গুরুত্বপূর্ণ, তেমনি চর্যাপদের রসবিচারে বৌদ্ধ সহজিয়া সিদ্ধাচার্যগণের আলোচিত দর্শন গ্রহণযোগ্য। কিন্তু বাউল গান তথা এই জাতীয় ধর্ম সংগীত মূল্যায়নের মানদণ্ড নেই বললেই চলে। বড়জোর আমরা বৈষ্ণব সহজিয়ার লৌকিক আধ্যাত্মিক ধারার ইতিহাস স্মরণে রাখতে পারি।

ভারতীয় দর্শনের দুটি উৎস মুখ। এক ধারাতে বলা হয় জীবন দুঃখময়, এর থেকে উত্তীর্ণ হওয়াই হল সিদ্ধি। সাংখ্য মতানুসারে আধিদৈবিক, আধিভৌতিক, আধ্যাত্মিক এই তিন প্রকার দুঃখ থেকে মুক্তি লাভই হল পরমার্থ।

আর একটি ধারা অনুযায়ী জীবন আনন্দময়, ''আনন্দাদ্ধ্যেব খল্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে। আনন্দেন জাতানি জীবন্তি। আনন্দং প্রখ্যন্ত্য ভিসং বিশন্তীতি''- তৈত্তিরীয় ভৃগুবল্লী ৩/৬/১, জীবনের এই দুঃখ ও আনন্দ উভয়ই কিন্তু ক্ষণিকের। এই দুঃখবাদ ও আনন্দবাদের অনুসরণ লালন

ফকিরের অধ্যাত্ম সাধনা ও সংগীতের মধ্যে পাওয়া যায়। লালনের গানের সারবস্তু আধ্যাত্মিক জীবনাশ্রিত। তাই একে সাধন সংগীত বলে। জীবনের অভীষ্ট বস্তুর অনুভূতি ও আস্বাদন এবং সেই পথেই সাধনায় সিদ্ধিলাভ হয়।

অধ্যাত্ম সম্পর্কে গীতায় ভগবৎ উক্তি—"স্বভাবোঽধ্যাত্মমূচ্যতে" (৮/৩)। লালন গীতের বিষয় বস্তু, ঘর, বাড়ি, জাতি, সামাজিক আচার, নৈতিক বিচার, সমসাময়িক দিক দিয়ে আর্থ-সামাজিক জীবনের সব কিছুই যে সমাদৃত তার মূলও এই 'স্বভাব' শব্দটির ব্যঞ্জনার অন্তর্গত। লালনের সামাজিক কবিতা এই প্রসঙ্গে আলোচনা করা যেতে পারে—

"এমন সমাজ কবে গো,
সৃজন হবে
যেদিন হিন্দু-মুসলমান-বৌদ্ধ-খ্রীষ্টান
জাতি গোত্র নাহি রবে.....
ধর্ম কুল-গোত্র জাতির
তুলবে না গো কেহ জিগীর
কেঁদে বলে, লালন ফকির
কে বা দেখায়ে দেবে।"

এই যে বৈষম্যহীন নিখিল বিশ্বের মানুষের বর্ণহীন, মানবত্বের একত্বে ঈপ্সিত অধিষ্ঠান, তাই ফুটে উঠেছে এই গানে। লালন সাহিত্যের রস আস্বাদনে শুধু সামাজিক আদি বিষয়ই নয়, ভাব- তত্ত্ব-ভক্তি, মনঃশিক্ষা সব বিষয় বস্তুর মধ্যেই এই দৃষ্টিভঙ্গির কথা স্মরণীয়। লালনের গানে মনের মানুষের সন্ধানের আকুতি আছে। গুরুর প্রতি শিষ্যের কর্তব্য, আল্লা রসুলের প্রশস্তি — এ সবই বাউল সহজিয়ার লক্ষণ। সেই সময়কার প্রশস্তি এ সবই বাউল সহজিয়ার লক্ষণ, সেই সময়কার কাব্য পরিভাষার বেশ কিছু প্রচলিত চিত্রকল্প তাঁর গানে স্থান পেয়েছে।

যেমন—

১। "আমি একদিনও না দেখিলাম তারে
আমার বাড়ির কাছে আরশী নগর
এক পড়শী বসত করে।
গেরাম বেড়ে অগাধ পানি
ও তার নাই কিনারা নাই তরণী
পারে।
মনে বাঞ্ছা করি দেখব তারে
আমি কেমনে সে গাঁয় যাইবে!
কি কব সেই পড়শীর কথা
ও তার হস্তপদ স্কন্ধ মাথা
নাইরে!
সে ক্ষণেক থাকে শূন্যের উপব
ক্ষণেক ভাসে নীরে।

পড়শী যদি আমায় ছুঁতো
আমার যম যাতনা যেত
দূরে।
সে আর লালন একখানে রয়
তবু লক্ষ যোজন ফাঁকরে।"

২। "খাঁচার ভিতর অচিন পাখী
কেমনে আসে যায়।
ধরতে পারলে মন বেড়ী
দিতাম তাহার পায়।
আট কুঠুরির নয় দরজা আঁটা
মধ্যে মধ্যে ঝলকা কাটা
তার উপরে আছে সদর কোঠা
আয়না মহল তায়।
মন, তুই রইলি খাঁচার আশে
খাঁচা যে তোর তৈরী কাঁচা বাঁশে
কোন দিন খাঁচা পড়বে খসে
লালন কয় খাঁচা খুলে সে পাখী
কোন খানে পালায়।"

তাছাড়া আরও কিছু গানের উদাহরণ আছে।
যেমন—

"মেঘের বিদ্যুৎ মেঘে যেমন,
লুকালে না পাই অন্বেষণ।
কালারে হারায়ে তেমন
ঐ রূপ হেরি এ দপর্ণে।"

আমরা লালনের গানগুলিকে বিষয় অনুসারে বিভাজিত করতে পারি। যেমন—

	বিষয়	গানের সংখ্যা
১।	গৌরাঙ্গ	১৪
২।	মুরশিদ	২২
৩।	গুরু	২০
৪।	মারফত	৭
৫।	দয়াল কাণ্ডারী	১৫
৬।	বৈরাগ্য	১৫

৭।	মানুষ	৯
৮।	মনের মানুষ	৫
৯।	রসিক মানুষ	৬
১০।	সাধনপন্থা	৭
১১।	প্রেম	১৫
১২।	মনঃশিক্ষা	১৭
১৩।	ভাবাত্মিক পদ	২৪
১৪।	দেহতত্ত্ব	৫২
১৫।	ইসলাম প্রসঙ্গ	৫২
১৬।	বিবিধ	২০

লালনের গানের কোন নির্দিষ্ট সংখ্যা আমাদের জানা নেই। কারণ লালনের বেশির ভাগ গানই লিপিবদ্ধ নয়। আসলে লালন তা চাননি। তাঁর মতে গান যদি লিপিবদ্ধ হয় তবে তা হবে বদ্ধ জল। তিনি ছিলেন স্বভাব কবি, তিনি মুখে মুখে গান বানিয়ে তখনি শোনাতেন। সেই গান সংস্কারের সুযোগ থাকত না। ছন্দ নিয়েও তিনি কখনও মাথা ঘামাতেন না। তা সত্ত্বেও তাঁর রচিত সমস্ত গানই ছিল উচ্চকোটির। কবিতা হিসাবেও সেগুলি ছিল সাহিত্যিক গুণসম্পন্ন।

যেমন এই গানটি বৈষ্ণব ভাবের—

"সে ভাব সবাই কি জানে,
যে ভাবে শ্যাম আছে বাঁধা গোপীর সনে।
গোপী বিনে জানে কেবা শুদ্ধ রস অমৃত সেবা
গোপীর পাপ পুণ্য জ্ঞান থাকে না কৃষ্ণ দরশনে।...
টলে জীব অটল ঈশ্বর তাইতে কি হয় রসিক নাগর
লালন কয় রসিক বিভোর রস ভিয়ানে।"

সহজিয়া ভাবের একটি গানের নমুনা দেওয়া যেতে পারে—

"এই মানুষে দেখ সেই মানুষ আছে,
কত মুনি ঋষি চারিযুগ ধরে বেড়াচ্ছে খুঁজে।
জলে যেমন চাঁদ দেখা যায়
সে চাঁদ ধরতে গেলে হাতে কে পায়
ওরে, আলেক মানুষ তেমনি সদায়
আছে আলেকে বাস,....
আমার হল কি ভ্রান্তি মন
আমি বাইরে খুঁজি ঘরেরি ধন
সিরাজ সাঁই কয় ঘুরবি লালন
আত্ম তত্ত্ব না বুঝে।"

সহজিয়া ভাবের অন্তর্গত দেহতত্ত্বের একটি গানের উদাহরণ দেওয়া যাক। দেহলীলা ধামে আত্মা বিরাজ করে, সেইজন্য—

"ধররে অধর চাঁদের অধরে অধর দিয়ে
ক্ষীরোদ মৈথুনের ধারা ধর রে রসিক নাগরা
যে রসেতে অধর ধরাতে করে সচেতন হয়ে।....
পঞ্চবানের ছিলে কেটে প্রেম যাচো স্বরূপের পটে
সেরাজ সাঁই বলেরে লালন বৈদিক বানে করিসনে রণ
বান হারায়ে পড়বি তখন রণ খেলাতে হুমড়ি খেয়ে।"

লালন নিরক্ষর হলেও তাঁর শিক্ষা ছিল অসাধারণ। তাঁর জীবনে বৌদ্ধ সহজিয়া, মুসলিম সুফী ও গৌড়ীয় বৈষ্ণব এই তিনটি ধারার সম্মিলন ঘটেছে। তাঁর সাধক জীবনে ও সৃষ্টিতে তিনটি প্রবাহ একসঙ্গে মিলেছে।

লালন সম্পর্কে হাসান আব্দুল কাইয়ুম লিখেছেন—

"লালন মূলতঃ ছিলেন একজন লেখাপড়া না জানা স্বভাব কবি। ...তাঁর একটি কাব্য ধর্মে তিনি আত্মাকে অচিনপাখি রূপে ব্যক্ত করেছেন। আত্মাকে পাখীর সাথে তুলনা করার এই ধারাটি বাংলা সাহিত্যেও যেমন প্রাচীনকাল থেকে লক্ষ্য করা যায় তেমনি বিশ্ব সাহিত্যেও এর নজির পাওয়া যায়। দ্বাদশ শতাব্দীর ফরাসী সুফী কবি হযরত ফরীদুদ্দীন আত্তারের কাব্যে "সী মোরস" বা ত্রিশ পাখীর ধারণার আত্মার বিকাশ শক্তির এক অপূর্ব উপমা প্রস্ফুটিত হয়ে উঠেছে। রূহের (আত্মা) সম্পর্কে জানার জ্ঞান মানুষের নেই। ...রূহের স্বরূপ জানার জন্য ইলমেতাস ওউফে একটি অনুশীলন অধ্যায় আছে যাকে বলা হয় মকামে ইনারত। ইসকাসে বিশেষ নিয়মে সুরাকাবা করলে সাধক রূহের স্বরূপ জানতে পারে, ... রূহের স্বরূপ তার কাছে উদ্ভাসিত হয়ে যায়।... ইলমে তাসা ওউফোর দশটি লতিকার অন্যতম হচ্ছে রূহ। এর স্থান হচ্ছে বুকের ডানদিকে। সুফী যখন নিজেকে জানতে পারে, যখন রূহের স্বরূপ তার কাছে উদ্ভাসিত হয়ে যায় তখন....তার কাছে রূহ অচিন পাখী থাকে না। লালন সাধনার সেই জগতে বিচরণ করার সুযোগ পাননি। তাসা ওউফ চর্চার মাধ্যমে শরীয়তের উপর অটল থেকে যদি আমাদের নিজেকে জানার প্রয়াসে কঠোর সাধনা করি তাহলে অচিন পাখী আমাদের চেনা পাখীতে পরিণত হবে।"

অচিনপাখির এই আকুলতাই তাঁর গানের বিষয়, সেটাই সৌন্দর্য। আর এক লেখক ওয়াকিল আহমেদ বলেছেন—

"মধ্যযুগের মুসলমান গীতিকাররা রাধাকৃষ্ণ বিষয়ক বৈষ্ণব পদ লিখেছেন। নজরুল পীর পরিবারে জন্মগ্রহণ করে উত্তম শ্যামা সংগীত লিখেছেন। লালন শাহ হিন্দুয়ানী বিষয় নিয়ে গান রচনা করেছেন এমন এক উদ্দেশ্যে যেখানে সমাজ সংস্কৃতি ধর্মগত ভাবে হিন্দু মুসলমানের মিলন কামনা করেছেন।"

লালনকে কোন ধর্মীয় গণ্ডীতে আবদ্ধ না রেখে বুঝতে হবে চিরায়ত বাউল ধারায় তাঁর সাধনায় ও মননে, একক সমতা আর ব্যক্তিত্বের গভীরতায়, যা রূপ লাভ করেছে তাঁর গীত—বাণীতে। বাংলা কবিতায়, ব্যক্তিক কবিতার যেমন সবচেয়ে সফল রবীন্দ্রনাথের কাব্যে ; লালনের

গানে তেমনি বাউল সাধনার চরম অভিব্যক্তি লাভ করেছে।

ঐতিহ্যের সঙ্গে জড়িয়ে থেকে রবীন্দ্র কবিতা যেমন প্রাতিস্বিক— তেমনই বাউল ভাবনাকে অতিক্রম করে লালন স্বয়ম্বশ। বাউল মতকে অগ্রাহ্য নয়, অতিক্রম করে লালন তাঁর বাউল কন্‌সেপ্ট তৈরি করেছিলেন। এটাই হল লালন পন্থা, তিনি যেমন বৈষ্ণবীয় দ্বৈতবাদ অবলম্বন করেছিলেন তেমনি সুফী মরমিয়া পথও অবলম্বন করেছিলেন। কিন্তু ইসলামকে শাস্ত্রত তিনি গ্রহণ করেননি, তাঁর প্রমাণ তার দু'টি পদ্যাংশে

১। এমন দিনকি হবে রে আর
খোদা সেই করে গেল
রসুল রূপে অবতার।

২। আদমেতে পয়দা করে
খোদ ছুরাতে পরওয়াব।
ছুরাত বিনে পয়দা কিসে হইল
সেকি হঠাৎ কার?

প্রথম পদে আল্লার রসুল হজরত মহম্মদকে আল্লার অবতার বলা হয়েছে যা ইসলাম বিরোধী। দ্বিতীয় পদ্যাংশে আল্লাকে সাকার ভাবা হয়েছে। কারণ লালন বর্তমানবাদী। সাকারবাদী হলেও লালন পৌত্তলিক নন। তাই তিনি লিখেছেন—

"মানুষ তত্ত্ব যার সত্য হয় মনে ঃ
সে কি অন্য তত্ত্ব মানে।
মাটির টিপী কাটের ছবি
ভূত ভেবিষ আর দেবা দেবী।
ভোলে না সে এসব রূপী
মানুষ ভজে দিব্ব জ্ঞানে।
জোরই শোরই ললা ঝোলা
পেচো পাচী এল ভোলা
তাতে না সে ভোলনে আওলা
জে মানুষ রতন চেনে
ফেউ ফেপী ফেকশা জারা
ভাকা ভুকোয় ভোলে তারা
লালন তম্মী চটী মারা
ঠিক দাড়ায় না এই খানে।।

লালন যেহেতু মানুষ তত্ত্বে বিশ্বাসী সেই কারণে সে অনুমানপন্থী নন। তাই বলা যায় বাউল গান তত্ত্বাশ্রয়ী রচনা। সৃষ্টিতত্ত্ব, দেহতত্ত্ব, নবীতত্ত্ব এই ত্রিস্তরে বিন্যস্ত হয়ে আছে তাদের বিশ্বাসের জগৎ। সমস্ত কিছু কিন্তু গুরুবাদের উপর নির্ভরশীল। সুফীদের যেমন আছে পীর-মুর্শিদ, বাউলদের আছে সাঁই-গুরু।

লালন প্রসঙ্গে রমাকান্ত চক্রবর্তী বলেছেন—

"লালন যে একজন প্রতিভাশালী কবি এবং উচ্চস্তরের সাধক ছিলেন, সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। কিন্তু যেহেতু সামাজিক বিচারে তাঁর কোনো 'জাত' ছিল না তাই তিনি রামপ্রসাদ সেন বা কমলাকান্ত ভট্টাচার্যের মত সম্মান বা স্বীকৃতি পাননি। অথচ যে প্রতিভা তাঁর গীতাবলীতে দেখা যায়, তা যদি তিনি আর্থ-সামাজিক উন্নয়ণের জন্য ব্যবহার করতেন কিংবা নিজের ঢাক পেটাতেন, তবে তিনি অমন অখ্যাত বা অবজ্ঞাত হয়ে থাকতেন না।"

নিজেকে প্রচার থেকে আড়াল করে রাখার দিকে লালনের বেশি প্রয়াস ছিল। তাঁকে নিয়ে উন্মাদনা এখন এমন একটা স্তরে পৌঁছে গেছে যে তাঁর গানগুলির বিকৃত শব্দ-সংস্কার চলছে। কিছু গান আছে যেগুলি তাঁর লেখা না হওয়া সত্ত্বেও সেগুলিকে লালন গীতি বলে চালানো হচ্ছে। এমন একটি গানের নমুনা :

"কেমন ন্যায় বিচার খোদা বল গো আমায়
তাহা হলে ধনী গরিব কেন এ ভুবনে রয়।।
ভাল মন্দ সমান হলে
আমরা কেন পড়ি তলে
কেউ দালান কোঠার কোলে
শুয়ে আরাম পায়
সেই আমরা মরণের পরে
যাব নাকি স্বর্গপুরে
কে মানিবে এসব হেরে
এই দুনিয়ায়।।"

এই গানখানি লালনের নামে চালানো হলেও এটি আদৌ লালনের গান কিনা সে বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ আছে।

লালন নিজে খোদা আর খুরশিদকে অভিন্ন দৃষ্টিতে দেখেছেন বলে শরীয়তবাদীরা তাঁকে মোরতেদ ও কাফের আখ্যা দিয়েছেন। ইসলামী দৃষ্টিকোণ থেকে লালন চিন্তাকে বহুতত্ত্ববাদ বলা হলেও তাঁর শিষ্য দুদ্দু শাহ মৌলবাদীদের কাফের বলেছেন—

নবী ছেড়ে খোদাকে চায়
মোয়াহেদ কাফের তারে কয়
দুদ্দু কয় নবী দয়াময়
যে কদমে খোদার কদম পায়।

কিন্তু লালন বলেছেন—

আপনি খোদা আপনি নবী

লালন বুঝেছেন আসলে আল্লা, মহম্মদ একই স্বরূপ। আহম্মদ শব্দটি গঠিত হয়- আলিফ-হে-মিম-দাল, এর মিম বাদ দিলে আহাদকে পাওয়া যায়। তার মানে আহম্মদ রয়েছে আমাদের মধ্যেই। তাই লালন তাঁর গানে বলেছেন—

"আলেফ হে আরু মিম দালেতে
আহম্মদ নাম লেখা যায়
ও যে মিম হরা তার নকি করে
দেখনা খোদা কারে কয়।।
আকার ছেড়ে নিরাকারে
ভজাল রে অদেখার প্রায়
আহাদে আহম্মদ হল
করলিনে তার পরিচয়।"

গানটি লালন শেষ করেন এই ভাবে—
"কাঠ মোল্লা যে ভেদ না বুঝে গোল বাধায়।"

এই উক্তি থেকে মনে হয় যে তিনি বুঝিয়েছেন যে আহাদ ও আহম্মদের মধ্যে ভেদ থেকেও নেই যা কাঠ মোল্লারা বুঝতে পারে না। লালন তাঁর যুক্তিতে বোঝাতে চেয়েছেন যে আহাদ ও আহম্মদ আসলে এক, মাঝে কেবল মিমের ব্যবধান। আর মিমের সম্মোহন রেখে আহাদ ও আহম্মদকে জুড়ে দিয়েছেন। এটাই হল অরূপ রূপায়ণ। এই রূপায়ণের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে বলতে গিয়ে লালন বলেছেন—

"শুনতে নাই আন্দাজী কথা
বর্তমানে জানো হেথা।"

এই যুক্তির প্রকাশ ঘটেছে অন্য একটি গানে —
"গুরু ছেড়ে গৌর ভজে
তাতে নরকে মজে।"

আন্দাজের পথ ত্যাগ করে বর্তমানের পথে আসা, আল্লাকে জানতে পীরকে জানা, গৌরকে ভজন করার আগে গুরুকে ভজন করা; এই সব যুক্তি-পথ কেটে লালনের প্রশ্ন, বস্ত্র চিনে কি পেট ভরানো যায়? তখন প্রশ্ন দেখা দেয়—

না জেনে করণ কারণ কথায় কি হবে?
কথায় যদি ফলে কৃষি বীজ কেন রোপে?

নামের বা শব্দের কোনো মূল্য বা অর্থ নেই। কারণ—
গুড় বললে কি মুখ মিঠা হয়?
দিন না জানলে আঁধার কি যায়?
তেমনি যেন হরি বলায়
হরি কি পাবে?

নাম বা শব্দ বা অনুমান বাদ দিয়ে খোদ বা আসলকে চেনা দরকার তার পথ হল আত্মতত্ত্ব বা নিজেকে জানা। কারণ—

"আমি কি তাই জানলে
সাধন সিদ্ধি হয়।
আমি শব্দের অর্থ ভারি
আমি সে তো আমি নয়।"

লালনের গান গভীর ভাবে অনুধাবন করলে বোঝা যায় তার গানের মূল ভিত্তিই হল আত্মতত্ত্ব। এর পরে এরই প্রসারণ বিভিন্ন তত্ত্বে যেমন পরমতত্ত্ব, খুরশিদ তত্ত্ব, বস্তু তত্ত্ব।

শব্দ নিয়ে খেলা ফকিরী তন্ত্রের মূল কাজ। তাঁরা আদম শব্দকে বলেন আ-দম। অর্থাৎ যারা দমের নিয়ন্ত্রণ জানে। সেই ভাবে নারীর জননাঙ্গকে তাঁরা রূপক অর্থে বলেন বাবার পুকুর। তার ব্যবহার লালন গীতিতে কিভাবে হয়েছে দেখা যাক।

"কেন ঝাঁপ দিলিরে মন
বাবার পুকুরে —
কামে চিত্ত পাগল প্রায় তোর এ
কেনরে মন এমন হলি
যাতে জন্ম তাইতে মলি?
সিরাজ শা দরবেশে কয়
শক্তিরূপে ত্রি জগৎ ময়
কেন লালন ঘোরে বৃথাই
আত্মতত্ত্ব না সেরে।"

নারীই শক্তির উৎস। তবে লালনের ঝোঁক আত্মতত্ত্বের দিকে। একই ভাবে শব্দের খেলাতে তারা বিসমিল্লাকে বলেন বিচমিল্লা, তা থেকে হয় 'বিচ মে মোল্লা'; বিচ মানে হল বীর্য অর্থাৎ বীর্যই আল্লা এই পদার্থই সব কিছুর মূলে—তাতেই জন্ম তাতেই মৃত্যু !

"যেখানে সাঁইর বারাম খানা
শুনিলে প্রাণ চমকে ওঠে
দেখে যেন ভূজঙ্গনা।
যা ছুঁইলে প্রাণে মরি
এ জগতে তাইতে তরি।
আত্মতত্ত্ব যে জেনেছে
দিব্য জ্ঞানী সে হয়েছে।
কু বৃক্ষে শু ফল পেএছে
আমার মনে ঘোর গেলো না।
যে ধনের উতপাত্তি প্রাণধন
সে ধনের হল না যতন।
অকর্মের ফল কাপয় লালন
দেখে শুনে জ্ঞান হল না।"

অর্থাৎ আত্মতত্ত্ব মানে বস্তু বোধ, তার সুমিত ও নিয়ন্ত্রিত ব্যবহার।

লালনের বিভিন্ন গানে আত্মতত্ত্বের প্রসারণ স্বরূপ বিভিন্ন তত্ত্বের ভাব উন্মোচিত হয়েছে। উদাহরণ স্বরূপ সেগুলি আলোচনা করলে লালনের গানের মূল সার কি তা বুঝতে আমাদের সুবিধা হবে—

"খাকি আদমের ভেদ শে পশু কি বোঝে
আদম সরিরো আমার ভাষায়
বলেছে অধার সাঁই নিজে
নৈলে কি আদমকে সেজদা ফেরেস্তার সাজে
শুনি আজাজীন খাশতোন খাকে আদম তোন গটেছে?
আবার সেই আজাজীন সয়তান হল আদম না ভজে।
আব খাক আতোষ বাদে ঘর গোটলে
জান মালেক মক্তার কোন চিজে সাই
লালন বলে জেনলে এই ভেদ সব
জানে শে যে।"

গানটি সাধকের সিদ্ধ। এর সার বস্তু হল সব কিছুই মাটি দিয়ে গঠিত ঈশ্বর বা বীর্য মিশ্রণে হয় মানুষের দেহ এবং এই দেহ কিভাবে গঠিত তাই এই গানের মাধ্যমে ব্যক্ত করা হয়েছে।

এরপরের গানটি আদমতত্ত্বের গান, গানটি হল —

জেন্ত হয় আদম ছফির আদ্য কথা।।
না দেখে আজাজীন শে রূপ গোটলে আদম কিরূপ হোতা
আমি শরীরো আমার ভাশা এ বলেছে, অধার সাই নিজে
নৈলে কি আদমকে সেজদা সাজে।।
আনিয়ে জেদ্দার মাটি
গোটলে বোরখা পারিপাটি
মিথ্যা নয় সে কথা খাটি
কোন চিজে তাব গটলে আর্ত্তা।'
সে হি জেআদমের ধড়ে
আনন্ত কুটুরি গোড়ে
মাঝখানে হেতনা কল জুড়ে কৃতি করমা বযলে কোনা।
আদমী হলে আদম চেনে ঠিক নাবায়।
শে দেল কোরাণে লালন কয়,
ছেরাজ সাইর গুণে আদম অধার ধরার গুণ।"

আল্লাকে দেখে তাঁর প্রতিরূপ কিভাবে আদম গঠিত হয়েছিল তাই এখানে আছে।

এর পরের গানটি পারের গান —

"পাখী কখোন জানি উড়ে যায়
বদ হাওয়া লেগে খাঁচায়
খাঁচার আড়া পলো ঢসে
পাখী আর দাঁড়াবে কিসে।
ঐ ভাবনা ভবিচি বশে,
চোমক জরা বইচে গায়।
ভেবে অন্ত নাহি দেখি
কার বা খাচা কেবা পাখী।
আমার এই পীঞ্জীরয় থাকে
আমারে মজাতে চায়।।
আগে জদি জেতো জানা
জোংলা কভু পোষ মানে না
তবে উহার প্রেম করতাম না
লালন ফকির কেন্দে কয়।"

এর পরের গানটি লালনের রজঃ সাধনা বিষয়ক পদ—এটি সাধকের সিদ্ধ। এই গানটিও তত্ত্বমূলক :

"কি শোভা দিদলোময়
মন মহিনী রূপ ঝলক দেয়।।
কি বারে রূপে বাখানি
লওদ চন্দ্র জিনি
ফণি মণি সওদামিণি
শে রূপের তুলনা নয়।
সহজে শুর শের গোরা,
রলো কূপে আছে ঘেরা,
কিরণে চমকে পারা দিদলে ব্যাপীত হয়।
সেরূপ জাগে জার নওনে
কি কাজো তার বেদ সাধনে,
দিনের অধিন লালন ভনে
রসিক হলে জানা যায়।"

মানুষকে সত্যতত্ত্ব হিসাবে গ্রহণ করে তার খোঁজ করা এটাই হল আসল কথা। এই কথা ফুটে উঠেছে লালনের গানে —

"মানুষ তত্ত্ব যার সত্য হয় মনে
সেকি অন্যতত্ত্ব মানে?
মাটির ঢিবি কাঠের ছবি
ভূত ভাবি সব দেব আরদেবী

ভোলে না যে এসব রূপে
ও যে মানুষ রতন চেনে।"

লালন একটি গানে প্রশ্ন তুলেছিলেন যে—

জাত না গেলে পাইনে হরি
কি ছার জাতের গৌরব করি
ছুস্‌নে বলিয়ে?

তাঁর মতে জাতি বৈষম্য বিলুপ্ত না হলে মনের মানুষ পাওয়া সম্ভব নয়। তাই তিনি বলেছেন—

সৃষ্টি কর্তা যে হোক বটে
নবদ্বীপে গৌর রূপে সকল জাত ছেঁটে
করলেন একচেটে।

নিজের জাত সম্পর্কে তিনি ছিলেন উদার, তাই তিনি গান লিখেছেন এই ভাবে—

"সবে বলে লালন ফকির হিন্দু কি যবন
লালন বলে আমার আমি না জানি সন্ধান।
একই ঘাটে আসা যাওয়া
একই পাটনী দিচ্ছে খেওয়া
কেউ খায় না কারও ছোওয়া
বিভিন্ন জনাকে কোথায় পান।
বেদ পুরাণে করেছে জারি
যবনের সাঁই হিন্দুর হরি
দুইরূপ সৃষ্টি করলেন কী তার প্রমাণ,
বিবিদের নাই মুসলমানি
পৈতা যার নাই সেও তো বামনী
বোঝ রে ভাই দিব্য জ্ঞানী
লালন তেমনি খাত্তনার জাত একখান।"

এখানে যুক্তির বিন্যাস প্রশংসনীয়। এও এক ধরনের প্রতিবাদ, ছুৎ মার্গের বিরুদ্ধে, শাস্ত্রীদের বিরুদ্ধে। লালনের সমকালীন পাঞ্জু শাহ্ ছিলেন লালন পন্থার ঘনিষ্ঠ। তিনিও জাত সম্পর্কে একই মত পোষণ করেছেন, তাঁর মতে—

"এক জেতের বোঝা লয়ে
মিছে মলাম বয়ে
চিরকাল কাটালাম মানীমানুষ হয়ে
মনের গৌরব কুলের গৌরব ধন্দ বাজি সব দেখি।
জেতে অন্ন নাহি দিবে রোগে না সারিবে
পাপ করিলে কোম্পানী জাত ধরে নিয়ে যাবে

মৃত্যু হলে যাব চলে
জেতের উপায় হবে কি!"

লালনের পথ অন্যতম বিশ্বাসের পথ, যা কিন্তু অনুভব করা যায়। ইসলামের ভক্ত ভগবান সম্পর্কে যে ধারণা, তার সঙ্গে লালনের মিল এইখানে যে জ্ঞানের আলোয় ঈশ্বরকে বুঝতে হবে। তাঁর একটি গানে তাঁর কল্পনার সৃজন স্পর্শ সুন্দর ভাবে ফুটে উঠেছে—

"আমি ডুব দিয়া রূপ দেখিলাম প্রেম নদীতে
আল্লা আদম মোহাম্মদ তিনজনা একনূরেতে
সে সাগর অকুলেরও
আদি অন্ত নাই তাহারও
নিঃশব্দ ছিল সিন্ধু আদিতে আদিতে,
আচানক দিয়া নাড়া সেই শব্দ করলেন খাড়া
সেই সৃষ্টির গোড়া আদিতে আদিতে
শব্দ হইল 'কুন' জানো তার বিবরণ
নিঃশব্দ ছিল সে সিন্ধু আদিতে আদিতে।"

এতে ইসলামের প্রভাব থাকলেও লালনের বিশিষ্ট কল্পনা রহস্যময় সিদ্ধান্তে পৌঁছেছে। অন্য একটি গানের মধ্যে প্রবেশ করা যাক। তাঁর গানগুলি আমাদের পরিচিত জগতের শব্দ প্রতিমায় ভরা। জল মাটির সঙ্গে তার গভীর সংযোগ। এই কারণেই লৌকিক গীতিকারদের মধ্যে লালন ছিল সব থেকে বেশি জনপ্রিয়। তাঁর গানগুলির ভাষণ চাতুর্য আমাদের মুগ্ধ করেছে । যেমন পরপর কয়েকটি গানের উদাহরণ দেওয়া যাক—

১। "আমার ঘরের চাবি পরের হাতে
কেমনে খুলিয়ে সে ধন দেখব চক্ষেতে
আপন ঘরে বোঝাই সোনা
পরে করে লেনা দেনা
আমি হলেম জন্ম কানা
না পাই দেখিতে।
রাজী হলে দরওয়ানি
দ্বার ছাড়িয়ে দেবেন তিনি
তারে বা কই চিনি শুনি
বেড়াই কুপথে।
এই মানুষে আছে রে মন
যারে বলে মানুষ রতন
লালন বলে পেয়ে সে ধন
পারলাম না চিনিতে।"

২। আবার সে আর লালন একখানে রয়
তবু লক্ষ যোজন ফাঁক্‌রে।

৩। আপন ঘরে পরের আমি

৪। সাঁই নিকট থেকে দূরে দেখায়
যেমন কেশের আড়ে পাহাড় লুকায়।

৫। আঁখির কোনায় পাখির বাসা
যায় আসে হাতের কাছ দিয়ে।

গানগুলির মধ্যে দিয়ে ফুটে উঠেছে সাধক জীবনের আনায়াস কবিত্ব। লালনের এই সৃজনী শক্তির যে চাবি তা পুঁথি পড়া মানুষের কাছে নেই।

লালনের মতে অহংয়ের বিসর্জনের অর্থ, আত্মবোধ। এই আত্মবোধ ফুটে উঠেছে বিভিন্ন ভাবে। যেমন এই গানটি—

"আমার আপন খবর আপনার হয় না।
এবার আপনারে চিন্তে
পরে জায় অচিনারে চেনা।
সাই নিকট থেকে দূর দেখায়
জমন কেশের আড়ে পাহাড় লুকায়
দেখনা আমি ঢাকা দিল্লি হাতড়ে ফিরি
আমার কোলে ঘোর তা জায়না।
আর্ত্তা রূপে কর্ত্তা হরি মনে নিষ্ঠা হইলে মিলবে তারি ঠেকনা
বেদবিদান্ত পোড়বে জত বেড়বে কত লকনা।
আমি কে বলে মনজে জানে
তার চরণ স্মরণ্‌ লেনা।
সাই লালন বলে মনের ঘোরে হলেম
চোক থেকীতে কানা।"

লালনের মতে নিজের মত অর্থাৎ আত্ম-উপলব্ধির পথ ধরে বাইরের বৃত্তি ত্যাগ করতে হবে। যেমন—

বাহ্য কাম ত্যাজ্য করে
ঐ থাকতে হবে নিরিখ ধরে
মাছরাঙা পাখি যেমন রয়।

স্থির লক্ষ্যের প্রতীক মাছরাঙা পাখি। এই পাখির প্রসঙ্গ লালনের গানে ঘুরে ফিরে এসেছে। যেমন দেখা যায় অচিন পাখির রহস্য বহুজাতি। যেমন--

হায় চিরদিন পুষলাম এক অচিন পাখি
ভেদ পরিচয় দেয় না আমায় ঐ খেদে ঝোরে আঁখি।
পাখি বুলি বলে শুনতে পাই

রূপ কেমন দেখিনা ভাই
এ তো বিষম ঘোর দেখি।"

'ভেদ পরিচয়' শব্দটির মধ্যেই গানের মুখ্যার্থ লুকিয়ে আছে। নিজের ভেতরের সঙ্গে বাইরের যে প্রভেদ তার চিত্র জেনে তবে তার সন্ধান কবা উচিত। কিন্তু তাকে চোখে না দেখে তার সম্পর্কে শোনা কথার উপর ভিত্তি করার জন্য একটা আড়াল থেকে যাচ্ছে। কারণ ভেতরের অস্তিত্ব অনুভূত হলেও তা দেখা যায়নি। তাই একটা 'বিষম ঘোর' থেকে যায়। তাই লালন বলেছেন—

আমি চিনাল পেলে চিনে নিতাম
যেত মনের ঢুকঢুকি।
পুষে পাখি চিনলাম না
এ লজ্জা তো যাবে না
উপায় করি কি।

যেহেতু পাখির প্রতীক লালনের গানে বারবার এসেছে, তাই তাঁর নিজের অস্তিত্বের সঙ্গে এই পাখির প্রসঙ্গ অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িয়ে রয়েছে। যেমন তিনি বলেছেন—

"আঁখির কোনায় পাখির বাসা
দেখতে নারি কী তামাশা।"

আবার তিনি যখন বলেন—

"যারে সাথে লয়ে ফিরি
তারে যদি চিনতে নারি
লালন কয় অধর ধরি
কেমন ধবজায়।"

অর্থাৎ নিজেকে না জানলে অন্যকে জানা সম্ভব নয়। আর যে নিজেকে জেনেছে—

আত্মতত্ত্বে যার পড়েছে নজর
পাতালে সে পায় আসমানী খবর।

লালন ফলের প্রত্যাশা আর কর্মের সাধনায় চেতনার দিকে বহু দূর এগিয়েছেন। জন্মসূত্র উপেক্ষা করলেও তা তিনি অস্বীকার করেননি। লালন তাই বলেছেন—

শরিয়তি বিনে বল কোথায় দাঁড়াবি
শরিয়তি গাছ রয়েছে
মারফতি ফল ধরেছে।
সেই গাছ যার দখলে আছে
তারে ফেলে ফল কেমনে খাবি
বে আইনে দখল করলে
শাস্তি হবি তোর কপালে।

গানটিতে বলা হয়েছে যে প্রথমে শরিয়তি পরে মারফতির দখল। অর্থাৎ আগে গাছ পরে ফল। কেউ কেউ গাছকে নিয়ে পরে থাকে, তা ঠিক নয়। তাই তাঁর মতে 'হাজার মালেরবন্দেগী কবুল নাই মারফত বিনে'। তাই তিনি বলেছেন—

ও মন, শেখ ফরিদের আউলিয়াছিল
সত্তর সাল জঙ্গলে ছিল
কত কষ্ট উঠাইল জানো না।
খিদায় না খাদ্য খাইল
ঐ আল্লার নাম জপিল
তবু না হাসিল হইল
লালন কয় শেখ ফরিদের হলই না।

লালনীয় মতে আল্লা ও সাধকের মধ্যে যোগসাধন করতে পারে একমাত্র মুরশিদ।

পার্থিব জীবনে মৃত্যু যে কোনো ভোগীকে ভীত করে। বাংলা গানের নানা গীতিকার ভোগসুখ ত্যাগ করে ত্যাগের প্রতি নিজেকে লীন করতে বলেছেন; কিন্তু লালন বলেছেন আত্মতত্ত্বে সচেতন হতে। জীবনের যে একাকিত্ব তার চেয়ে মৃত্যুর পরের একাকিত্ব তাঁর কাছে ভয়াবহ মনে হয়েছে। তাই তিনি বলেছেন—

গোরের কিনারে যখন লয়ে যায়
কাদিয়ে তখন সবে জীবন ছড়াতে চায়।
লালন বলে কারো গোরে কেউ তো যায় না
থাকতে হয় একাকী।

লালনের মতে মৃত্যুর পরের এই একাকিত্ব অনেক বেশি বেদনাতুর।

এইভাবে লালনের গান শাখা বিস্তার করেছে দুই বাংলার অনেক গভীরে। তাঁর গীতি দুই দেশকেই একেবারে মাতিয়ে তোলে। লালন গীতির গ্রহণীয়তা নিয়ে তাই কোনো দ্বিমত নেই। অন্নদাশঙ্কর তাই ছড়া কেটে যেমন বলেছেন—

"আর সব কিছু ভাগ হয়ে গেছে
ভাগ হয়নিকো নজরুল।"

লালনের ক্ষেত্রেও আমরা এই একই কথা বলতে পারি।

রবীন্দ্রনাথ শিলাইদহে জমিদারির ভার গ্রহণ করলেন ১৮৯০ সালের শেষ দিকে, ততদিনে লালনের মৃত্যু (১৭ অক্টোবর ১৮৯০) হয়েছে। সে কারণে তখন তাঁদের দেখা হওয়া সম্ভব নয়। তবে এর আগে রবিঠাকুর অনেক বার শিলাইদহে এসেছেন। তখন তাঁর সঙ্গে লালনের পরিচয় হলেও হতে পারে। লালনের সঙ্গে তাঁর পরিচয় হয়েছে কিনা এ প্রসঙ্গে স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ স্পষ্ট করে কিছু বলেন নি। তিনি শান্তিদেব ঘোষের পিতা কালীমোহন ঘোষকে একটি চিঠিতে বলেছিলেন—

"তুমি তো দেখেছো শিলাইদহে লালন শাহ ফকিরের শিষ্যগণের সহিত ঘণ্টার পর ঘণ্টা

আমার কিরূপ আলাপ জমত। তারা গরীব। পোষাক পরিচ্ছদ নাই! দেখলে বোঝবার জো নাই তারা কত মহৎ। কিন্তু কত গভীর বিষয় কত সহজ ভাবে তারা বলতে পারত তেমন করে আলাপ করতে বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধী ধারী এম. এ., বি. এ—দেরকেও দেখিনি।"

এর থেকে বোঝা যায় রবীন্দ্রনাথ লালনের শিষ্যদের সঙ্গে পরিচিত ছিলেন, এখন আমাদের বিবেচ্য রবীন্দ্রনাথ ও লালনের সাহিত্য চর্চায় কোনো সমন্বয় আছে কিনা তা দেখা। এ বিষয়ে এখন আমরা আলোকপাত করতে পারি।

প্রথমে আমাদের আলোচনা করা দরকার রবীন্দ্রনাথের বাউল সম্পর্কে কী অনুভূতি ছিল। আসলে রবীন্দ্রনাথের বাউল চিন্তা ছিল তাঁর জীবন চেতনার অন্তর্গত। এই প্রেরণা তিনি লাভ করেছিলেন শিলাইদহে এসে।

বাউলের মতো রবীন্দ্রনাথও বাইরের ধর্ম অপেক্ষা ভিতরের ধর্মকেই পরম ধর্ম মনে করতেন। তাই রবীন্দ্রনাথ বলেছেন—

"আমার ধর্ম কী তা যে আজও আমি সম্পূর্ণ এবং সুস্পষ্ট করে জানি, এমন কথা বলতে পারি নে। অনুশাসন আকারে তত্ত্ব আকারে কোনো পুঁথিতে লেখা ধর্ম সে তো নয়।"

অন্যদিকে এই ভাবেরই ইঙ্গিত পাওয়া যায় লালনের গানে—

"সব লোকে কয় লালন ফকির হিন্দু কি যবন
লালন বলে আমার আমি না জানি সন্ধান।"

শাস্ত্রের অনুশাসনের থেকে হৃদয় ধর্মের দ্বারাই তিনি প্রভাবিত হয়েছিলেন বলে মনে হয়। রবীন্দ্রনাথ নিজেই বলেছেন—

"বিশ্বদেবতা আছেন, তাঁর আসন লোকে লোকে গ্রহ চন্দ্র তারায়। জীবন দেবতা বিশেষ ভাবে জীবনের আসনে। হৃদয়ে হৃদয়ে তাঁর পীঠস্থান, সকল অনুভূতি সকল অভিজ্ঞতার কেন্দ্রে। বাউল তাকেই বলেছে মনের মানুষ। এই মনের মানুষ, এই সর্ব মানুষের জীবন দেবতার কথা বলবার চেষ্টা করেছি Religion of Man বক্তৃতাগুলিতে।"

রবীন্দ্রনাথও লালন ফকিরের ন্যায় সারা জীবন ঐ মনের মানুষকেই খুঁজে বেরিয়েছেন। তাঁর মনের মানুষ জীবনদেবতাকে তাই তিনি তাঁর পূজা অর্পণ করে বলেছেন—

"আমি ব্রাত্য, আমি মন্ত্রহীন
সকল মন্দিরের বাহিরে
আমার পূজা আজ সমাপ্ত হল
দেবলোক থেকে
মানব লোকে
আকাশ জ্যোতির্ময় পুরুষে
আর মনের মানুষে আমার অন্তরতম আনন্দে।"

(পনের : পত্রপুট)

পদ্মার পাগলা হাওয়ায় সেই ফুল খুঁজে পেল তার আনন্দ। আবির্ভূত হলেন রবীন্দ্র বাউল।

তিনি ঘোষণা করলেন—

"আমার দোসর যে জন ওগো তার কে জানে।
একতারা তার দেয় কি সাড়া আমার গানে কে জানে।" .

রবীন্দ্রনাথের এই বাউলচারী মন প্রত্যক্ষ করে এক রবীন্দ্র-বীক্ষক বলেছেন— "রবীন্দ্রনাথও ছিলেন আসলে এমনি এক খ্যাপা বাউল কবি, জোড়াসাঁকোর অভিজাত পরিবারে না জন্মে...... কুষ্টিয়া কি পাবনায় জন্ম গ্রহণ করলে তিনিও হয়তো অমনি একতারা হাতে গান গেয়ে গেয়ে খ্যাপার মত ঘুরে বেড়াতেন। কেননা বাউলদের অন্তরের প্রেরণা এবং রবীন্দ্রনাথের প্রেরণা যে একই।" (মোফাজ্জল হায়দার চৌধুরী, রবি পরিক্রমা)

শিলাইদহের বাউলদের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের সখ্যতা হয়েছিল ঠিকই কিন্তু এর মানে এই নয় যে সমস্ত অঞ্চলের বাউলের সঙ্গেই তাঁর অন্তরঙ্গতা ছিল। তার দৃষ্টান্ত স্বরূপ বলা যায় শান্তি নিকেতনে থাকাকালীন সেইখানকার বাউলদের সঙ্গে তাঁর সেই রকম সম্পর্ক গড়ে ওঠেনি। কিন্তু কুষ্টিয়ার বাউল বিশেষ করে লালন ও তাঁর শিষ্যদের সাথে তাঁর যে অন্তরঙ্গতা ছিল আর কোনো অঞ্চলের বাউলের সঙ্গে তাঁর এই প্রকার সম্পর্ক ছিল বলে আমাদের মনে হয় না। অধ্যাপক আশুতোষ ভট্টাচার্য এই প্রসঙ্গে 'রবীন্দ্রনাথ ও লোকসাহিত্য' বইতে বলেছেন :

"বাংলার বাউল সাধনার বহিঃমুখী পরিচয়ের একটি ক্রম বিবর্তনের ধারা অনুসরণ করা যায় তার মধ্যে দেখা যায় যে, রবীন্দ্রনাথ প্রথম জীবনে পূর্ব বাংলায় যে সকল বাউল গান এবং বাউল সাধকের সংস্পর্শে এসেছিলেন, পরবর্তী জীবনে শান্তিনিকেতনে আশ্রমে বাস করবার সময় তাদের সঙ্গে আর কোনো সংযোগ রাখতে পারলেন না। বীরভূমের যে বাউল গান তখন তাঁর শুনবার কিংবা সেখানে যে বাউলের-আচার-আচরণ তাঁর প্রত্যক্ষ করবার সুযোগ হয়েছিল, তা পূর্ব বাংলার বাউল কিংবা বাউলের আচারের চাইতে কিছুটা স্বতন্ত্র। পশ্চিম বাংলায় বাউল সাধনা চৈতন্য ধর্ম দ্বারা বিশেষ ভাবে প্রভাবিত হয়েছে। একদিন যে বাউলকে তিনি তাঁর মনের মানুষ সন্ধান করাবর মধ্যে আত্মহারা হতে দেখেছেন, সেদিন তিনি আর বাউলকে পেলেন না, তার আচার জীবনে কিংবা সংগীতের ভাবে তিনি নতুন রূপ দেখতে পেলেন, তা তার অন্তরকে স্পর্শ করতে পারল না। সেই জন্য পরবর্তী জীবনেও যখন তিনি বাউল গানের উল্লেখ করেছেন, তখন সেই যে প্রথম যৌবনে একদিন পদ্মা তীরে যে বাউলের সন্ধান পেয়েছিলেন, তার কথা এবং তার বাণীই তিনি উদ্ধৃত করেছেন।"

রবীন্দ্রনাথ তাঁর সাহিত্য চর্চার মধ্যে বাউলকে নিয়ে এসেছেন বারবার। তাঁর একটি কবিতায় সেই ভাব সুন্দরভাবে ফুটে উঠেছে—

তরুণ যৌবনের বাউল
সুর বেধে নিল আপন একতারাতে
ডেকে বেড়ালো
নিরুদ্দেশ মনের মানুষকে
অনির্দেশ্য বেদনার খেপা সুরে। (শেষ সপ্তক)

এইভাবেই তিনি নিজেকে রবি বাউলে পরিণত করেছেন। শিলাইদহে বাউলের সংস্পর্শে

আসার কথা তিনি 'হারামণির' ভূমিকায় বলেছেন—

"শিলাইদহে যখন ছিলাম বাউলদলের সঙ্গে আমার সর্বদাই দেখা সাক্ষাৎ ও আলাপ আলোচনা হত। আমার অনেক গানেই আমি বাউলের সুর গ্রহণ করেছি। এবং অনেক গানে অন্য রাগ-রাগিণীর সঙ্গে আমার জ্ঞাত বা অজ্ঞাতসারে বাউল সুরের মিল ঘটেছে। এর থেকে বোঝা যাবে, বাউলের সুর ও বাণী কোন্ এক সময়ে আমার মনের মধ্যে সহজ হয়ে মিশে গেছে। আমার নবীন বয়সে শিলাইদহ অঞ্চলেরই এক বাউল কলকাতায় একতারা বাজিয়ে গেয়েছিল—

"কোথায় পাব তারে
আমার মনের মানুষ যে রে।
হারায়ে সেই মানুষে তার উদ্দেশে
দেশ বিদেশ বেড়াই ঘুরে।"

—রবীন্দ্রনাথ : আশীর্বাদ, পৃ— তিন

লালন সম্পর্কে বাঙালীদের মধ্যে যে আগ্রহ তার মূলে যাঁর ভূমিকা সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ তিনি হলেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। রবীন্দ্রনাথ ১৩১৪ সালে ভাদ্র মাসে 'প্রবাসী' পত্রিকায় লালনের গানের উল্লেখ করেন এবং ধারাবাহিকভাবে প্রকাশ করেন। রবীন্দ্রনাথই লালনকে ইংরেজ কবি শেলীর সঙ্গে তুলনা করেছিলেন।

যদিও লালন ফকিরের শিষ্যদের একটা অংশ রবীন্দ্রনাথকে সন্দেহের চোখে দেখতেন, তাঁরা দাবি করেন যে রবীন্দ্রনাথ নাকি লালনের গানের পুঁথিই 'গীতাঞ্জলি'-তে রূপান্তরিত করেছেন। যদিও আমরা জানি যে রবীন্দ্রনাথ না থাকলে বাংলার বাউল গান এই ভাবে বাংলার সাধারণ মানুষের মুখে মুখে ঘুরত কিনা এ বিষয়ে সন্দেহ ছিল। রবীন্দ্রনাথ লালনের আসল গানের খাতা নিয়ে গিয়ে ফেরৎ দেননি এই অভিযোগ লালনের শিষ্যরা করলেও আসল খাতাটি যে কোথায় ছিল বা আছে তার প্রমাণ পাওয়া যায় ডক্টর আশুতোষ ভট্টাচার্যের কথায়—

"ছেলেবেলা হইতে দেশের নানা মুসলমান ফকিরের মুখে লালনের গান শুনিয়া আসিতেছি। বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে লালনের বিষয় জানিবার জন্য খুবই আগ্রহ হয়। ১৯২৫ সালে ঐ অঞ্চলে বিখ্যাত লালন শাহী ফকির হীরু শাহের সঙ্গে বাড়ি হইতে দশ মাইল পথ হাঁটিয়া লালনের ছেঁউড়িয়া আখড়ায় উপস্থিত হই।..... ঐ সময়ে আশ্রমে রক্ষিত একখানা পুরানো গানের খাতা দেখি। উহা নানা প্রকারের ভুলে এমন ভর্তি যে, প্রকৃত পাঠোদ্ধার করা বহু বিবেচনা ও সময় সাপেক্ষ। আশ্রমের কর্তৃপক্ষেরা বলে যে, সাঁইজীর আসল খাতা শিলাইদহের 'রবিবাবু মশায়' লইয়া গিয়াছেন... লালনের শিষ্যরা আবার সেই গানগুলি বর্তমান খাতায় লিখিয়া রাখিয়াছেন। তাঁহারা আরো বলে যে, সাঁইজীর সেই গানের খাতা পাইয়াই রবীন্দ্রনাথ অত বড় কবি হইয়া সকলের প্রশংসা লাভ করিয়াছেন। তারপর ১৯৩৬ সাল হইতে কুষ্টিয়ায় যখন স্থায়ীভাবে বাস করিতে আরম্ভ করি তখন লালনের সমস্ত গান পূর্ণাঙ্গ ও শুদ্ধরূপে প্রকাশ করিতে চেষ্টা করি। তখন সেই খাতাখানি আর একবার দেখিবার প্রয়োজন হইলে আখড়ার তদানীন্তন মালিক ভোলাই শা ফকির বলে যে, ঐ খাতা মুনসেফ মতিলাল বাবু লইয়া গিয়াছেন, উনি তাহা দেখিতে লইয়া আর ফেরৎ দেন নাই। ...মতিলাল বাবু যে খাতা লইয়া যান নাই, সে খাতা লালনের আস্তানাতেই আছে, তাহার প্রমাণ শীঘ্রই পাওয়া গেল। যাহোক, সেই খাতা দেখিবার আবার সুযোগ মিলিল।"

রবীন্দ্রনাথের আগ্রহ বাউল গান সম্বন্ধে ছিল ছোটবেলা থেকেই। তার প্রমাণ পাওয়া যায় বাইশ বছর বয়সে 'ভারতী' পত্রিকাতে বাউল গান সম্পর্কে একটি প্রবন্ধ লিখেছিলেন, এবং 'বাউলের গাথা' নামে এই গ্রন্থের সমালোচনাও করেছিলেন। বাউল যেহেতু মানুষ তত্ত্বের সাধক সেই কারণেই তিনি বাউলদের সম্পর্কে বিশেষ ভাবে আকৃষ্ট হন।

রবীন্দ্রনাথের গান বা কবিতা ছিল কখনও কখনও মিষ্টিক, কিন্তু এসোটেরিক কখনও নয়। কিন্তু বাউল গান অনেক সময়ই এসোটেরিক। তাই বলা যায় বাউল গানের প্রভাব রবীন্দ্রনাথের উপর কমই পড়েছিল, লালনের প্রভাব খুবই সামান্য ছিল বলে মনে হয়। তবে বাউলরা কোনো প্রকার ঈশ্বর, আল্লায় যেমন বিশ্বাসী নয়. তারা তাদের গুরু বা সাঁইকেই ঈশ্বর মনে করেন। সেই দিক থেকে দেখতে গেলে রবীন্দ্রনাথও তাঁর মনের মানুষকেই সেই স্থান দিয়েছেন। এখানেই বাউলদের সঙ্গে তাঁর মিল। অধ্যাপক ডিমক রবীন্দ্রনাথকেই বাউলদের শিরোমণি আখ্যা দিয়েছেন। হয়ত কথাটি একটু অতিরঞ্জিত মনে হতে পারে। তবে বাউলতত্ত্ব অনুযায়ী নিঃসন্দেহে রবীন্দ্রনাথকে একজন বাউল বলা চলে।

রবীন্দ্রনাথ নিজের অজান্তেই লালনের গান তাঁর 'গোরা' উপন্যাসে ব্যবহার করেছিলেন। সেটি হল 'খাঁচার ভিতর অচিন পাখি'। আবার অক্সফোর্ড বক্তৃতা মালায় তিনি লালনের নাম না করেও বলেছেন—

"The village poet evidently agrees with our sage of the upaneshad who says that our mind comes back baffled in its attempt to reach the unknown Being; and yet this poet like the ancient sage does not give up adventure of the infinite thus implying that there is a way to its realisation."

উপনিষদের ঋষির সঙ্গে পল্লী কবির তুলনা, আসলে লালনের সঙ্গেই তুলনা, যা লালনকে অনেক উচ্চ আসনে অধিষ্ঠিত করেছিল। একই ভাবে 'ছন্দ' বইতে রবীন্দ্রনাথ লালনের নাম না করেই তাঁর প্রশংসা করেছেন। কবিগুরুর কথায়—

''ভাষার শব্দে অর্থ আছে, সুর আছে, অর্থ জিনিসটা সকল ভাষাতেই এক। সুরটা প্রত্যেক ভাষাতেই স্বতন্ত্র। 'জল' শব্দটি বলতে যা বুঝি 'ওয়াটার' শব্দেও তাই বুঝি। কিন্তু ওদের সুর আলাদা, ভাষা এই সুর নিয়ে শিল্প রচনা করে, ধ্বনির শিল্প। সেইরূপ সৃষ্টির যে ধ্বনিতত্ত্ব বাংলা ভাষার আপন সম্বল, পণ্ডিতেরা তাকে অবজ্ঞা করতে পারেন। কেননা তারা অর্থের মহাজন, কিন্তু যারা রূপরসিক তাদের মূলধন ধ্বনি। প্রাকৃত বাংলার দুয়োরাণীকে যারা সুয়োরাণীর অপ্রতিহত প্রভাবে সাহিত্যের গোয়াল ঘরে বাসা না দিয়ে হৃদয়ে স্থান দিয়েছে সেই অশিক্ষিত লাঞ্ছনা ধারীর দল যথার্থ বাংলা ভাষার স্পন্দন নিয়ে আনন্দ করতে বাধা পায় না। তাদের প্রাণের গভীর কথা তাদের প্রাণের ভাষায় উদ্ধৃত করে দিই—

''আছে যার মনের মানুষ আপন মনে,
সে কি আর জপে মালা।
নির্জনে সে বসে বসে দেখছে খেলা।....
ওরে লালন ভেড়োর লোক দেখানো

মুখে হরি হরি বলা।"

আর একটি—

"এমন মানব জনম আর কি হবে
যা কর মন ত্বরায় কর, এইভবে,.....

এই ছন্দের ভাষা এক ঘেয়ে নয়। ছোট বড় নানা ভাগে বাঁকা বাঁকা চলেছে। সাধু প্রসাধনে মেজে ঘঁষে এর শোভা বাড়ানো চলে, আশা করি এমন কথা বলবার সাহস হবে না কারো। এই খাঁটি বাংলার সকল রকম ছন্দেই সকল কাব্যই লেখা সম্ভব। এই আমার বিশ্বাস,..

এই যে বাংলা বাঙালীর দিনরাত্রির ভাষা, এর একটা মস্ত গুণ— এ ভাষা প্রাণবান। এই জন্যে সংস্কৃত বল, ফরাসী বল, ইংরাজী বল, সব শব্দকেই প্রাণের প্রয়োজনে আত্মসাৎ করতে পারে। হিন্দী ভাষারও সেই গুণ। যারা হেড পণ্ডিত মশায়ের কাছে পড়েনি তাদের একটা লেখা তুলে দিই।

"চমু আঁঠার, দিলের ঠোকায়
কেশের আড়ে পাহাড় লুকায়
কী রঙ্গ সাঁই দেখছ সদায়
বসে নিগম ঠাঁই। ....

প্রাকৃত বাংলাকে গুরু চণ্ডালী দোষ স্পর্শ করে না, সাধু ছাঁদের ভাষাতেই শব্দের মিশোল সয় না।"

উপরের দেওয়া পদগুলি লালন শাহের রচনা।

রবীন্দ্রনাথ শিলাইদহে এলে সেখানে তিনি অনেক বাউল ফকির বৈষ্ণবদের সংস্পর্শে আসেন এবং এখানেই লালনের গানের সঙ্গে তাঁর অন্তরঙ্গতার সৃষ্টি হয়। এই বাউল জীবনের যে মনের মানুষকে তিনি অনুভব করেছেন তা ফুটে উঠেছে তাঁর কবিতায়—

"কতদিন দেখেছি ওদের সাধককে
একলা প্রভাতের রৌদ্রে সেই পদ্মানদীর ধারে।
যে নদীর নেই কোনো দ্বিধা, পাকা দেউলের পুরাতন
ভিত ভেঙে ফেলতে।
দেখেছি একতারা হাতে চলেছে গানের ধারা বেয়ে
মনের মানুষকে সন্ধান করবার গভীর নির্জন পথে।"

—পত্রপুট, পনেরো।

রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে লালন সাঁই-এর সাক্ষাৎ হয়েছিল কিনা এ বিষয়ে মতভেদ থাকলেও রবীন্দ্রনাথ যে লালন সাঁই-এর রচিত গান একাগ্র মনে শ্রবণ করতেন, এর অনেক প্রমাণ পাওয়া গেছে। তবে সুকুমার সেন তাঁর 'বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস' বইতে এবং বিনয় ঘোষ 'রবীন্দ্রনাথ ও বাংলার লোকসংস্কৃতি' বইতে লালন ও রবীন্দ্রনাথের সাক্ষাৎ হয়েছে, এর সপক্ষে মত প্রকাশ করেন।

বাউল গান রবীন্দ্রনাথকে সম্মোহিত করেছিল। তাই বলা যায় যে রবীন্দ্র সাহিত্যে, নাটকে

ও গানে বাউলের প্রভাব ছিল সুদূর প্রসারী। ডঃ সুকুমার সেনের মতে :

"ছেলেভুলানো ছড়ার করুণ মূর্ছনা রোমান্টিক রূপকথার রঙ্গীন স্বপ্নাভিসার বহিঃপ্রকৃতির ও অন্তঃপ্রকৃতির এই যে একাত্মতাভূত আনন্দ রস যাহা রবীন্দ্রকাব্যের মূলগত বৈশিষ্ট্য, তাহার বীজ এই ভাবেই উপ্ত ও অঙ্কুরিত হইয়াছিল।"

রবীন্দ্রনাথের পিতা মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ, হাফিজের পারসী গজলের ভক্ত ছিলেন। গানের প্রতি তাঁর পিতার অনুরাগ থেকেই মনে হয় রবীন্দ্রনাথের মনে ঐতিহ্য সূত্রে বাউলের নাচ ও সুর সাড়া জাগিয়েছিল। তাই তিনি শিলাইদহে এসে মুগ্ধ কণ্ঠে গেয়েছেন—

"আমার হিয়ার মাঝে লুকিয়েছিল
দেখতে আমি পাইনি
বাহির পানে চোখ মেলেছি
আমার হৃদয় পানে চাইনি।"

লালন সংগীতের প্রতি রবীন্দ্রনাথের আকর্ষণের মাত্রা প্রকাশ পেয়েছে বন্ধু কালীমোহন ঘোষকে লেখা তাঁর একটি চিঠিতে, যা আমরা পূর্বে প্রকাশ করেছি। অক্সফোর্ড বক্তৃতার পরবর্তীকালে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রদত্ত কমলা বক্তৃতা মালায় তিনি স্পষ্ট করে বাউল গানের সঙ্গে রবীন্দ্র-গানের মিলের কথা বলেছেন। তিনি বলেছেন—

"I felt that I had found my religion at last the religion of man in which the infinite difined in humanity and come close to me so as to need my love and co-operation.This idea of mine found at a later date its expression in some of my poems addressed to what I called the Jivan Devata-The Lord of my life."

এখানে রবীন্দ্রনাথ নির্দ্বিধায় স্বীকার করেছেন তাঁর জীবনদেবতার অনুভূতির মূলেই রয়েছে মনের মানুষের অনুভূতি। আর এ অনুভূতি এসেছে লালন থেকে। এতে বোঝা যায় রবীন্দ্রনাথের উপর লালনের প্রভাব কতটা। এছাড়া রবীন্দ্রনাথ নিজেই লিখেছেন : "আমার অনেক গান বাউলের ছাঁচের কিন্তু জাল করতে চেষ্টাও করেনি। সেগুলো স্পষ্টত রবীন্দ্র বাউলের রচনা। কাব্য পরিচয়ে যে বাউলের গানগুলো আছে, সে আমার মাথায় কিংবা কলমে আসত না। লোক ঠকাতে গেলে নিশ্চয় ধরা পড়তুম।"

লালন ঐতিহ্য : জীবনে ও কাব্যে

রবীন্দ্রনাথ ও নজরুলের মত সাঁই লালনও দুই বাংলায় সমান জনপ্রিয় এবং দুই বাংলার জনমানসের কাছে তিনি আপন মানুষ। এই সাধক কবি তাঁর সমকালে চরম সাম্প্রদায়িকতার প্রাচীরকে অতিক্রম করে একটি অসাম্প্রদায়িক সম্প্রদায়ের সৃষ্টি করেছিলেন। তাঁর সৃষ্ট প্রচুর গান আজও উভয় বাংলার মানুষের হৃদয়কে উদ্বেলিত করে। বাংলার শিক্ষিত সমাজে পূর্বে তিনি অজ্ঞাত থাকলেও নদীয়া জেলার কুষ্টিয়া মহকুমা অঞ্চলে তাঁর সমকালে বিশেষ পরিচিত ছিলেন। নিম্নশ্রেণীর হিন্দু-মুসলিমের ঠোঁটের ডগায় লেগে থাকে তাঁর গান। তাঁর ধর্ম বা সম্প্রদায় ছিল খুবই উদার। তিনি হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে সামাজিক কোন ভেদ করতেন না। তাই তাঁর হিন্দু শিষ্যরা তাঁকে বৈষ্ণব গোঁসাই এবং মুসলমান শিষ্যরা তাঁকে ফকির বলে স্মরণ করত। তিনি নিজে নিরক্ষর হলেও অশিক্ষিত ছিলেন একথা বলা ঠিক হবে না। কারণ তাঁর কবিত্ব-শক্তি ছিল অ-সাধারণ। তাঁর কবিতা বা গানের ভাষা ছিল একেবারে সাদা গ্রাম্য।

বিরাহিমপুর পরগনার অন্তর্গত ছেঁউড়িয়া গ্রামে কালীগঙ্গা নদীর তীরে লালনের আশ্রম ছিল। তাঁর আশ্রমের অস্তিত্ব আজও বর্তমান। নদীয়া, যশোহর, রংপুর, চট্টগ্রাম প্রভৃতি জেলায় তাঁর প্রচুর শিষ্য আছে। তাঁর মৃত্যুর পর 'হিতকরী' সংবাদপত্রে তাঁর সম্বন্ধে বেশ কিছু খবর প্রকাশিত হয়, তার কিছু অংশ তুলে ধরা হল :

"মিথ্যা জুয়াচ্চুরিকে লালন ফকির বড়ই ঘৃনা করিতেন। নিজে লেখাপড়া জানিতেন না, কিন্তু তাঁহার রচিত অসংখ্য গান শুনিলে তাঁহাকে পরম পণ্ডিত বলিয়া বোধ হয়। তিনি কোন শাস্ত্রই পড়েন নাই, কিন্তু ধর্মালাপে তাঁহাকে বিলক্ষণ শাস্ত্রবিদ বলিয়া বোধ হইত। বাস্তবিক ধর্ম সাধনে তাঁহার অন্তর্দৃষ্টি খুলিয়া যাওয়ায় ধর্মের সারতত্ত্ব তাঁহার জানিবার অবশিষ্ট ছিল না। লালন নিজে কোন সাম্প্রদায়িক ধর্মাবলম্বী ছিলেন না, অথচ সকল ধর্মের লোকেই তাঁহাকে আপন বলিয়া জানিত। মুসলমান দিগের সহিত তাঁর আহার-ব্যবহার থাকাতে অনেকে তাঁহাকে মুসলমান মনে করিত, বৈষ্ণব ধর্মের মত পোষণ করিতেন দেখিয়া হিন্দুরা তাঁহাকে বৈষ্ণব ঠাওরাইত। জাতিভেদ মানিতেন না, নিরাকার পরমেশ্বরে বিশ্বাস দেখিয়া ব্রাহ্মদিগের মনে ইঁহাকে ব্রাহ্মধর্মাবলম্বী বলিয়া ভ্রম হওয়া আশ্চর্য নহে, কিন্তু ইহাকে ব্রাহ্ম বলিবার উপায় নাই, ইনি বড় গুরুবাদ পোষণ করিতেন। অধিক কি ইহার শিষ্যগণ ইহার উপাসনা ব্যতীত আর কারও উপাসনা শ্রেষ্ঠ বলিয়া মানিত না। সর্বদা 'সাঞ' এই কথা তাহাদের মুখে শুনিতে পাওয়া যায়। ইনি নামাজ করিতেন না। সুতরাং মুসলমান কি প্রকারে বলা যায়? তবে জাতিভেদ বিহীন অভিনব বৈষ্ণব বলা যাইতে পারে; বৈষ্ণব ধর্মের দিকে ইঁহার অধিক টান শ্রীকৃষ্ণের অবতার বিশ্বাস করিতেন। কিন্তু সময় সময় যে উচ্চ সাধনের কথা ইহার মুখে শোনা যাইত, তাহাতে তাঁহার মত ও সাধন সম্বন্ধে অনেক সন্দেহ উপস্থিত হইত। যাহা হউক তিনি একজন পরম ধার্মিক ও সাধু ছিলেন, তৎসম্বন্ধে কাহারাও মতভেদ নাই। লালন ফকির নাম শুনিয়াই হয়ত অনেকে মনে করিতে পারেন ইনি বিষয়হীন ফকির ছিলেন, বস্তুতঃ তাহা নহে, ইনি সংসারী ছিলেন, সামান্য জোত জমা আছে, বাটী-ঘরও মন্দ নহে। জিনিসপত্রও মধ্যবর্তী গৃহস্থের মত। নগদ টাকা প্রায় ২ হাজার রাখিয়া

মারিয়া যান। ইহার সম্পত্তির কতক তাঁহার স্ত্রী, কতক ধর্মকন্যা, কতক শীতলকে ও কতক সৎকার্য্যে প্রয়োগের জন্য ইনি একখানি চরমপত্র (will) করিয়া গিয়াছেন। ইনি নিজে শেষকালে কিছু উপায় করিতে পারিতেন না। শিষ্যেরাই ইঁহাকে যথেষ্ট সাহায্য করিত। বৎসর অন্তে শীতকালে একটি ভাণ্ডার (মহোৎসব) দিতেন। তাহাতে সহস্রাধিক শিষ্যগণ ও সম্প্রদায়ের লোক একত্রিত হইয়া সংগীত ও আলোচনা হইত।"[১]

লালনের কাহিনী আজ সর্বজনবিদিত। লালনের গানের খ্যাতি বিশ্বব্যাপী। লালন বাংলার ঘরে ঘরে বিভিন্ন নামে পরিচিত। যেমন—ফকির লালন, সাধুলালন, কবিলালন, বাউল লালন, মরমীয়া লালন, মানবপ্রেমিক লালন, সাঁই লালন, ভেঁড়ো লালন, ভক্তলালন, সাধক লালন, গুরুলালন, হিন্দু লালন, মুসলমান লালন, মানুষ লালন, ফকির সা লালন, অধীন লালন, অধম লালন প্রভৃতি। লালনকে ভালোবেসেই এত নাম রেখেছে তাঁর ভক্তরা। অবিভক্ত বাংলায় যখন দেশ-সীমা বলে কোন রেখাচিহ্ন ছিল না তখন লালনের বিচরণ ছিল সর্বত্র। যেমন—নদীয়া, যশোর, কুষ্টীয়া, ঝিনাইদহতেও তাঁকে দেখা গেছে।

সমসাময়িক কালে লালন সম্পর্কে এই সন্দেহ দানা বেঁধেছিল— তিনি হিন্দু না মুসলমান? বলা বাহুল্য লালনের খ্যাতির গুণে তাঁর হিন্দু ও মুসলমান দুই ধরনের বাউল শিষ্যই ছিল। তিনি জীবিত থাকাকালীন তাঁকে এই প্রশ্ন করা হলে তিনি দোটানায় পড়েন। তাই এক ধোঁয়াশা সৃষ্টির জন্য তিনি বলেছিলেন—"সবলোকে কয় লালন কী জাত" 'ইত্যাদি'। সাধুরা লোকশিক্ষা দেন, লালন তাঁর গানের মাধ্যমে লোককে শিক্ষা দিতেন। যেমন 'ছুন্নৎ' দিলে পুরুষকে মুসলমান বলে চিহ্নিত করা যায়, কিন্তু নারীর এমন বিধান নেই যে তাঁকে মুসলমান নারী হিসাবে চেনা যায়, বামুনের বেলা 'পৈতা' চিনে 'বামুন' চেনা যায় কিন্তু বামনী চেনার কোন উপায় নেই। তাই তিনি একটি গানের মধ্য দিয়ে সুন্দর কথা বলেছেন—"খাতনার জাত একখান"।

লালনের গান তৎকালীন লোকসমাজে কী রকম প্রভাব বিস্তার করেছিল তা আলোচনা করা যাক :

জলধর সেনের লেখা 'কাঙ্গাল হরিনাথ' থেকে জানা যায় যে জলধর সেন, অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়, প্রফুল্ল চন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় এবং কাঙ্গাল হরিনাথ লালনের সমকালীন ব্যক্তি ছিলেন। তাঁরা কী রকম প্রভাবিত হয়েছিলেন লালনের গান শুনে তা এই উদ্ধৃত বক্তব্যের মাধ্যমে প্রকাশ্য। "একবার গ্রীষ্মের সময় শ্রীমান অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় ভাড়া বাড়ীতে (কুমারখালী) আসিয়াছেন। তিনি তখন বি. এল. পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হইতেছেন। আমি তখন স্কুল মাষ্টার। আমারও গ্রীষ্মাবকাশ। আমরা তখন বাড়ীতে কাঙ্গালের বড় সাধের গ্রামবার্ত্তা প্রকাশিকা পত্রিকার সম্পাদন করি, আর অবসর সময় আমোদ আহ্লাদে কাটাইয়া দিই।

এই সময়ে একদিন মধ্যাহ্নকালে গ্রীষ্মের জ্বালায় অস্থির হইয়া গ্রামবার্ত্তার 'কপি' লেখা পরিত্যাগ করিয়া আমরা হাত পা ছড়াইয়া বিশ্রাম করিতেছি। স্থান গ্রামবার্ত্তার অফিস অর্থাৎ কাঙ্গাল হরিনাথের চণ্ডীমণ্ডপের একটি কক্ষ। উপস্থিত শ্রীমান অক্ষয়কুমার গ্রামবার্ত্তার প্রিণ্টার (এক্ষণে পরলোকগত) প্রফুল্লচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়, কুমারখালি বাঙ্গালা স্কুলের প্রধান শিক্ষক শ্রীযুক্ত

প্রসন্ন কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় এবং ছাপাখানার ভৃত্যের দল। ভৃত্যের দল ব্যাকরণ বা সাহিত্যে পণ্ডিত ছিল না; কিন্তু তাঁহারা সকলেই বেশ গান করিতে পারিত, কারণ তাঁহারা সকলেই কাঙ্গালের শিষ্য। চুপ করিয়া শয়ন করিয়া থাকা আমাদের কাহারও কোষ্ঠীতে লেখে না। সেই দ্বিপ্রহরে রৌদ্রের মধ্যে কি করা যায়, ইহা লইয়াই একটা তর্ক আরম্ভ হইল। অক্ষয় বলিলেন যে, 'একটা বাউলের দল করিলে হয় না?' একথা মনে হইবারও একটা কারণ ঘটিয়াছিল। সেদিন প্রাতঃকালে লালন ফকির নামক একজন ফকির কাঙ্গালের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছিলেন।.... সেই লালন ফকির কাঙ্গালের কুটীরে, আমরা যেদিনের কথা বলিতেছি, সেইদিন আসিয়াছিলেন এবং কয়েকটি গান করিয়াছিলেন।... প্রাতঃকালে যখন গান হয়, তখন আমরাও সেখানে উপস্থিত ছিলাম গানও শুনিয়াছিলাম। কিন্তু আমরা যে সে গানের মর্ম্ম ধরিতে পারিয়াছিলাম তাহা বলিতে পারি না। দ্বিপ্রহরের সেই রৌদ্রে শ্রীমান অক্ষয়ের মনে হয়ত হঠাৎ লালন ফকিরের গানের কথা উদয় হইয়াছিল; তাই সে বলিয়া বসিল, একটা বাউলের দল করিলে হয় না? সকলেই তখন বলিয়া উঠলেন, বেশ বেশ।"[২]

এই বক্তব্যটি স্বয়ং জলধর সেনের। এর থেকে বোঝা যায় যে লালনের গান মানুষের মনে কী রকম প্রভাব বিস্তার করত। লালনের গানে ব্যক্ত হয়েছে তাঁর জীবন-বিশ্বাস। লালনের গানের বৈশিষ্ট্য হল এর মধ্যে একটি পরিচ্ছন্ন ঘটনার মর্মকথা রূপকভাবে প্রকাশিত হয়েছে। দেহ কেন্দ্রীক এই সাধনা মানবদেহকে নশ্বর ও ধ্বংসলীলা বলা হয়েছে। লালনগীতির মূলসুর হল— এই ধ্বংসশীল দেহের ভিত্তিতে অবিনশ্বর ও স্থায়ী ইমারত তৈরি করা। লালনের সাধনা মূলত জীবনসাধনা যোগপন্থা তার অন্যতম সাধনা। এই সাধনার মূলমন্ত্র হল কঠোর আত্মসংযম— তাই তিনি মানুষকে সবার উপরে স্থান দিয়েছেন। লালনের সাধনার লক্ষ্য হল আত্মতত্ত্ব সন্ধান। এই সন্ধানের মাধ্যমে প্রাপ্ত সত্যকে অন্যের মধ্যে সঞ্চার করাই হল তাঁর অভিপ্রায়। এর ফল সাধারণ মানুষকে উপকৃত করে। তার মতে প্রত্যেক মানুষকে তাদের নিজেদের কথা ভাবতে হবে। নিজেদেরকে জানতে হবে, চিনতে হবে। লালনের মূল কথা হল সকলের মধ্যে আত্ম উপলব্ধি জাগ্রত করতে হবে। এই উপলব্ধি জাগরণের মাধ্যমেই মানব কল্যাণ হতে পারে। আত্ম উপলব্ধির অভাবে মানুষ একে অপরের প্রতি দায়িত্বহীন হয়ে পড়ে। কর্তব্যবোধের অভাব জনিত কারণে নিজের কর্ম উপেক্ষা করে পরচর্চায় মগ্ন হয়। এই জন্য কবি বলেছেন—

"আপনার আপনিরে মন না জানো ঠিকানা।
পরের অন্তর কোটি সমুদ্দর কিসে যায় জানা।।"

সাধক ভাবে যে, 'নিজের মনকেই যখন জানা যায় না' তখন পরের অন্তরের খবর জানা যাবে কেমন করে? ফলে পরচর্চা পরনিন্দার মাধ্যমে মানব কল্যাণ সম্ভব নয়। সেই কারণে এই ধরনের প্রবৃত্তি থেকে নিজেকে বিরত রাখাই শ্রেয়। তা যদি না হয় তবে লালনের মতে—

পর ধরতে যাই লোভ দেখিয়ে
আপনি পড়ি লোভে গিয়ে,
হাতের মামলা হারা হয়ে কেঁদে ফিরি।

মানুষের কী ভাবে মঙ্গল হয়, কী ভাবে সুন্দর সমাজ গড়ে তোলা যায় এ বিষয়ে লালনের বক্তব্য, মানুষে মানুষের পার্থক্য দূরীভূত ক'রে, জাতিতে জাতিতে বিদ্বেষ, ধর্মে ধর্মে কলহ ইত্যাদি বন্ধ করলেই একটি সুন্দর সবল সমাজ গড়া সম্ভব। তাই লালন বলেছেন—

"মানুষের নাই জাতির বিচার,
এক এক দেশে এক এক আচার
লালন বলে জাতির ব্যবহার
গিয়েছি ভুলে।"

জাত, গোত্র, বর্ণ ভেদবুদ্ধি ত্যাগ করতে না পারলে মানুষের কল্যাণ সম্ভব নয় এবং সমাজের উন্নয়ন, শান্তি, ঐক্য কখনই সম্ভব নয়, যদি হিন্দু মুসলমানের বৈরী মনোভাব দূর না হয়। সমাজকে ভেঙে ফেলার অধিকার কারো নেই; তবে সমাজে ভুল ত্রুটিগুলি তুলে ধরলে সেই সমাজের কল্যাণ সম্ভব। যা লালন নিজে করেছেন তার অসংখ্য গানের মাধ্যমে।

বাইরের দিক দিয়ে চাকচিকা রাখা এক শ্রেণীর মানুষের লক্ষণ। কিন্তু বাইরেটা একরকম রেখে ভিতরটা যদি সারশূন্য হয়— তবে তার কোন মূল্য নেই, তাই লালনকে এই বিষয়গুলি খুবই গ্লানি দিয়েছে। তাই সে বলেছে—

"সদরে সাজ করছ ভালো
পাছ বাড়ি তোর নেই বেড়া।"

তাই গোপনে অসৎ কিন্তু প্রকাশ্যে সৎ ব্যক্তিদের কটাক্ষ করে লালন বলেছেন—

"তলে তলে তল গোঁজা খায়
লোকের কাছে সতী কওলায়।"

এই শ্রেণীর ব্যক্তিরা সমাজরূপকাষ্ঠে ঘুন পোকা স্বরূপ। এদের বিনাশ ছাড়া সমাজের মঙ্গল সম্ভব নয়, তাদের তিনি তাই বলেছেন—

"ভিতরে লালসার থলি
উপরে জল ঢালাগালি।"

মানুষের সাধনার পদ্ধতি বিভিন্ন ধরনের, কেউ কেউ আবার বন জঙ্গলে গিয়ে সাধনা করে। লালনের মতে এই সব ফালতু। সংসার রূপ গৃহের মধ্যে আবদ্ধ থেকেও সাধনা করা যায়। তার জন্য স্ত্রী-পুত্র ছেড়ে জঙ্গলে যাবার প্রয়োজন নেই, তাই তিনি বলেছেন—

"কেউ নারী ছেড়ে জঙ্গলে যায়,
স্বপ্নদোষ কি হয় না সেথায়,
আপন মনের বাঘে যারে খায়
কে ঠেকায় রে।।"

তাই লালনের মোদ্দা কথা হল নিজেকে সমাজবদ্ধ রেখে সমাজের মানুষের কল্যাণ করতে হবে, নিজেকে সমাজ থেকে বিচ্যুত করার দরকার নেই। সমাজ সম্পর্কে তিনি কত গভীরভাবে চিন্তা ভাবনা করতেন — এই সমস্ত গান থেকে তা বোঝা যায়। সর্বজনীন সামাজিক পরিবেশ

গঠনের আগ্রহ তাঁর অনেক গানে ফুটে উঠেছে। যেমন —

এমন সমাজ কবে গো,
সৃজন হবে
যেদিন হিন্দু মুসলমান
বৌদ্ধ খ্রীষ্টান
জাতি গোত্র
না হি রবে।।
শোনায়ে লোভের বুলি
নেবোনা কাঁধে ঝুলি
দূরে ঠেলে না দেবে ইতর আতরাফ বলি।।
আমীর ফকীর হয়ে একঠাঁই
সবার পাওনা খাবে সবাই
আশরাফ বলিয়া রেহাই
ভবে কেউ নাহি পাবে।।
ধর্ম-কূল-গোত্র-জাতির
তুলবে না গো কেহ জিগীর
কেঁদে বলে
লালন ফকীর
কে বা দেখায়ে দেবে।।

শিক্ষা হল মানব কল্যাণের চাবি স্বরূপ। এই শিক্ষালাভের জন্য পড়াশোনা অত্যন্ত জরুরী। কিন্তু পড়াশোনা করেও অনেকে শিক্ষিত হতে পারে না। লালন এই অশিক্ষাপ্রদ পড়াশোনার বিরোধী দিলেন। তাঁর মতে—

পড়ে ভূত আর হসনে মনরায়
কোন হরফে কি ভেদ আছে
লেহাজ করে জানতে হয়।

'ভূত' অর্থাৎ এখানে অমানুষ। পড়াশোনা করে প্রকৃত মানুষ হবার তাগিদ আছে লালন সংগীতে। কুশিক্ষা থেকে দূরে থাকার নির্দেশ দিয়েছেন লালন। এখানে নির্ভেজাল মানব কল্যাণমুখী চিন্তা লালন-মানসে লক্ষ্য করা যায়।

শিক্ষালয়ে গেলেই সবাই শিক্ষিত হতে পারে না। কারণ শিক্ষক না চাইলেও অমনোযাগী ছাত্ররা ক্রমশই পিছিয়ে পড়তে থাকে। লালনের ভাষায়—

"এক স্কুলে দশজনা পড়ে,
উস্তাদের মনে এই বাসনা
সব সমান করে,
কেউ পাছে এসে আগে গেল,

পরীক্ষায় চেনা যায় তারে।।"

কর্মের গুরুত্ব সম্পর্কে লালন বলেছেন, কর্ম ব্যতীত সমাজের উন্নতি সম্ভব নয়। কথা ও কাজের মধ্যে সঙ্গতি প্রয়োজন, বীজ বপন না করলে যেমন শষ্য উৎপাদন করা যায় না, তেমনি কর্ম না করলে কোন সাফল্য আসবে না। লালনের ভাষায়—

"হাওয়ার চিড়ে কথার দধি
ফলার করছ নিরবধি
লালন বলে তেমনি প্রাপ্তি
কেন না হবে?"

এমন সুন্দর উপমার মাধ্যমে মানব কল্যাণের পক্ষে লালন তাঁর যুক্তি খাড়া করেছেন।

উনিশ শতকীয় নবজাগরণের সঙ্গে উচ্চারিত যে সব ব্যক্তিদের আমরা জানি তাদের মধ্যে রামমোহন, বিদ্যাসাগর, অক্ষয়কুমার, দেবেন্দ্রনাথ, মাইকেল, বঙ্কিমচন্দ্র, রমেশচন্দ্র, কেশবচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ, বিবেকানন্দ প্রমুখ উল্লেখযোগ্য। কিন্তু এঁরা সকলেই ছিলেন উচ্চবর্গের ব্যক্তিত্ব। কিন্তু লালন ফকির ছিলেন অশিক্ষিত, পল্লীবাসী, তার ধর্মসাধনা কোন শাস্ত্রানুগ প্রাতিষ্ঠানিক পথে চলে নি। তাঁর গানে এমন কিছু স্ফুরণ ঘটেছে যা গোপন হলেও জেগে উঠেছে। তিনি কি এই দেশের চিরবহমান লোকায়ত অন্তঃপ্রবাহের আধুনিকতম বিস্ফার?

এই প্রসঙ্গে আমরা লালন ও রামমোহনের মধ্যে একটা তুলনামূলক আলোচনায় আসতে পারি। বলতে পারি রাজা রামমোহন ছিলেন এক উচ্চশিক্ষিত পরিবারের, কিন্তু লালন ছিলেন একেবারে নিরক্ষর এবং সাধারণ গ্রামবাসী। রামমোহন ও লালন উভয়ের জন্ম ১৭৭৪ খ্রীষ্টাব্দে, তাই ধরা হয় উভয়েই রেঁনেসাঁসের ফসল। দুজনেই মানবতাবাদী, অ-সাম্প্রদায়িক, সংস্কার ও জাতিভেদের-বিরুদ্ধ মনোভাবের মানুষ। দুজনকে একত্রে এনে এইভাবে আলোচনা করা যেতে পারে—

লালন ছিলেন গ্রামের মানুষ। তবুও তিনি গ্রামীণ জীবনে তাঁর সাধনা ও উপলব্ধির মাধ্যমে জনগণের যে তরঙ্গ তুলেছিলেন তা বিস্ময়কর ও অসাধারণ। তাঁর এই অবদানকে কেউ কেউ রামমোহনের ভূমিকার সঙ্গে তুলনা করতে চেয়েছেন। ঐতিহাসিক ডঃ রমেশচন্দ্র মজুমদার, রামমোহনের জন্ম তারিখ নিয়ে যে বিতর্ক তাতে অংশ গ্রহণ করে বলেছেন—

"These are the grounds that induce me to hold that according to all probability, based on a reasonable assement of all the evidence available to me, the date of Rammohan's birth is 1774 and not 1772 Of course this cannot be regarded as final,"[৩]

আর লালনের জন্ম তারিখ ১৭৭৪ ধরা হয়েছে । তবে আমরা কখনই চরম সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারি না যে রামমোহন এবং লালন একই সময়ে জন্মেছিলেন। তাই বলা যায়, লালন কিছুতেই রামমোহনের সমবয়সী হতে পারেন না। তবে ১৮১৩—১৮৩৩ পর্যন্ত যে সময়, যা বাংলা সমাজে, বাঙালীর চিন্তায় ও বাংলার ইতিহাসে রামমোহনের পর্ব রূপে চিহ্নিত হয়ে থাকে তা লালনের সমসাময়িক। কাল নিয়ে নয়, মর্জি নিয়ে যে আধুনিকতা যা নবজাগরণের অন্যতম

শর্ত তার ফসল রামমোহন হলেও লালন নৈব নৈবচ। কারণ উনিশ শতকীয় বাঙালীর যে চিত্তবিস্ফার তা সম্পূর্ণ কলকাতা কেন্দ্রিক এবং কলকাতার এই মানস-উল্লাস ও চিত্ত সম্পদের ছিটেফোঁটা মফস্বলে চুঁইয়ে পড়েনি। তাই লালন সম্বন্ধে আমাদের যত আবেগই থাকুক না কেন তাকে উনিশ শতকীয় বঙ্গীয় রেঁনেসাসের ফসল বলতে পারা খুবই কঠিন।

"রামমোহনে উদার মানবতাবাদী দৃষ্টিভঙ্গী এবং ধর্ম সমন্বয়ের শুভ চেষ্টা বহুকীর্তিত বিষয়, কিন্তু অখ্যাত পল্লীর অধিবাসী নিরক্ষর লালনের সমাজচিন্তা, মানবপ্রেম ও মনুষ্যত্ববোধের পরিচয় আজও উপেক্ষিত ও অলিখিত।" (ডঃ আবুল আহসান চৌধুরী)।

তবে উদার মানবতাবাদী ভাবধারা বিকাশে লালন শাহের ও রামমোহনের ভূমিকার এক তুলনামূলক আলোচনা করা যেতে পারে। "বাংলার নবজাগরণে রামমোহনের যে গুরুত্ব বাংলার লোকমানসের দেওয়ালী উৎসবে লালনেরও সে গুরুত্ব।"—(অন্নদাশঙ্কর রায়)। তাই বলা যায় রামমোহন ও লালনের দৃষ্টিভঙ্গি বোধ-বুদ্ধি একই পর্যায়ের। এমনকী কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়ে গবেষণায় প্রমাণিত যে "রামমোহন লালনের কাছে অধমর্ণ।"

অতএব লালন হল আগে বাউল, সে " 'গুহ্য' সাধন ক্রিয়াকাণ্ডে বিশ্বাসী নিরক্ষর বাউল'। তথাপি লালন এবং রামমোহন উভয়েই মানবতাবাদের বিকাশে, যুক্তিবাদকে জাগ্রত করতে ছিলেন সদাতৎপর।

তথাপি রামমোহন ও লালনকে এক করা যায় না, লালন আগে সম্প্রদায়ী পরে ব্যক্তি। আর রামমোহন আগে ব্যক্তি পরে সম্প্রদায়ী। লালন ভাব ও ভক্তিপ্রধান। আর রামমোহন যুক্তি ও বুদ্ধিপ্রধান।

প্রত্যেক মহাপুরুষকে যেমন বিভিন্ন প্রতিকূলতাকে জয় করে তারপর তার মহাপৌরুষত্বের ধ্বজা উত্তোলন করতে হয়, তেমনিই ঘটে ছিল লালন ফকিরের ক্ষেত্রে। তাঁকে জীবিত অবস্থায় বিভিন্ন প্রতিকূল সমাজ ব্যবস্থার সম্মুখীন হতে হয়েছিল। তাই বলা যায় জীবিত অবস্থায় তিনি যেমন অনুকূল পরিবেশ পেয়েছিলেন তেমনি ছিল পদে পদে বিভিন্ন প্রতিকূলতা। এই অসাধারণ মনীষী-ব্যক্তিত্ব তাঁর সমকালেই বেশ খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। তবে ঠাকুর বাড়ির আগ্রহে তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর খ্যাতি উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেতে থাকে।

বাউল সম্পর্কে ধর্মসংস্কারক মুন্সী মেহেবুল্লার বলতেন— "বানাইল পশু তারা বহুতর নরে।"কবি জোনাব আলীর মতে "লাঠিমার দাগাবাজ ফকিরের"।

ফলে লালনের জীবিতকালেই হিন্দু ও মুসলিম শাস্ত্রবাদী সম্প্রদায়ের দ্বারা লালনকে লাঞ্ছিত ও অপমানিত হতে হয়েছে বারে বারে। কিন্তু সমস্ত বিরোধিতাকে অগ্রাহ্য করে লালন অগ্রসর হয়েছেন তাঁর নিজ পথে। লালন যেহেতু 'গুহ্য' সাধনতত্ত্বের সাধক তাই এই সমস্ত ব্যক্তিগত লাঞ্ছনা-অপমান প্রতিফলিত হয়নি তাঁর গানে। বাউলের বিরুদ্ধে এই আন্দোলনের প্রতিবাদ করেছেন অনেকে। যেমন আবদুল ওদুদ বলেছেন— "এই মারফত-পন্থীর বিরুদ্ধে আমাদের আলেম সম্প্রদায় তাদের শক্তি প্রয়োগ করেছেন, আপনারা জানেন। এই শক্তি প্রয়োগ দুষনীয় নয়, সংঘর্ষ চিরদিনই জগতে আছে এবং চিরদিনই জগতে থাকবে। তাছাড়া একযুগ যে সাধনাকে মূর্ত

করে তুলল, অন্য যুগের ক্ষুধা তাতে নাও মিটতে পারে। কিন্তু আলেমদের এই শক্তি প্রয়োগের বিরুদ্ধে কথা বলবার সবচাইতে বড় প্রয়োজন এইখানে যে সাধনার দ্বারা সাধনাকে জয় করার চেষ্টা তারা করেননি, তার পরিবর্তে আপেক্ষাকৃত দুর্বলকে লাঠির জোরে তাঁরা দাবিয়ে দিতে চেয়েছেন। এ দেশী মারফত পন্থীদের সাধনার পরিবর্তে যদি একটা বৃহত্তর পূর্ণতর সাধনার সঙ্গে বাংলার যোগ সাধনের চেষ্টা আমাদের আলমদের ভিতরে সত্য হত, তাহলে তাঁদের কাছ থেকে শুধু বাউল ধ্বংস আর নাশারা দলন ফতেয়াই পেত না।"[৩]

১৭৭৪ সালে লালনের জন্ম ধরলে তিনি বিদ্যাসাগর, রামমোহনের সমকালীন ব্যক্তিত্ব। কিন্তু তাঁর সঙ্গে এঁদের অনেক পার্থক্য। রামমোহন, বিদ্যাসাগর তাঁদের সমাজ সংস্কারকে হিন্দু সমাজের স্বার্থে পরিচালিত করেছিলেন। আবার উনিশ শতকে ফরাজী-ওয়াহাবী আন্দোলন সংগঠিত হয়েছিল মুসলমান সমাজকে সুস্থ আদর্শ মণ্ডিত করতে। কিন্তু লালন ফকির ছিলেন অনন্য, তিনি কোন বিশেষ জাতির কৌলীন্য ফেরানোর চেষ্টা করেননি। বরং তিনি হিন্দু-মুসলিম নামের উপরে উঠে, এমন এক সম্প্রদায়ের কথা ভাবতেন যাঁরা নিজেদের পরিচয় হিন্দু অথবা মুসলমান হিসাবে দেয় না। তাঁরা তাদের পরিচয় দেন একজন মানুষ হিসাবে। এবং সেই কারণেই তিনি হিন্দু মুসলিম মৌলবাদীদের কুনজরে পড়েছিলেন। সেই কারণেই কোন এক গোঁড়া মুসলিম গীতিকার লিখেছিলেন—

"কোন কোন মুসলমান ভাই হয়ে বেইমান
খোদাকে ত্যেজে আউলে ভজে মানে না কোরান।
ত্যেজে আল্লা নবী কি আজগুবি
শাসুফির (শাহসুফির) দরগাতে যায়।
যত আউলে চাষী পির তারা করেছেন জাহির
মুসলমানে হাজুদ (মানত) মানেচাটিম কলাক্ষীর
দেয় খোদার নামে লবডঙ্গা সালাম করে গাধার পায়।
যার নূরে হল আদম পয়দা তার কালাম করে না হায়। (শীতলার বাহন)

আবার মহম্মদ আবু তাহের তাঁর 'সাধু সাধবান' গ্রন্থে (রমজান ১৪০০ হিজরী) বাউল সম্প্রদায় ও লালনের সমালোচনা করেছেন। তিনি লালনকে 'ইসলামবিরোধী', শরিয়ত বিরোধী, বেশারাহ, বিভ্রান্ত ও পথভ্রষ্ট ফকির বলেছেন। তিনি আরো বলেছেন—

"লালন আল্লাহকে ও আল্লার সৃষ্ট মানুষকে একাকার করে দিয়েছে। লালনের গানে আছে শঙ্করাচার্যের অদ্বৈতবাদ, লালনের গানে আছে নরনারীর অবাধ-মিলনের প্রেরণা, লালনের গানে আছে গুপ্ত যৌন প্রক্রিয়ায় লিপ্ত হওয়ার গভীর উৎসাহ, লালনের গানে আছে না-পাক দ্রব্য ভক্ষণ করার প্রেরণা। লালনের গানে আছে তৌহিদ বিরোধী কালাম। লালনের গানে আছে শরীয়ত বিরোধী কথা। লালন আজ নাই, কিন্তু লালনের হাজার হাজার রূহানী সন্তান বিরাজ করছে। তার ষড়যন্ত্র ও কুমন্ত্রনার জালে ফেলে হাজার হাজার মানুষকে সে বিভ্রান্ত করে গেছে।"[৪] ফলে বোঝা যাচ্ছে যে তিনি লালন ফকির সম্পর্কে কতটা ক্ষিপ্ত ছিলেন। মুসলিম ধর্মের উপর লালন আঘাত হেনেছে, এই দাবি করেছেন মৌলভী আব্দুল ওয়ালী। তিনি ১৯০০ সালে প্রকাশিত—

"On Curious Tents and practices of a Certain class of Faqirs in Bengal" প্রবন্ধের একস্থানে বলেছেন—"The so-called Musalman Faqirs speaking to another Musalman try their best to argue against Islam, and to misinterpret or misquote passages in support of their doctrines"[৬]

লালনের বিরুদ্ধে আন্দোলন যা বাউল ধ্বংস ফতেয়া নামে খ্যাত। তার আনুষ্ঠানিক সূচনা কবে হয়েছিল তা আমাদের জানা প্রয়োজন, ইংরাজী ১৯২৬ খ্রীষ্টাব্দে এবং বাংলা ১৩৩৩ সালে সৈয়দপুর জেলার রংপুর থেকে মওলানা রিয়াজউদ্দীন আহমেদ কর্তৃক 'বাউল ধ্বংস ফতওয়া' পর্যায়ক্রমে ১ম ও ২য় খণ্ড প্রকাশিত হয়। এই বইতে লালন সহ মুসলিম সম্প্রদায় ভুক্ত বাউলদের অভিযুক্ত করে তাদেরকে কাফের ঘোষণা করা হয়। এই ফতেয়াতে লালন ও লালন সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে ধ্বংসাত্মক অভিযানে ডাক দেওয়া হয়েছিল।

মুনসী এমদাদ আলী প্রণীত বইতে লালনের নাম উল্লেখ করে তাঁর সমালোচনা করেছেন। তিনি বলেছেন "নাড়া ইত্যাদি ইত্যাদি ইহাদিগের মধ্যে আমাদের দেশে এই নাড়ার হট্টগোল বেশী। আমাদের দেশে প্রধানত দুই শ্রেণীর নাড়া দেখিতে পাওয়া যায়। এক শ্রেণীর নেতা জেলা নদীয়া মহকুমার কুষ্টিয়ার অধীন ছেঁওড়ীয়া নিবাসী লালন সা। তাঁহার রচিত বহুবিধ গান লোক মুখে প্রচলিত আছে। কিন্তু রচিত কোন পুস্তকাদি নাই।..... নাড়ার ধর্ম সম্বন্ধেও আমি যতদূর নিজে অবগত হইয়াছি ইনশাআল্লা পাঠক পাঠিকাগণের নিকট উপস্থিত করার বাসনা করিয়াছি। ইহার দ্বারা মছলেম সমাজে কোন উপকার হইলে শ্রম সফল জ্ঞান করিব। .....তাছাড়া নাড়া সে কি ধর্ম তাহা ব্যক্ত করা বড়ই দুরূহ। এমন অসভ্য অশ্লীল ব্যবহার জগতে কোন মনুষ্যের দ্বারা হইতে পারে এমন বিশ্বাস হয় না।"[৭]

এই মন্তব্যটি পাঠে মনে হয় যে এই ব্যক্তি যেন ব্যক্তিগতভাবে লালন দ্বারা নিগৃহীত হয়েছেন। আসলে গোঁড়া মুসলিম হিসাবে তিনি তাঁর মতকে নিজের মত করে সাজিয়েছেন এবং লালনকে কাঠগোড়ায় দাঁড় করিয়েছেন। একইভাবে লালনের বিরুদ্ধে বিভিন্ন কুৎসা প্রচারিত হয়েছিল, তার প্রমাণ পাওয়া যায় বসন্তকুমার পালের (ফকির লালন শাহ্) প্রবন্ধে। এই প্রবন্ধটিকে উদ্ধৃত করে বলা হয়েছে—"লালন শাহের জীবনী... পাঠে বুঝা যায় লালন সাহের ধর্মের কোনই ঠিক ছিল না। বরঞ্চ তাঁহার ভাবের গান ও কবিতাবলীর ভিতর দিয়া পরিস্ফুটিত হয় যে তিনি হিন্দু জাতির একজন উদাসীন ছিলেন। তিনি কেবল মোছলমানের হস্তে অন্নব্যঞ্জনাদি ভোজন করিয়াছিলেন বলিয়াই, হিন্দু সমাজ তাঁহাকে সমাজচ্যুত করিয়াছিল। তিনি মোছলমানের অন্ন ভোজন ব্যতীত, এছলাম গ্রহণ করেন নাই। বা মোছলমান বলিয়া নিজেকে স্বীকার করেন নাই বা এছলামের আকিদা, বিশ্বাস ও নামাজ রোজা প্রভৃতির কোন চিহ্নই কিম্বা আচার ব্যবহার কিছুই তাঁহার মধ্যে বর্তমান ছিল না, যদ্দারা তাঁহাকে মোছলমান বলা যাইতে পারে। তিনি এছলামের হোলিয়া অনুসারে মোছলমানের দরবেশ ফকির হওয়া দূরে থাক একজন মোছলমান বলিয়াও পরিগণিত হইতে পারেন না, তিনি যত বড়ই মুনি-ঋষি, উদাসীন হউন না কেন, মোছলমানের

তিনি কেহই নহেন। কেহ মোছলমানের অন্ন খাইয়া মোছলমান হইতে পারেন না। কারণ অনেক অমোছলমানই মেছলমানের পাকে ভোজন করিয়া থাকে। যাহার মধ্যে এছলামে রীতি নীতি কার্যকলাপগুলি শরীয়তের কাটায় মিলিবে না, তিনি মুনি ঋষি দরবেশ ফকির যে কোন নামেই পরিচিত হউন না কেন, মোছলমান তাহাকে কোনই শ্রেণীর মধ্যে পরিগণিত করিয়া লইতে পারে না। অতএব লালন শাহর মধ্যে শরীয়তের চিহ্ন না থাকায় তিনি মোছলমান সম্প্রদায়ভুক্ত নহেন। সুতরাং বাউল বা ন্যাড়ার ফকিরগণ যে লালনসাহাকে মোছলমানের সেরা পীর, দরবেশ বলিয়া তাহার পদ অনুসরণ করত মোছলমান দরবেশ ফকিরের দাবী করিয়া দুনিয়াটাকে তোলপাড় করিয়া তুলিয়াছে। ইহা তাহাদের সর্ব্বেব পথভ্রষ্টের পবিচয়মাত্র। লালন সাহার পরিচয় তো ইহাই দাঁড়াইল। কিন্তু বাউল, ন্যাড়ার ফকিরগণ লালন সাহ সম্বন্ধে কোনই পরিচয় না জানিয়া হুজুগে মাতিয়া হিন্দু বৈষ্ণবগণের দেখাদেখি লালন সাহ পদে গা ঢালিয়া দিয়া মোছলমান সমাজের কলঙ্কস্বরূপ হইয়াছে। ইহা অতি পরিতাপের বিষয়। তাহাদের ধাঁধা এখন ঘুচিবে কী?"[৮]

মওলানা আবু ইমরান হোচাইন প্রণীত 'জওয়ারে ইবলিস' (১৯৬৮) পুস্তিকায় লালনের জাত সম্পর্কিত ভাবনা সম্বলিত গান সম্পর্কে বলা হয়েছে যে—"তথাকথিত মারফতির কাণ্ডারী লালন শাহ গানের মাধ্যমে ত্বকচ্ছেদ লইয়া 'জাত বিচার' কবিতায় ইসলামের ক্রটির দিকে ইঙ্গিত করিয়া যে মন্তব্য করিয়াছেন তাঁহাতে তাহার সীমাহীন মূর্খতাই প্রকাশ পাইয়াছে মাত্র। ......আল্লার কালাম কিংবা রাছুলের হাদীছে একথা বলা হইলে মুসলমানদের তরফ হইতে কিছু বলার ছিল না। কোরান হাদীছের কোথাও এরূপ উদ্ভট উক্তি করা হয় নাই। অথচ সেই শাশ্বত, ইসলামের উপর কামড় দিতে গিয়ে লালন শাহ স্বীয় বিষদন্তই ভগ্ন করিয়াছেন মাত্র।"

আসলে লালনের বিরুদ্ধে এই সমস্ত মৌলবাদীদের যে জেহাদ তার একটি কারণ ছিল, তাঁদের জনপ্রিয়তার অবক্ষয়। লালন যে সম্প্রদায় গঠন করেছিলেন, তাঁর প্রচার ও প্রসার ছিল ক্রমশ ঊর্ধ্বমুখী। তবে বাউল বিরোধী আন্দোলনের কোন ধারাবাহিক ইতিহাস ছিল না। থাকলে সেই জেহাদ বাউলের প্রতি যে অত্যাচার হয়েছিল তার পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণ দেওয়া যেত। উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য বলেছেন—

"শরীয়তবাদী মুসলমানগণ লালনকে ভালোচোখে কোনদিনই দেখেন নাই। এক সংখ্যাগরিষ্ঠ দল লালনের খ্যাতি প্রতিপত্তির দিনেও তাঁহাকে নিন্দা করিয়াছে। ....এই বাউল পন্থী নেড়ার ফকিরেরা চিরকাল অপমানিত ও লাঞ্ছিত হইয়াছে।"[৯]

তবে এই সমস্ত মৌলবাদীদের মিথ্যা প্রচার এবং লালন-সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে অত্যাচার কি লালনকে দমন করতে পেরেছিল? না, লালন তাঁর নিজের পথে অটল ছিলেন। তাই তিনি এই সমস্ত মৌলবাদীদের আক্রমণকে প্রতিহত করতে সক্ষম হয়েছিলেন।

তবে শেষে একটি কথা বলা যেতে পারে যে, লালনপন্থীরা এক সময় অবহেলিত হলেও তাঁরা জনপ্রিয়তার আলো দেখেছিল। কিন্তু যত দিন যাচ্ছে বাউলের সেই জনপ্রিয়তা কি অটুট থাকছে? আজ হয়ত সেই মৌলবাদী জেহাদ নেই, কিন্তু প্রকৃত বাউল তত্ত্ব আজ আর আছে?

আসলে লালন পন্থীদের সাম্প্রতিক হতদ্দশার জন্য দায়ী তাদের অসংগঠিত কর্মধারা। তাছাড়া লালন নিজে তাঁর ধর্মধারণাকে শিষ্যপরম্পারায় প্রচার করতে চাননি। তবে লালন যে জীবিতকালে খুব একটা সুখে ছিলেন না তার প্রমাণ পাওয়া যায় তাঁর একটি ব্যঙ্গাত্মক পদে—

"এ দেশেতে এই সুখ হলো,
আবার কোথা যাই না জানি।"

তবু লালন চর্চায় ছেদ পড়েনি কোনদিন। ভক্ত-শিষ্য ও অনুরাগীরা যেমন তাঁর গানের তর্জমা করে চলেছেন— তেমনি দেশ বিদেশের লোকমানসে পরিবাহিত হয়ে চলেছে লালনের ধর্ম-দর্শন ও জীবন-চেতনার উদার মহিমা।

বাউলের সাধনা মূলত নারী পুরুষের সাধনা। এর মূল ভিত্তি দেহতত্ত্ব সম্বলিত। আমরা জানি এই বাউল সাধনা দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ, এছাড়া নজরুল ইসলামও বাউল সাধনা দ্বারা প্রভাবিত হন। যে সাধনা দ্বারা স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ প্রভাবিত হয়েছিলেন, সেই মহৎ সাধনার প্রভাব আমাদের আধুনিক কবিতায় পড়বে না, এ আশঙ্কা কখনই সত্য হতে পারে না। কারণ রবীন্দ্রনাথের পর থেকে আধুনিকতার সূচনা হলেও, রবীন্দ্রনাথের থেকে বড় আধুনিক আর কে হতে পারে !

বাউলদের মধ্যে আছে উদার মানবিকতার দর্শন যা কিনা আধুনিক কবিদেরও মূলমন্ত্র। আধুনিকদের ভাবনা জটিল। কারণ বর্তমানের দ্বন্দ্ব, সংশয়, জটিলতা হল আধুনিক কবিদের কাব্যের বিষয়। একজন কবির কাছে যখন কবিতা 'চিত্রস্তনিত ধ্বনির পবিত্র মর্মস্পর্শিতায়' উজ্জ্বল, বাউল চেতনার মধ্যেও আছে এই ধরনের ভাবনা।

রবীন্দ্রনাথ বাউল ভাবনা দ্বারা প্রভাবিত হয়ে নিজেকে রবীন্দ্র-বাউল বলেছেন। শেষ সপ্তকের তেরো নম্বর কবিতায় তিনি বলেন—

"রাস্তায় চলতে চলতে
বাউল এসে থামল
তোমার সদর দরজায়।
গাইল অচিন পাখি উড়ে আসে খাঁচায়।
দেখে অবুঝ মন বলে,
অধরা ধরেছি
তুমি তখন স্নানের পরে এলো চুলে
দাঁড়িয়েছিল জানালায়।
অধরা ছিল তোমার কাঁকন পরা নিটোল
হাতের মধুরিমায়
ওকে ভিক্ষে দিলে পাঠিয়ে

জানালে না ঐ গানে তোমারই কথা।
তুমি রাগিণীর মতো আস যাও
এক তারার তারে তারে।''

কবি তাঁর মানসীকে বাউলের অচিন পাখির সঙ্গে তুলনা করে আরও বলেন—

''অচিন পাখি তুমি
মিলনের খাঁচায় থাক,
নানা সাঁজের খাঁচা
সেখানে বিরহ নিত্য থাকে পাখির পাখায়
চকিত ওড়ার মধ্যে
তার ঠিকানা নেই,
তার অভিসার দিগন্তের পারে
সকল দৃশ্যের বিলীনতায়।''

লালনের অচিন পাখিকে এখানে রবিঠাকুর তাঁর প্রেয়সী ভেবেছেন। রবীন্দ্রনাথের মত নজরুলের সঙ্গেও বাউলের যোগ প্রত্যক্ষ। লালনের একটি গান—

''আমার এ ঘরখানায় কে বিরাজ করে
আমি জনম ভর একদিন দেখলাম না তারে।''

একই ভাবে নজরুল একটি কবিতায় লিখেছেন—

অসীমা! এলে না তুমি সীমা রেখা পারে;
স্বপনে পাইয়া তোমা স্বপনে হারাই বারে বারে।
অরূপা লো... ...।
জন্ম জন্মান্তর ধরি লোকে লোকান্তরে তোমা' করেছি আরতি
বারে বারে একই জন্মে শতবার করি।
যেখানে দেখেছি রূপ, করেছি বন্দনা প্রিয়া তোমারেই স্মরি।
রূপে রূপে অপরূপা খুঁজেছি তোমায়।''

(অনামিকা : সিন্ধু হিল্লোল)

রবীন্দ্রনাথ, নজরুলের মত আধুনিক কবিদের কাব্যে সর্বক্ষেত্রে ছাপ পাওয়া না গেলেও তাঁদের কাব্যের মধ্যে বাউল চেতনা ফুটে উঠেছে; কিন্তু তা ভিন্ন প্রেক্ষিতে। শামসুর রহমানের একটি কবিতায় দেখি—

''কী পরীক্ষা নেবে তুমি বার বার?
হাতে জপমালা নেই, তবু
আমি তো তোমার নাম মন্ত্রের মতন

করি উচ্চারণ সর্বক্ষণ। যেভাবে তোমার ছায়া স্বপ্নিল বিলাসে
অপূর্ব লুটিয়ে পড়ে, সেখানে আমার ওষ্ঠ রেখে
অনেক আলোকবর্ষ যাপন করতে পারি, তোমারই উদ্দেশে
সাঁতার না জেনেও নিঃশঙ্ক দ্বিধাহীন
গহন নদীতে দ্রুত নেমে যেতে পারি!
তোমার সন্ধানে ক্রোশ ক্রোশ দাউ দাউ পথ হেঁটে
অগ্নিশুদ্ধ হ'তে পারি, পারি
বুকের শোনিতে ফুল ফোটাতে পাষাণে।
যখন পাথরে হাত রাখি
পাথর থাকে না আর অরূপ পাথর,
হয়ে যায় প্রতিমা তোমার ।"—

(কী পরীক্ষা নেবে? আদিগন্ত নগ্ন পদধ্বনি)

এই প্রসঙ্গে বলা যেতে পারে বাউলের মনের মানুষ ঈশ্বর নয়, তারা আধ্যাত্মিকতাকে অস্বীকার না করলেও তার প্রিয় সখী, বন্ধুকেই তার মনের মানুষ হিসাবে কল্পনা করেন। সেই একইভাবে আধুনিক কবিরা তাঁদের মনের মানুষ হিসাবে বেছে নিয়েছেন নায়িকা বা মানসীকে। এইখানেই আধুনিক কবিদের সঙ্গে বাউলের যোগ। বাউল সাধনা দেহকে কেন্দ্র করেই; ফলে যৌনাচার স্বাভাবিকভাবে চলে আসে। কিন্তু প্রেমের মাধ্যমে যৌনাচারকে তাঁরা অতিক্রম করে গেছেন। কালাচাঁদ বাউল বলেন--

"মনের দেহ কল্পভূমি, যত্ন করলে রত্ন ফলে।
ভবে আসার আশা পূর্ণ হবে শুভ যোগে চাষ করিলে।
ধর্ম ধাতুর লাঙ্গল ধ'রে, ছয় বলদে নে চাষ করে;
সময় হলে রতন মিলে, জো থাকিতে বীজ বুনিলে।।
এই জমি তোর চৌদ্দ পোয়া, ভগবানের কৃপায় গেল পাওয়া,
মন্ত্র বীজে নে সৃজে গাছ বীজ জন্ম মূলে।
কালাচাঁদ পাগলে বলে ফুল ফুটিতে জলে
ঐ রূপ মিলে ভজন সত্য হলে, হৃদকমলে প্রেম উথলে।"

অনুরূপভাবে আধুনিক কবিদের কাছেও প্রেম দেহনির্ভর। কিন্তু দেহই সব কিছু নয়। আধুনিক কবি মুহম্মদ নুরুল হুদা তাঁর কবিতায় দেখিয়েছেন সেখানে দেহ থাকলেও তার অবস্থান পবিত্রতার মূলমন্ত্রে।

"ভালবাসার মেঘ থেকে বৃষ্টিপাত হচ্ছে
চাষ হচ্ছে তিন একর জমিতে;
ধানের রোয়ার মতো বেড়ে উঠছো তুমি

বেড়ে উঠছে তোমার উর্বর মনোভূমি
তার নীচে সোনা;
এমন মানব জমিন রয় না পতিত
আবাদ করলে হয় না গোনাহ।"

(চাষাবাদ : নির্বাচিত কবিতা)

প্রেমের পরিণতি শেষ পর্যন্ত ঐ দেহকে কেন্দ্র করেই; তাই আধুনিক কবিরা বাউলদের মত দেহকে কেন্দ্র করেই তাঁদের কবিতার বীজবপন করেছেন।

দেহের মধ্যেই জীবন সত্যকে খুঁজে পেয়েছেন কবি শামসুর রহমান—

"....মগজের পুকুরে সাঁতার প্রিয় হৃদয়ের তন্ত্রী
কি রুদ্র ঝংকারে ছিঁড়ে সুবিস্তৃত রৌদ্রের ভিতরে যায়, যন্ত্রী
হ'য়ে ঘোরে, শাড়ীর পাড়ের মতো রাঙা পথে, পতিত বাগানে
বাউল বাউল বলে রসালো জ্যোৎস্নায় খুব মেতে ওঠে গানে।"

(হে প্রিয় কল্পনালতা : আদিগন্ত নগ্ন পদধ্বনি)

আধুনিক কবিতার মূল বৈশিষ্ট্য ঐতিহ্যকে স্বীকার করে নেওয়া। বুদ্ধদেব বসু ছিলেন আধুনিক কবিদের মধ্যে অন্যতম। তাঁর মনের মানুষও নারী, বাউলের প্রেম দেহকে কেন্দ্র করে হলেও অবশেষে তা দেহকে অতিক্রম করে গেছে। কিন্তু আধুনিক কবির কাব্যে স্বার্থকতা লাভ করে দেহজ ভালোবাসা। নায়িকার রূপ বর্ণনায় বুদ্ধদেব বসু বলেছেন:

মাঝ রাতে আজ বাতাস জেগেছে, শুনতে পাও
কঙ্কাবতী
এলো এলোমেলো ব্যাকুল বাউল উতল বাও
কঙ্কাবতী।......
....হাহাকার করে বেহায়া হাওয়ার বেহালাখানি
কঙ্কাবতী
জানালার কাছে হানা দেয় তার মনের বাণী
কঙ্কাবতী।
কোন কথা কয়? তুমি কী শুনবে? শুনাব নাকি?
আধো বিস্ময় আধো সংশয়ে মেলবে আঁখি?

(সেরিনাড : কঙ্কাবতী)

আধুনিক কবিদের কাব্যে বাউল ভাবনা এলেও তা এসেছে বিচ্ছিন্নভাবে। আবু হেনা মোস্তফা কামাল, তাঁর কবিতায় বাউল ভাব ফুটিয়ে তুলেছেন তাঁর নিজস্ব আঙ্গিকে—

জাত জন্ম কিছুই মানিনি; মানিনি কেবল তোকে
পাব বলে
অঙ্গে তুলে নিয়েছি গৈরিক; পথে পথে
পেতেছি বাসর শয্যা, দোতারায় তুলেছি গুঞ্জন আমি।
একদিনও না দেখলাম তারে....... তবু তুই
অধরা যোগিনী।" (বাংলা : আপন যৌবন বৈরী)

ছলনাময়ী নারী বাউলদের অচিন পাখির মতই নিজেকে ফুটিয়ে তুলেছেন। তিনি কাছে থেকেও অধরা রয়ে গেলেন।

কবি অমিয় চক্রবর্তীও বাউল ভাবনার সঙ্গে নিজেকে জড়িয়ে ফেলেছেন। তাঁর ভাষায়—

পরান বাউল কয় গো -
কখন হাসি কখন কাঁদি জানাজানির নয় গো,
তুমিই জানো।
গহিন জলে লুকিয়ে চলে আমার জাগর চাঁদ
হারামণি, ওগো আমার মণি
ছলছলিয়ে কালো ঢেউ-এ উপছে পড়ে বাঁধ
অগাধ পূর্ণিমায় কানায় কানায়।
ভাঁটার টানের কথা বুকে ঢাকা রয় গো
তুমিই জানো।"

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় বাউলকে কাজে লাগিয়েছেন এই জটিল বিশ্বের দ্বন্দ্ব সংঘাত থেকে মুক্তি পাবার জন্য—

সেই যে এক বাউল ছিল সংক্রান্তির মেলায়
গানের তোড়ে দম বাঁধলো গলায়
হারানো তার গানের পিছে হারালো তার প্রাণ,
আহা, ভুলে গেলাম কি যেন তার গান।
প্রাণ দিয়েছে দেয়নি তার হাসি
গানের মত প্রাণ ছেড়েছে খাঁচা
সেই যে তার মরনাহত হাসি
ঝর্ণা জানো, তারি নাম তো বাঁচা

(ঝর্ণাকে)

এখানে নারীর প্রেমের সহায়ক রূপে পরিস্ফুট হয়ে উঠেছে বাউলের ভাব। বাউল ভাবনা ফুটে উঠে কবি হুমায়ুনের লেখনীতে—

"একদিন জলডাহুকের ডাকে শৈশবে তোমার ডাক
চিনেছিলাম। বিশ্বাস করিনি জলপ্রপাতের শব্দ
অন্ধকারের বেলাভূমি ঝিঁঝির শব্দের সাথে বেজে
উঠলে গরীব খালের শান্ত বাঁকে আমি অচিন সাধুর
নাম ধরে ব্যাকুল বাউল ডাক পাঠালে চারণ কথা,
ভেসে আসো নিসর্গ সুন্দরী।"
(রক্তের প্রতিবেশী জন্মভূমি : কুসুমিত ইস্পাত)

—স্বদেশ চেতনা হিসাবে তিনি বাউল ভাবনা ফুটিয়ে তুলেছেন।

কবি শামসুল হকের কবিতায় ফুটে উঠেছে সংগ্রামী ভাব, যা তিনি বাউল ভাবনার সাথে তুলে ধরেছেন—

'আমিও বাংলার লোক' কবিতায় তিনি বলেন—

"আমিও বাংলার লোক, স্বভাবত বাংলার মতই
সমতল, সংগীতের শষ্যভারে নত, দূরগামী
পদ্মার মতই ধীর, পলিমাটি আত্মায় সঞ্চিত।
কিন্তু তাই বলে আমি নই জেনো আয়ুধ বঞ্চিত;
বর্ষার কোমল কাদা, পোড়ামাটি চৈত্রে সেই আমি।
লালনের দেশে জন্ম নিয়েছিল সিংহল বিজয়ী
এবং গোপাল বাবু, পরিহাসে নির্মল বিশ্বাসী
মনে আছে? এত দুঃখ বাংলাদেশে, তবু আমি হাসি।"

কবি আলা মাহমুদ মার্ক্সীয় ভাবনার সঙ্গে বাউল ভাবনার মিল ঘটিয়েছেন তাঁর 'সোনালী কাবিন' কবিতায়—

"পূর্বপুরুষরা কবে ছিলো কোন সম্রাটের দাস
বিবেক বিক্রয় করে বানাতেন বাক্যের খোঁয়াড়,
সেই অপবাদে আজও ফুঁসে ওঠে বঙ্গের বাতাস।
মুখ ঢাকে আলাওল— রোসাঙ্গের অশ্বের সোয়ার।
এর চেয়ে ভাল নয় হয়ে যাওয়া দরিদ্র বাউল?
আরশিনগরে খোঁজা বাস করে পড়শি যে জন
আমার মাথায় আজ চুড়ো করে বেঁধে দাও চুল।
তুমি হও একতারা, আমি এক তরুণ লালন,
অবাঞ্ছিত ভক্তিরসে এ যাবৎ করেছি যে ভুল
সব শুদ্ধ করে নিয়ে তুলি নব্য কথার কুজন।"
(সোনালি কাবিন)

বাউল ভাবনার মূল সুর ছিল জগৎ ও জীবনের প্রতি ভালোবাসা। এই ভাবনা ফুটে উঠেছে কবি সানাউল হক খান—এর কবিতায়—

লালনের সেই চোর এসে প্রতিদিন হাত রাখে
আমার খাঁচায়
আমি তার স্বভাবে আপ্লুত হই আপন বিভূঁইয়ে
যেন বা ভাগ্যের নীড়ে সেই অচিন পাখির ডিম
বারবার নিরুপায় হাতড়াতে গিয়ে ভেঙে ফেলি
খুঁজেও পাইনে।
আমারও একেকটি বয়স এভাবেই নষ্ট নয়
অপচয়ে কীর্তন শুনি
মনবেড়ী ছিঁড়ে যায় অলক্ষিত আকুল ক্রন্দনে
আহা রে অচিন পাখি, কোন গগনের খড়কুটো
এনে দিলি আজীবন আমাকে পোড়াতে
সে কোন পালিত প্রেমে শরীরের রক্ত জমে যায়
পাথরের মত
কোন মহাসুখে জ্বলে যায় জীবনের হু হু মোম
কোনোদিন জানি না তো—
আর এই জানাজানি যেন কোনদিনও
শেষ হয়ে না যায়।"

(সেই চোর, সেই অচিন পাখি)

এই বাউল ভাবনা আধুনিক কবিদের কাছে দুই ধরনের ভাবনার অনুষঙ্গী— তা সুখানুভূতি বা দুঃখানুভূতি। বাউল ভাবনা ও আধুনিক কবিদের ভাবনা উভয়ই দেহজ এবং ব্যক্তিই আরাধ্য বলে কবি বুদ্ধদেব বসু বলেছেন—

"পবিত্র বলিয়া এই দেহ, নর দেহ করেছি স্বীকার
দেহ স্পর্শে উচ্ছ্বসিছে অমৃত আপনার

এই দেহ ধূপদহি, উঠিয়াছে কামনার ধূম
তাহারি সুগন্ধে মোর স্নায়ুতন্ত্রী নিহারিত
সেই মোর কলঙ্ক কুঙ্কুম।"

(পাপী : পৃথিবীর পথে)

বাউলের প্রয়োগ আধুনিক কবিতায় কীভাবে, এ প্রসঙ্গে মালার্মে বলেছেন—"Poetry is expression of mysterious feeling of the aspects of existence."

বাউল গানের মত আধুনিক কবিতা দেহ ভিত্তিক হলে কবি তা প্রকাশ করেন প্রতীক বা চিত্রকল্পের সাহায্যে। তাই তা হয় অশ্লীলতামুক্ত এবং শিল্প সুষমামণ্ডিত—

তোমার নামের শব্দ ' কঙ্ক। কঙ্কা। কঙ্কাবতী।'
আকাশে ও চাঁদে, জলে আর মেঘে, দিগন্ত-পারে গাছের ছায়ায়,
ফাঁকা আকাশের রন্ধ্রে -রন্ধ্রে মেঘের শরীরে, জলের স্রোতে—
চুপে চুপে বলা চাঁদের মুখের কথা
চাঁদের মুখে কথা জেগে ওঠে : কঙ্কাবতী। ....
আকাশ ঘুমায় মাথা রেখে কালো মেঘের কোলে,
মেঘের মুখেতে মুখ রেখে চাঁদ পড়েছে ঢ'লে,
কঙ্কাবতী।

(বুদ্ধদেব বসু, কঙ্কাবতী)

বাউলের সাধনাতেও অমাবস্যা, পূর্ণিমা, চাঁদ প্রভৃতি শব্দের সাধনা। যেমন লালন ফকিরের এই গানটিতে—

"রূপার গাছ চাঁদের ফল তার,
থেকে থেকে ঝলক দেখা যায়,
একবার দৃষ্টি করে দেখি
ঠিক থাকে না আঁখি
রূপের কিরণে চমকে পারা।।"

অথবা

"চাঁদে চাঁদ ঢাকা দেওয়া
চাঁদে দেয় চাঁদের খেয়া
জমিনে ফলছে মেওয়া
চাঁদের সুধা ঝরে।"

আমরা জানি নারীর মধ্যে সেই বাউল তার প্রাণের মানুষকে উপলব্ধি করে, আধুনিক কবি জীবনানন্দ দাশও এই ঐতিহ্যকে অস্বীকার করেননি। তাই তিনি বলেছেন—

হে ফকির, আলেয়ার আলো।
কোন দূর অস্তমিত যৌবনের স্মৃতি বিমথিয়া
চিত্তে তব জাগিতেছে কবেকার প্রিয়া। ....
আজো তব লোহিত-কপালে
চুম্বন-শোণিমা তার উঠিতেছে জ্বলে
অনল ব্যাথায়।
চলে যায়, মিলনের লগ্ন চলে যায়।

বাউল গানে মানুষের জীবনকে, তাদের সামাজিক জীবনকেই গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে,

এমন মানব জনম আর কি হবে।
মন যা করো ত্বরায় করো এই ভবে।।
অনন্তরূপ সৃষ্টি করলেন সাঁই
শুনি মানবের উত্তম আর কিছু নাই
দেব দেবতাগণ করে আরাধন জন্ম নিতে মানবে।।

(লালন)

এই মানবতাবাদ বাংলা কবিতায় এনেছে নবজাগরণ, তা নজরুলের কবিতায় ফুটে উঠেছে—

গাহি সাম্যের গান—
মানুষের চেয়ে বড় কিছু নাই, নহে কিছু মহীয়ান।

(মানুষ : সাম্য)

মনের মানুষকে খুঁজে পাবার বাসনা, যা বাউলের মধ্যে ছিল, তা ফুটে উঠেছে জীবনানন্দের কবিতায়—

"তোমার নিবিড় কালো বুকের ভিতর
কবেকার সমুদ্রের নুন;
তোমার মুখের রেখা আজো
মৃত কত পৌত্তলিক খৃষ্টান সিন্ধুর
অন্ধকার থেকে এসে নব সূর্য জাগার মতন;
কত কাছে —তবু কত দূর"

(সবিতা : বনলতা সেন)

অথবা

"সুচেতনা, তুমি এক দূরতর দ্বীপ
বিকেলের নক্ষত্রের কাছে;
সেইখানে দারুচিনি বনানীর ফাঁকে
নির্জনতা আছে।"

(সুচেতনা : বনলতা সেন)

বাউল গানে যে আধ্যাত্মিকতা তা আমরা অমিয় চক্রবর্তীর 'পালাবদল' কাব্যে লক্ষ্য করি। এই কাব্যে 'দিঘি' কবিতায় দেখি—

যেখানে সে ডুবে আছে
সখানে জল নেই
সানালি দোলে ঝিনুক তল
ক্তা ঝলক
তারো গহন আলোর নীল।'

এই আধ্যাত্মিকতার স্বরূপ লক্ষ্য করি লালনের গানে —

"মধুর দিল দরিয়ায় যে জন ডুবেছে
সে না সব জবর খবর পেয়েছে
পর্বতের চূড়ায় গঙ্গা
জলের ভিতর ডাঙ্গা
ডুবে দেখ না, একবার ডুবে দেখ না
ডুবলে ডাঙ্গা পাই
উঠলে ভেসে যাই
বিষম তরঙ্গ সদাই বহিছে।"

বাউলদের যে ভাবনা তা সময়ের পরিপ্রেক্ষিতে অনেক বেশি আধুনিক বলে আমাদের মনে হয়। কারণ তাঁরা জাতপাতকে কখনই গুরুত্ব দেননি, যা নজরুলের কণ্ঠে শুনি—

"মানুষেরে ঘৃণা করি
ও কারা কোরাণ, বেদ, বাইবেল চুম্বিছে মরি মরি।"

বাউলদের যে ভাবনা তার সঙ্গে আধুনিকতার দিশারী আধুনিক কবিদের ভাবনায় অনেক সাযুজ্য পাওয়া যায়। তাই আমরা এই সিদ্ধান্তে আসতে পারি, বাউল গানের তত্ত্বকে অস্বীকার করে আধুনিক কবিতার পট উন্মোচন সম্ভব নয়, কারণ বাউল সাধনার রন্ধ্রে রন্ধ্রে লুকিয়ে আছে আধুনিকতা। তাই আমরা কবি প্রেমেন্দ্র মিত্রের ভাষায় বলতে পারি—

"আজ এই রাস্তার গান গাইব— এই নগরের শিরা উপশিরার
এই রাস্তার ধূলির গান। ....
তার সঙ্গে গান গাইব মানুষের
যে মানুষ পথ সৃষ্টি করেছে
মানুষের সঙ্গে মানুষের মেলবার পথ....
সে পথ আরো বিস্তৃত হোক
যে পথ মানুষকে বৃহৎ করেছে।"

এই সুন্দর পৃথিবীর যিনি স্রষ্টা, তিনি এক। সমস্ত মানব জাতি এক স্রষ্টা প্রবর্তিত, ধর্ম এক। পৃথিবীর সকল ধর্মের মূল ও মুখ্য উদ্দেশ্য মানুষে মানুষে ও জাতিতে জাতিতে শান্তি প্রতিষ্ঠা করা। প্রতিটি মানুষের অন্তর্নিহিত পরমাত্মার বিকাশ সাধনের জন্যেই ধর্ম। এই ধর্ম মানুষকে শ্রেষ্ঠ গুণান্বিত করে শ্রেষ্ঠ মানব পরিচয়ে মহিমান্বিত করে। লালনকে তাঁর গান সারা বিশ্বের মাঝে তাঁকে শ্রেষ্ঠ প্রতিপন্ন করেছে।

তাইতো লালনের গান অনূদিত হয়েছে। ১৯৬৪ সাল থেকে দেশে ও বিদেশে বিদগ্ধ পণ্ডিতদের দ্বারা লালনের গানের অনুবাদ-কার্য চলেছে। জার্মান ভাষায় লালন গীতির অনুবাদ করেছেন ম্যাডিন উইলিয়ম, হিন্দী ভাষায় অনুবাদ করেন মুচকুন্দ দুবে। জাপানী ভাষায় মাসুডিকি ওনিসি, ফরাসী ভাষায় মাহমুদ শাহ কেরেশী। ইংরাজী ভাষায় কিন্তু লালন গীতির অনুবাদ হয়েছে ব্যাপকভাবে। ইংরাজী ভাষায় অনুবাদ করেছেন ইসি ডিমক, জুন মেড়ানিয়েল, কবীর চৌধুরী,

মকছেদ আলী শাহ্ এবং ক্যারেল সলোমন প্রমুখ।

অজপাড়াগাঁয়ের এক নিরক্ষর বাউলের গানে কি এমন আছে যাতে তাঁর গান সারা বিশ্বের মানুষ আপন করে নিয়েছে? সঙ্গে এই প্রশ্নও জাগে, আমরা বাংলা ভাষার মানুষ হয়েও যাঁর গানের সঠিক অর্থ সর্বদা উদ্ধার করতে পারি না, সেখানে বিদেশী অনুবাদকেরা এর সঠিক অর্থ উদ্ধারে সক্ষম হয়েছেন তো? আমরা এমন সংশয়াদীর্ণ অনেক অনুবাদকের নাম পাই যেমন আবুরুশদ –Songs of Lalan Shah (১ম সংস্করণ ৬০টি গান), মহম্মদ মনসুরউদ্দীন— Bangla Academy Journal- এর সভা Folk Songs of Lalan Shah, মীজানুর রহমান— Lalon's Songs (১৯৮৭), ব্রাদার জেমস-Songs of Lalan (১৮৮৭)।

এখন দেখা যাক লালনগীতের যে সমস্ত অনুবাদ হয়েছে সেগুলির মান কী রকম। অন্যান্য গানগুলির পাশে বাংলার লোকজ দেহতত্ত্বের গান বা গুহ্য সাধনতত্ত্বের বাউল ফকিরী গান অনুবাদের প্রয়াস কি কঠিনতর নয়?

তবে প্রথমে অর্থাৎ ১৯২৫-এ লালন গীতের প্রথম অনুবাদ করতে চেয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ। ভারতীয় দর্শন কংগ্রেসে তিনি 'The Philosophy of our people' নামে যে সভাপতির ভাষণ দেন তাতে তিনি লালনের একটি গান ইংরাজীতে অনুবাদ করে উদ্ধৃত করেছিলেন। লালনের গানটি হল—

"খাঁচার ভিতর অচিন পাখি কেমনে আসে যায়
ধরতে পারলে মন-বেড়ি দিতাম পাখির পায়।"

রবীন্দ্রনাথের অনুবাদ—

Nobody can tell whence the bird unknown
Comes into the cage and goes out
I would feign put round its feet.
The fetter of my mind
Could I but capture it.

এই অনুবাদ সাধারণ অনুবাদ। এই অনুবাদের অচিন পাখি অন্তর্নিহিত অর্থে প্রকাশিত হয়নি। বাউলতত্ত্বে অচিন পাখির একটি আলাদা তাৎপর্য ও প্রতীকধর্মিতা আছে। রবীন্দ্রনাথ সেদিকে না গিয়ে তার ভাবময় ব্যাখ্যা করেছিলেন—

That this unknown is the profoundest reality, though difficult of comprehension, is equally admitted by the English poet as by the nameless village singer of Bengal, in whose music vibrate the wing beats of the unknown bird,... only Shelley's utterance is for the cultural few, while the Baul song is for the tillers of the soil,for the simple folk of our village households, who are never bored by its mystic transcendentalism."

এই অচিন পাখির রহস্যময়তা সম্বন্ধে অনেকটা দিশা দিয়েছে আবু রুশদের অনুবাদ—

How does the strange bird
flit in and out of the cage.
If I could catch the bird
I would put in under the fetters of my hearts.

তাঁর এই অনুবাদে রয়েছে সাবলীলতা, যা পূর্বে উল্লেখ্য রবীন্দ্রনাথের অনুবাদকেও হার মানায়। তার মানে এই নয় যে আমরা রবীন্দ্রনাথকে ছোট করেছি।

ঢাকার সেণ্ট যোসেফ হাইস্কুলের মিশনারী শিক্ষক ব্রাদার জেমস লালন গানের অনুবাদ করেছেন এইভাবে—

লালন গীতি- *রূপের গাছে চাঁদ-ফল ধরেছে তায়*
থেকে থেকে ঝলক দেখা যায়
ও সে চাঁদের বাজার দেখে
চাঁদ ঘুরনি লাগে
দেখিস দেখিস পাছে হোসনে জ্ঞানহারা।

অনুবাদ— On the figure of the Moon
One can see the moonfruit;
Now and then flashes are seen
After gazing at that scene of beauty.
One reels with giddiness.
Be careful how you look:
You may lose your senses.

এই অনুবাদের মধ্যে তত্ত্ববোধের বড়ই অভাব। সে কারণে মূল গানের সঙ্গে সঙ্গতি রাখতে পারে নি। মূল গানের শব্দগুলির গুহ্য অর্থ ব্রাদার জেমস উপলব্ধি করতে পারেনি। যেমন— চাঁদ শব্দটির অর্থ ব্রাদার জেমসের কাছে বোধগম্য হয়নি।

তবে এই গানটির অনুবাদে অনুবাদকের দক্ষতা লক্ষণীয়। অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত এবং ম্যারি ঘ্যান দাশগুপ্ত কর্তৃক অনূদিত এই গানটি বেশ সাবলীল। মূল গান—

আমি একদিনও না দেখিলাম তারে
আমার বাড়ীর কাছে আরশী নগর
এক পড়শী বসত করে।
গেরাম বেড়ে অগাদ পানি
ও তার নাই কিনারা নাই তরণী
পারে।
মনে বাঞ্ছা করি দেখব তারি
আমি কেমনে সে গাঁয় যাইরে।

কী কব সেই পড়শীর কথা
ও তার হস্তপদ স্কন্দ মাথা
নাই রে।
সে ক্ষণেক থাকে শূন্যের উপর
ক্ষণেক ভাসে নীরে।
পড়শী যদি আমায় ছুতো
আমার যম যাতনা যেত দূরে
সে আর লালন একখানে রয়
তবু লক্ষ যোজন ফাঁকরে।

অনুবাদ— In my city of mirrors lives a neighbour of mine;
I have not seen him for a single day.
The city is surrounded by brimming waters.
And there is no sign of coast or boat.
I long to see him.
But how can I get there?
How shall I describe my neighbour?
He has no head, no neck, and no hands.
Sometimes he is in the void,
And sometimes he floats upon the water.
if only my neighbour could touch me.
All my troubles would be over.
He and Lalan live in the same place,
Yet they are millions of miles apart.

এই অনুবাদটি যে প্রকৃত অনুবাদ হিসাবে সফল তা বলা যায়। উপরি-উক্ত অনুবাদকদ্বয় লালন গীতির অনুবাদ করতে এসে গান গুলিকে কয়েকটি পর্যায়ে সাজিয়ে নিয়েছেন যেমন— 1. Roots in the void 2. The wing- flute 3. Troubadours of love 4. The sea of beauty 5. Wedding palanquin.

লালনের গানের অনুবাদে একজনের নাম করতেই হবে তিনি হলেন দেবেন ভট্টাচার্য। তাঁর 'The Mirror of the Sky' বইতে নানা বর্গের বাউল গানের অনুবাদ আছে, তাঁর এই কাজ সম্পর্কে ভূমিকায় তিনি মন্তব্য করেছেন— 'Although I feel that poetry, either in its original language or in translation, ought to be readable without the help of pedantic explanations, in the interest of meaning I have sometimes had to content myself with the presentation of fragments or with the additions of a brief commentary on what might otherwise seem too

obscure.

অনুবাদকের মন্তব্য থেকে বোঝা যায়, অনুবাদের বিষয়ে তিনি বেশ সাহসী পদক্ষেপ নিয়েছেন এবং নির্দ্বিধায় লালনগীতিকে সংকুচিত করেছেন। এই বিশেষ কারণেই তাঁকে নিয়ে আমরা আলোচনা করলাম।

দেবেন ভট্টাচার্য ভূমিকায় আরও মন্তব্য করেছেন যে, 'A number of the songs, in their original versions, are concerned with more complicated aspects of the Baul's religious traditions. None of these can be reproduced in word-for-word translation without elaborate explanatiory notes.'

তাঁর মন্তব্যের স্বপক্ষে তাঁর অনুবাদগুলির নিদর্শন দেওয়া যাক—

আমার এ ঘরখানায় কে বিরাজ করে
আমি জনমভরে একদিন দেখলাম না রে।।
নড়ে চড়ে ঈশান কোণে
দেখতে পাইনে এ নয়নে
হাতের কাছে যার ভবের হাট বাজার
ধরতে গেলে হাতে পাইনে তারে।।
সবে বলে প্রাণ-পাখি
শুনে চুপে চুপে থাকি
জল কী হুতাশন, মাটি কী পবন,
কেউ বলে না একটা নির্ণয় করে,
আপন ঘরের খবর হয় না
বাঞ্ছা করি পরকে চেনা
লালন বলে, পর বলতে পরমেশ্বর
সে কেমন রূপ আমি কিরূপ ওরে।।

অনুবাদ—

Never in my life
Did I once face
The man who lives
In my own little room.
My eyes blinded
By the weight of stroms.
Can see nothing,
Even when he stirs.
My hands fail
To reach his hands
As he in forever engaged

With the world
I keep silent
When they call him
The bird of life,
And the water
And the fire
And the earth
And the air
while no one is sure
Could I ever wise
To know anyone else?
I dont yet know
My own little room.

এখানে অনুবাদ বিষয়টির থেকে লেখকের স্বেচ্ছাচারিতা বেশি নজরে পড়ে। ফলে গানের যে মূলসুর, স্বাতন্ত্র্য তা নষ্ট হয়ে গেছে। তা ছাড়া অনুবাদক তাঁর অনুবাদে word for word রীতি মেনে নেননি এবং elaborate explonatory notes-ও বাদ দিয়েছেন। তাই তাঁর অনুবাদ যে যথার্থ নয় এই বিষয়ে প্রশ্ন থেকেই যাচ্ছে। লালনগীতি অনুবাদে যাঁকে স্মরণ না করলে এই প্রবন্ধ অপূর্ণ থেকে যাবে, তিনি হলেন প্রখ্যাত বাউল তাত্ত্বিক এডওয়ার্ড সি. ডিমক। নাম থেকেই বোঝা যায় তিনি বাঙালী নন। কিন্তু বাংলা ভাষা তাঁর করায়ত্ত। তাঁর "The place of the Hidden moon", Chicago, 1966 বইটিতে তিনি বাউল গানের অনুবাদ করেছেন। তাঁর অনুবাদেব নিদর্শন—

প্রথম স্তবক ১. *পাখি কখন যেন উড়ে যায়*
বদ হাওয়া লেগে খাঁচায়
খাঁচার আড়া পল ঢসে
পাখি আর দাঁড়াবে কিসে
এখন আমি ভাবি বসে
সদা চমক-জ্বরা বচ্ছে গায়

২. ....

৩. ....

শেষ স্তবক *যেদিন সাধের পাখি যাবে উড়ে*
খালি খাঁচা রবে পড়ে
সেদিন সঙ্গের সাথী কেউ হবে ন
ফকির লালন কেঁদে কয়।

অনুবাদ— প্রথম স্তবক—

The bird has flown away.
An evil wind has struck
and smashed his cage.
His perch is fallen
and no more will be his rest.

শেষ স্তবক

The bird of my desire
has flown away, and left an empty
cage, and I have no friend more
and no companion.

এ ছাড়া— লালনের অতি পরিচিত গান
"আমি একদিনও না দেখিলাম তারে"

গানটির সুন্দর সাবলীল অনুবাদ করেছেন ডিমক—

I have never seen him
though he is my neighbour
though he dwells in a mirrored city
near my house.
For around that is a moat.
bottomless and endless;
there is no way to reach the further shore.
My heart yearns to see him,
but I can never reach his city.

এই অনুবাদ ভাবানুবাদ। তবু তা সুখপাঠ্য, মূল ভাব বজায় রয়েছে সর্বদা। ডিমক প্রয়োজনে স্বাধীনতা নিয়েছেন। যেমন এই গানটি —

একবার জগন্নাথে দেখ রে যেয়ে
জাত কেমন রাখো বাঁচিয়ে
চণ্ডালে আনিলে অন্ন ব্রাহ্মণে তাই খায় চেয়ে।।
জোলা ছিল কবীর দাস
তার তোড়ানি বার মাস
উঠ্‌কে উতলিয়ে সেই তোড়ানি
খায় যে ধনি সেই আশে
দরশন পেয়ে।।

ধন্য প্রভু জগন্নাথ
চায় না রে সে জাত অজাত
ভক্তের অধীন সে জাত

বিচারী দুরাচারী যারা
সব দূর হয়ে।।
জাত না গেলে পাইনে হরি
কি ছার জেতের গৌরব করি
ছুঁসনে বলিয়ে।
লালন কয়, জাত হাতে পেলে
পুড়াতাম আগুন দিয়ে।।

এই গানটির মূল ভাব ও অর্থকে অনুবাদ করছেন ডিমক তাঁর নিজস্ব ভঙ্গীতে—

Go, once to see Jagannatha, see there how caste is kept,
A Candala brings a Brahman's food, and the Brahman takes and eats.
Kabir was a Jola......
In such measure as one lives by caste in that measure he is evil....
Do not sing the eulogies of caste, saying "Do not him touch....."
Lalan says, if I could take caste into my hands.,
I would hurl it into the fire.

দেখা যাচ্ছে, এখানে অনুবাদক যথেষ্ট স্বেচ্ছাচারিতার আশ্রয় নিয়েছেন। ফলে অনুবাদ হিসাবে এটি অনুবাদ হয়নি।

"Folk poems from Bangladesh" নামের বইটিতে বাংলাদেশের বিভিন্ন লোকসংগীতের অনুবাদ আছে, যেখানে কবীর চৌধুরী লালন গীতির অনুবাদ করেছেন। সেই প্রসঙ্গে ভূমিকাতে তিনি বলেছেন—

"Mysitc Baul songs, perhaps, constiute the richest and most ancient category of our folk songs. Lalan is the undisputed king in this category, in fact, in the whole range of our folk literature. Boul songs are characterised by a longing to unravel the secrets of the Ultimate Being, the Creator, and to merge with him indissolubly. Along with the note of deep spritual ardour in these songs there is an unmistakable suggestion that the doors of the spirit can be unlocked only by grappling with and solving the mysteries of the body."

কবীর চৌধুরী লালন গানের যে অনুবাদ করেছেন তার কয়েকটি নিদর্শন, যেমন গানের অংশটুকু :

জগৎ বেড়ে জাতের কথা
লোকে গৌরব করে যথাতথা,
লালন সেই জাতের ফাতা

বিকিয়েছে সাধ বাজারে।

অনুবাদ— Futile is all this talk about one's caste
For nothing do we bicker and wrangle.
Says Lalon, I have drowned this controversy
In the market-place of my longings.

এছাড়া *জাত গেল জাত গেল বলে*
একি আজব কারখানা
সত্যপথে কেউ রাজী নয়
সবই দেখি তা না না না।

অনুবাদ— I'll be ex-communicated I'll lose caste,
cries everybody: what a strange affair is this.
But no one wants to follow
the path of truth.
I see that every body dillydallies.

এখানে গানগুলিকে অনুবাদ করা হলেও লালনের গানের সেই কবিত্ব শক্তি এবং আঞ্চলিক শব্দগুলির মূল অর্থকে ফুটিয়ে তুলতে পারেননি।

লালন গানের আরেক অনুবাদক হলেন ক্যারল সলোমন। তাঁর অনুবাদের নমুনা দেওয়া হল এই গানটির প্রথম ও শেষ স্তবকে

মূলগান *আমি একদিনও না দেখিলাম তারে।।*
বাড়ির কাছে আরশিনগর পড়শী বসত করে।।

পড়শী যদি আমায় ছুতো
যম যাতনা সকল যেতো দূরে।
সে আর লালন একখানে রয়
লক্ষ যোজন ফাঁকরে।

অনুবাদ— I have not seen him even once
my neighbour
who lives in a city of mirrors
near my house

if my neighbour touched me
I'd never feel the pain of death.
He and Lalon are in the same place
Yet five hundred thousand miles apart

একটি লালন গীতি—

এক ফুলে চার রঙ ধরেছে
ও সে ভাবনগরে ফুলে কি আজব শোভা করেছে।
মূল ছাড়া সে ফুলের লতা
ডাল ছাড়া তার আছে পাতা
এ বড় অকৈতব কথা
প্রত্যয় হবে কই কার কাছে।

অনুবাদ, সুলেমন— Four colours in a single flower
How strangely beautiful
That flower makes the city of Love
The flower has a stream, but no roots
It has leaves but no branches,
This story is true
But who can I tell it to?
who would believe me ?

এই সব অনুবাদ অত্যন্ত সুন্দর হলেও তা বোধগম্য হওয়া মুশকিল। যেমন এই গানটি—

ডুবে দেখ মন দেল-দরিয়ায়
যে ফুলে নবীর জন্ম হয়
সে ফুল তো সামান্য নয়।
লালন কয় যার মূল নাই দেশে।

অনুবাদ — O' mind, dive
into the ocean of the heart.
it is no ordinary flower
from which the prophet was born.
Lalon says, its root are not in the ground.

ক্যারল সলোমন অনূদিত আর একটি গান, যার শিরোনাম দিয়েছেন "The Riddle of the prophet "

মূলগান— *নবী আব্বল আখের বাতিন জাহের*
নবী কখন কী রূপধারণ করে কোনখানে।
আসমান জমিন জল আদি পবন
যে নবীর নূরে হল সৃজন
বল কিসে ছিল সে নবীর আসন
নবী পুরুষ কি প্রকৃতি আকার তখনে।।

অনুবাদ — He is first and last

Concealed and clear.
The prophet can take any form
anytime any where.
From the prophet's light
Came sky and earth
water and wind.
Tell me what kind of seat
did he sit on ?
Was he male or female then ?

এখানে অনুবাদক বিশেষ শব্দের গুহ্য অর্থ অনুধাবন করে তা অনুবাদে সচেষ্ট হয়েছেন।

মুহম্মদ মনসুরউদ্দীন একজন প্রখ্যাত বাউল তাত্ত্বিক। তিনিও লালনের বেশ কয়েকটি গান ইংরাজীতে অনুবাদ করার চেষ্টা করেছেন। তাছাড়া তিনি নিজে মুসলিম হওয়ার কারণে বাউল মারফতি গানের আঞ্চলিক তথা মুসলিম শব্দগুলির যথার্থ অর্থদানে সচেষ্ট হয়েছেন। তাঁর কিছু অনুবাদ করা গানের নমুনা দেওয়া যাক :

আগে শরীয়ত জান বুদ্ধি শান্ত করে।
রোজা আর নামাজ শরীয়তের কাজ
শরীয়ত আসল ঠিক বলছ কারে।।
নামাজ রোজা কলমা জাকাত
তাও করিলে কয় শরীয়ত
শরা কবুল কর।
ভাবে বোঝা যায় কলমা শরীয়ত নয়
শরীয়তের আরো পরমার্থ থাকতে পারে।

অনুবাদ — You know first the 'Shariat' and then settle
your intellect
Fasting and prayers are these act of the 'Shariat'
What do you call the original 'Shariat'
Fasting, praying, saying the Kalma and giving Zakat,
—these when done, is
called 'Shariat' and you accept the
law's of 'Shariat'
By intuition it is understood that uttering
the Kalma alone is not the 'Shariat'.
There may be hidden some great
meaning in the 'Shariat'

এটি একেবারে খাঁটি তাত্ত্বিক বিচারের গান, আর একটি সংকেত বহুল গান অনুবাদ করেছেন মনসুরউদ্দীন। এখন দেখা যাক কিভাবে ফুটে উঠেছে লালনের সংকেত বহুল শব্দগুলি মনসুরউদ্দীনের অনুবাদে।

মূলগান — আব-হায়াতের নদী কোনখানে।
আগে জেন্দাপীরের খান্দানে যাও দেখিয়ে দিবে সন্ধানে।
মওলারে মহিমারে এমনি
সেই নদীতে হয় অমৃত পাণি
তার এক রতি পরশে শুনি
অমর হবে সেই জনে।।
সেই নদীর পিছল ঘাটা
কত চাঁদ কোটালে খেলছে রে ভাঁটা
দীন দুনিয়ায় জোড়া একটা
মীন আছে তার মাঝখানে।।

অনুবাদ — Where is the river of life?
You go first to the illuminated
Spiritual guide, he will guide you to it.
That river he got slippery Ghat, the ebb-tide was flowing in its depth.
There is a fish in it that is all the world-wide
The glories of God are as such, that there is
enough water of bliss,
He. who is touched by its single drop, is made immortal forever.

অনুবাদটি অতিকথন দোষে দুষ্ট। কারণ গানটি শব্দের চাপে গুরুগম্ভীর হয়ে গেছে। এই অনুবাদে লৌকিক ও আঞ্চলিক শব্দগুলি যথার্থ মর্যাদা পাচ্ছে না। তাই লালন গানের অনুবাদক রুশদ নিজেই স্বীকার করেছেন যে— "He often descends into dialect which in the original has a rare flavour and texture but which the English Vocabulary is unfortunately unable to accommodate; hence the necessity improvise within, of course, my capacity to handle the foreign and fricky medium of English".

তাই আবু রুশদ-এর মত দক্ষ অনুবাদকও লালন-গান অনুবাদে হিমসিম খেয়েছেন। যেমন—

হড়ুম হাড়ুম দাড়ুম দুড়ুম
লাফালাফি করছো এখন,
আসছে শমন-জেলে খেপলা ফেলে
করবে তুলে খালুই পূরণ

অনুবাদ — Now you fight and play and race
and shout and jump.
Soon the Summons will come
and all this excitement end.

লালন গীতির সর্বাধিক অনুবাদক হিসাবে খ্যাত আবু রুশদ বাংলাদেশের একজন বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ। তাঁর প্রথম অনুবাদের বইটির নাম 'Songs of Lalon Fakir'। তিনি তাঁর অনুবাদগুলিকে সাতটি পর্যায়ে সাজিয়েছেন—

1. A-Hymn 2. Devotional songs 3. Body mystery. 4. self-knowledge
5. Enquiry 6. Ultimate knowledge 7. Miscellaneous.

অনুবাদক আবু রুশদ লালন সম্পর্কে বেশ কিছু ইতিবাচক মন্তব্য করেছেন। লালন তাঁর গানে, কিছু শব্দ যেমন পাপ ও পাপী, সৃষ্টি, মৃত্যু, নির্জনতা ও নিরাশ্রয়তা ব্যবহার করেছেন। তাঁর সম্পর্কে আবু রুশদের মন্তব্য—

The common images suggest a limited mind–which indeed Laon Shah was.......................... Nevertheless, within this limited range, Lalon Shah is able to attain a fine religious fervours, a certain subtlety of perception, and an easy style remarkable in a man of little formal education. The thought content in these songs is something to take notice of and the felicitious case with which the complexities of theology and mysticism are disentangled is admirable. Lalon Shah has a clear and an intense vision coupled with a highly developed imagination."

তাই বলা যায়, লালনের গানের যে মূলতত্ত্ব তা আজও আমাদের কাছে পরিষ্কার নয়। সেই কারণে অনুবাদ যতই হোক না কেন, তা কখনই গঠনমূলক তেমন কিছু নয়। তাই সত্যের খাতিরে বলতেই হবে যে, ব্যক্তিবিশেষে লালনের অনুরাগসঞ্জাত অনুবাদের দ্বারা সমগ্র লালনকে কখনই আন্তর্জাতিক বিশ্বে বা অ-বাংলা ভাষাভাষীদের মধ্যে প্রচারিত করা যাবে না। লালনের গানের প্রকৃত অনুবাদ বাংলাদেশ ও পশ্চিমবাংলার অনুবাদকদের মধ্যে সমন্বয় সাধনের মাধ্যমেই করা সম্ভব। এই প্রয়াস যতটুকু হয়েছে তাতে লালনের গানের অনিবার্য আকর্ষণ ও গভীরতাকেই প্রকাশ করে—বোঝা যায় লোকমানসে লালনের স্থান কত উচ্চে।

লোকভাষা ও লালনগীতি

ভাষা কেবল মানব সমাজ এবং ব্যক্তি সম্পর্কের কেন্দ্রীয় শক্তিই নয়, মানব সভ্যতার দর্পনও। ভাষা যেমন সামাজিক সম্পর্ককে দৃঢ় করে, তেমনই আবার সমাজ ইতিহাসকে তুলে ধরে। তবে ভাষার প্রধান কাজ হল ভাববিনিময় ও চাহিদা বা অভাব পূরণ। মানুষ তার ব্যক্তিগত চাহিদা বা অভাব পূরণের জন্য অন্য মানুষের সঙ্গে মিলিত হতে চায়, চায় সংঘবদ্ধ হতে, ফলে পরস্পরের মধ্যে ভাববিনিময় বা মানসিক যোগ অপরিহার্য হয়ে ওঠে, তারই ফলে সৃষ্টি হয় ভাষা।

আদিমকালে মানুষ যখন একাকী বন্যজীবন যাপন করত, তখন ভাষার প্রয়োজন হয়নি। কিন্তু পরবর্তীকালে বন্য হিংস্র পশুর হাত থেকে আত্মরক্ষার জন্য এবং খাদ্যের চাহিদা মেটানোর জন্য আদিম মানুষ পরস্পরের সঙ্গে মিলিত হতে থাকে—ছোট ছোট গোষ্ঠী বা সংঘ সৃষ্টি হয়। এবং তাদের মধ্যে পরস্পরের সঙ্গে ভাববিনিময়ের মাধ্যম হিসাবে ভাষার সৃষ্টি হয়। তাই বলা যায়, ভাষায় আদি স্রষ্টা আদিম জনগোষ্ঠী। এই আদিম জনগোষ্ঠীকে কেন্দ্র করেই ভাষার বিস্তার ও সমৃদ্ধি। আদিম মানবগোষ্ঠী ছিল যাযাবর, আর এই জনগোষ্ঠীর যাযাবর বৃত্তির জন্য তাদের ভাষার স্থান-কাল-পাত্রের প্রভেদে নানা পরিবর্তন ও রূপান্তর ঘটতে থাকে।

এখন প্রশ্ন হল ভাষা কাকে বলে। সাধারণভাবে আমরা বলতে পারি একটি জনসমাজের মানুষ বাগ্‌যন্ত্রের সাহায্যে উচ্চারিত যে ধ্বনিপ্রবাহের মাধ্যমে পরস্পরের মধ্যে ভাববিনিময় করে, তাকে ভাষা বলে। বিখ্যাত ভাষাবিজ্ঞানী স্টার্টেভাণ্ট (Edgar H. Sturtevant) ভাষার সংজ্ঞায় বলেছেন— 'A language is a system of arbitrary vocal symbols by which members of a social group co-operate and interact.'[১] আমরা ভাষার (Language) প্রকৃতি (Nature) এবং বৈশিষ্ট্য (characteristic) অনুসারে ভাষাকে তিনভাগে ভাগ করতে পারি। ১। শিষ্ট ভাষা (Standard Language), ২। উপভাষা (Dialect) এবং ৩। লোকভাষা (Folk-speech/Folk Language/Rural Language)।

শিষ্ট ভাষা (Standard/Cultivated Language) বলতে ভাষায় এমন এক উন্নততর ও সমৃদ্ধশীল স্তরকে বোঝায়, যা একটি ভাষা-সম্প্রদায়ের (speech-community) সকলের মান্য ও গৃহীত বা সাধারণীকৃত। এই ভাষা শিক্ষিত, শহুরে এবং উচ্চ বা মধ্যবিত্ত মানুষের ভাষা। এই ভাষা উন্নততর শিক্ষা ও সংস্কৃতির সাথে যুক্ত। ফলে এই ভাষা স্কুলে পড়ানো হয় এবং বিভিন্ন গণমাধ্যমের বাহন হিসাবে কাজ করে। এই ভাষা অনেকটা উপভাষা ও লোকভাষার সংস্কার করা রূপ। তাই একদিকে এই ভাষা যেমন অভিজাত তেমনি কৃত্রিমও। এই শিষ্ট ভাষাকে দু'ভাগে ভাগ করতে পারি (ক) সাহিত্যিক ভাষা এবং (খ) মৌখিক ভাষা। সাহিত্যিক ভাষা আবার বাক্যগঠনের দিক থেকে দু'ভাগে বিন্যস্ত— ১। পদ্য এবং ২। গদ্য।

ভাষার সবচেয়ে পরিচিত এবং বিচিত্র পরিবর্তন হল ভৌগোলিক। এই পরিবর্তন যখন

সামান্য, তখন তা উপভাষা (Dialect)। উপভাষার সংজ্ঞা দিতে গিয়ে অধ্যাপক সুকুমার সেন বলেছেন— "কোন ভাষাসম্প্রদায়ের অন্তর্গত ছোট ছোট দলে বা অঞ্চলে বিশেষ প্রচলিত ভাষাছাঁদকে উপভাষা (Dialect) বলে।"[১] কোন একটি ভাষায় যারা কথা বলে তাদের সংখ্যা বৃদ্ধি পেলে বা আঞ্চলিক বিস্তার ঘটলে সেই ভাষার অঞ্চল বিশেষে ছোট ছোট পার্থক্য সৃষ্টি হয়। এই পার্থক্য হতে পারে—ধ্বনিগত (Sound) অনুবয়ন (Angalogy formation), ভাষাঋণ (Borrowing) এবং রূপতত্ত্বগত (Morphological) । একই ভাষার মধ্যে এই যে আঞ্চলিক পার্থক্য একে বলে উপভাষা। উপভাষার সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলা হয়েছে—'A specific form of a given language, spoken in a certain locality or geographic area, showing sufficient differences from the standard or literary form of that language, as to pronunciation, grammatical construction and idiomatic usage of words, to be considered a distinct entity, yet not sufficiently distinct from other dialects of the language to be regarded as a different language'.[৩]

এই উপভাষা সম্পর্কে প্রায় একই কথা বলেছেন—অধ্যাপক ডঃ রামেশ্বর শ'- "উপভাষা হল একটি ভাষার অন্তর্গত এমন বিশেষ-বিশেষ রূপ যা এক-একটি বিশেষ অঞ্চলে প্রচলিত, যার সঙ্গে আদর্শ ভাষা (standared language) বা সাহিত্যিক ভাষার (literary language) ধ্বনিগত, রূপগত ও বিশিষ্ট বাগ্‌ধারাগত পার্থক্য আছে; এই পার্থক্য এমন সুস্পষ্ট যে ঐসব বিশেষ-বিশেষ অঞ্চলের রূপগুলিকে স্বতন্ত্র বলে ধরা যাবে, অথচ পার্থক্যটা যেন এত বেশী না হয় যাতে আঞ্চলিক রূপগুলিই এক-একটি সম্পূর্ণ পৃথক ভাষা হয়ে ওঠে"।[৮]

তবে এই আঞ্চলিক পার্থক্যের মাত্রা সুনির্দিষ্ট নয়। অর্থাৎ একই ভাষার মধ্যে আঞ্চলিক পার্থক্য কোন্ স্তরে পৌঁছলে তা উপভাষা থাকবে এবং কোন পর্যায়ে গেলে ভাষায় পরিণত হবে তার কোন সুনির্দিষ্ট মানদণ্ড বা মাপক নেই। তাই কেউ কেউ বলেন, ভাষার আঞ্চলিক রূপ যখন স্বতন্ত্র জনগোষ্ঠীর ভাবপ্রকাশের হাতিয়ার তখন তা উপভাষা নয়, ভাষা। আবার কেউ কেউ এমন সিদ্ধান্ত করেছেন যে, একই ভাষিক অঞ্চলে প্রচলিত ভাষার ভিতর যে আঞ্চলিক পার্থক্য আছে তা যতদিন পারস্পরিক বোধগম্যতা (Mutual intelligibility) থাকে ততদিন তা উপভাষা (Dialect); আর পারস্পরিক বোধগম্যতার সীমা অতিক্রম করলে, তা ভাষায় পরিণত হয়। কিন্তু ভাষা ও উপভাষার মধ্যে যে পার্থক্য করা হয় তা যেমন চূড়ান্ত নয়, তেমনি সুনির্দিষ্টও নয়— তা আপেক্ষিক এবং পরিবর্তনশীল।

লোকভাষা (Folk-Language/Folk-Speech/ Rural Language) কথাটি সম্প্রতি কালে ভাষাবিজ্ঞানীর গবেষণার টেবিল থেকে সৃষ্টি হয়ে ভাষাবিজ্ঞানে স্থান লাভ করেছে। ফলে এই লোকভাষা সম্পর্কে এখনও আমাদের কোন স্পষ্ট ধারণা গড়ে ওঠে নি, তা ছাড়া লোকভাষা সম্পর্কে গবেষণাধর্মী আলোচনাও বেশি একটা হয়নি, যতটা হয়েছে তাও পরস্পর বিরোধী

মতবাদে পরিপূর্ণ, তা বড় বেশি জটিল, কোন সহজ সরল ধারণা প্রতিষ্ঠা লাভ করেনি। এমন কি 'লোকভাষা'র পরিভাষা নিয়েও নানা মুনির নানা মত প্রচলিত। এ প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের দু'টি রচনাংশ মনে আসছে—'কিন্তু বাংলার অসাধু ভাষাটা খুব জোরালো ভাষা, এবং তাহার চেহারা বলিয়া একটা পদার্থ আছে। আমাদের সাধু ভাষার কাব্যে অসাধু এই ভাষাকে একেবারেই আমল দেওয়া হয় নাই কিন্তু তাই বলিয়া অসাধু ভাষা যে বাসায় গিয়া মরিয়া আছে তাহা নহে, সে আউলের মুখে, বাউলের মুখে, ভক্ত কবিদের গানে, মেয়েদের ছড়ায় রহিয়াছে। কেবল ছাপার কালির তিলক পরিয়া সে ভদ্র-সাহিত্য সভায় মোড়লি করিয়া বেড়াইতে পারে নাই, কিন্তু তাহার কণ্ঠে গান থামে নাই, তাহার বাঁশের বাঁশি বাজিতেছেই।'[৫]

অন্য একটি প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন- 'এই প্রাকৃত বাংলা মেয়েদের ছড়ায়, বাউলের গানে, রামপ্রসাদের পদে, আপন স্বভাবে প্রকাশ পেয়েছে। কিন্তু সাধু ভাষায় তার সমাদর হয়নি বলে সে মুখ ফুটে নিজের সব কথা বলতে পারেনি এবং তার শক্তি যে কত তারও সম্পূর্ণ পরিচয় হলে না।'[৬]

অথবা মনে করুন—'চলিত ভাষার স্বভাব রক্ষা করে বাংলা ছন্দে কবিতা যা লেখা হয়েছে সে আমাদের লোক গাথায়, বাউলের গানে, ছেলে ভোলাধার ও ঘুম পাড়াবার ছড়ায়, ব্রত কথায়।'[৭]

প্রথম উদ্ধৃতিতে 'অসাধু ভাষা' বলতে রবীন্দ্রনাথ যেমন শিষ্টভাষাকে বোঝান নি, তেমনি আবার উপভাষাকেও নির্দেশ করেন নি— এই দুই ভাষা থেকে নতুন এক ভাষার কথা বলেছেন। কেননা আউল-বাউল-ভক্তকবির গানে বা ছড়ায় যে ভাষার পরিচয় পাই তা যে শিষ্ট ভাষা বা উপভাষা নয়, তা সর্বজনস্বীকৃত। তাই বলতে পারি, তিনি 'অসাধু ভাষা' বলতে এমন ভাষাকে বুঝিয়েছেন, যার সাথে জনজীবনের অবিচ্ছেদ্য যোগ। আবার দ্বিতীয় উদাহরণের 'প্রাকৃত বাংলা' বলতে রবীন্দ্রনাথ 'অসাধুভাষা'র সমগোত্রীয় জনসাধারণের ভাষাকে বুঝিয়েছেন। আর 'চলিত ভাষা' বলতে তৃতীয় দৃষ্টান্তে তিনি যে ভাষাকে নির্দেশ করেছেন তাও গণজীবনের ভাষা। রবীন্দ্রনাথ বর্ণিত এই ভাষা সাধু নয়, মান্যচলিতও পুরোপুরি হয়ে ওঠেনি, বা কোন আঞ্চলিক ভাষা বা উপভাষাও নয়। এই ভাষাকে আমরা বলতে পারি 'লোকভাষা'।

লোকভাষা সম্পর্কে প্রথম সচেতনভাবে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে আলোচনার সূত্রপাত করেন হেনরি এম. হেনিজ্ সোয়াল্ড (Henry M. Hoenigswald)।[৮]

১৯৬৪ সালে লস্ এঞ্জেলসে সমাজভাষাবিজ্ঞানের (Sociolinguistics) উপর ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে যে সেমিনার হয় তাতে হেনিজ্সোয়াল্ড folk-linguistics বিষয়ে একটি প্রবন্ধ পাঠ করেন। তখন থেকেই পরিভাষা নিয়ে সমস্যা দেখা যায়। লোকভাষার পরিভাষা হিসাবে সেখানে পাশাপাশি স্থান পেতে থাকল 'Folk Language', 'Folk-Speech' বা 'Rural

Language'। 'Folk-Speech' কথাটি জার্মানি ভাষার 'Volksprache' শব্দের ইংরেজি অনুবাদ বলে মনে হয়। কেননা জার্মানি ভাষায় 'Volksprache' কথার অর্থ হল 'উপভাষা'। লোকভাষা বলতে আধুনিক ভাষাবিজ্ঞানে 'Rural Language' শব্দটি ব্যবহৃত হয়, যার থেকে সৃষ্টি হয়েছে 'Ruralinguistics'। সে যাই হোক, পশ্চিম দেশে 'Folk Language', বলতে সাধারণভাবে বোঝায় গেঁয়ো বা অমার্জিত গ্রাম্য ভাষা অর্থাৎ যে ভাষা নাগরিক, মার্জিত বা standared নয়।

আমাদের দেশেও লোকভাষার সমার্থক শব্দ হিসাবে কোন কোন ভাষাতাত্ত্বিক 'গ্রাম্যভাষা',[৯] কেউ বা 'লোকসাহিত্যের ভাষা'[১০] গ্রহণ করেছেন। তবে তাঁরা কিন্তু ইংরেজি Folk Language কে মূল হিসাবে ধরেছেন। আমাদের মনে হয় Folk Language এর প্রতিশব্দ হিসাবে 'লোকভাষা' উপযুক্ত হবে। ডঃ পবিত্র সরকার 'গ্রাম্যভাষা'র সমর্থনে বলেছেন—'লোকভাষা (Folk Language) কোনো বিশেষ অঞ্চলের উপভাষা নয়। নাগরিক ভাষার সঙ্গে — বাংলার ক্ষেত্রে মান্য মার্জিত কলকাতার বা শহরের 'শিষ্ট' ভাষার সঙ্গে বিরোধে যে-ভাষা গ্রাম্য বলে চিহ্নিত হতে পারে তা-ই লোকভাষা। আধুনিক ভাষাবিজ্ঞানে একে কখনও কখনও Rural Languageও বলা হয়। যা থেকে Rural Linguistics কথাটি তৈরি হয়েছে। এই গ্রাম্যভাষাবিজ্ঞান হল ভাষার 'অনাগরিকতা'র লক্ষণগুলিকে আবিষ্কার করা, কোনো বিশেষ আঞ্চলিকতার লক্ষণ নির্ধারণ নয়........ভাষায় সাধারণভাবে গ্রামীণতার যে লক্ষণগুলিকে শহরের লোক আলাদা করে চিহ্নিত করে সেগুলি লোকভাষা বা গ্রাম্যভাষার নির্ণায়ক। এই কারণে আমরা Folk Language এর বাংলা হিসেবে 'গ্রাম্যভাষা' কথাটি সুপারিশ করি, 'লোকভাষা' নয়। অবশ্য এই 'গ্রাম্য' কথাটির মধ্যে কোনো নিন্দা বা অবজ্ঞার প্রশ্ন নেই, এটি নেহাৎ ই একটি স্বাতন্ত্র্যসূচক ধারণা; যা নাগরিক বা শহুরে নয়, তা-ই গ্রাম্য।'[১১]

আমরা ডঃ সরকারের সুপারিশকৃত Folk Language এরং প্রতিশব্দ হিসাবে 'গ্রাম্যভাষা'কে গ্রহণ করতে পারছিনা। কেননা 'গ্রাম্যভাষা'কে স্বীকার করে নিলে এক নতুন ধরনের সমস্যার সৃষ্টি হবে। প্রথমত, 'গ্রাম্যভাষা'র বাহ্যগঠনে মনে হবে এই ভাষা কেবল গ্রাম্যজীবনের গণ্ডিতে সীমাবদ্ধ, শহুরে এই ভাষার কোন অস্তিত্ব নেই। কিন্তু কার্যক্ষেত্রে দেখা গেছে শহুরে এই ভাষা সমভাবে অস্তিত্ববান। অর্থাৎ গ্রাম্যভাষাকে গ্রহণ করলে ভাষার স্থানিক ব্যাপ্তিকে ধরা সম্ভব হবে না। তাছাড়া 'গ্রাম্যভাষা' বলতে তিনি 'অনাগরিকতা' বা 'গ্রামীনতার' লক্ষণযুক্ত ভাষাকে বুঝিয়েছেন। আমরা যদি Folk Language-এর প্রতিশব্দ হিসাবে 'গ্রাম্যভাষা'কে গ্রহণ করি, তাহলে উপভাষাকেও (Dialect) গ্রাম্যভাষা বা লোকভাষা বলতে হয়। কেননা বাংলায় প্রচলিত সমস্ত উপভাষা (Dialect) শিষ্ট (standared) ভাষা বা নাগরিক ভাষা থেকে আলাদা, গ্রামীণতার ও অনাগরিকতার লক্ষণ যুক্ত। কিন্তু আমরা কখনই উপভাষাকে লোকভাষা বলতে পারিনা— লোকভাষা থেকে উপভাষা স্বতন্ত্র। তাই আমরা Folk-Language-এর প্রতিশব্দ 'গ্রাম্যভাষা'কে নয়, 'লোকভাষা'কেই গ্রহণ করলাম।

লোকভাষা সম্পর্কে বেশকিছু গবেষণাধর্মী মননশীল প্রবন্ধ রচিত হয়েছে। কিন্তু দুঃখের

বিষয় এখনও বিতর্কের বেড়াজাল অতিক্রম করে লোকভাষার পূর্ণাঙ্গ সংজ্ঞা ও স্বরূপ নিরূপিত হয়নি। কেউ কেউ বলেন লোকমুখের ভাষা হল লোকভাষা। কেউবা বলেন, লোকসাহিত্যের ভাষা হল লোকভাষা। কেউ গ্রাম্যভাষাকেই লোকভাষা বলেছেন। উপভাষাকেই কোন কোন গবেষক লোকভাষার প্রকার ভেদ বলে মত দিয়েছেন। ডঃ অমলেন্দুবিকাশ জানা লোকভাষা প্রসঙ্গে বলেছেন— 'লোকভাষা' শব্দটির অর্থবৃত্ত এবং তার পরিধির সম্ভাব্য প্রসারণ-সংকোচন নিয়ে আমাদের ধারণাটা এখনও খুব স্বচ্ছ নয়। বোধ হয় শব্দটির অতিসরল গঠন এবং তার অন্তর্গত সরলতাহীন ভাবানুষঙ্গ শব্দটির অর্থবোধ ও ব্যাখ্যায় জটিলতা এনে দিয়েছে।....

'লোকভাষা' শব্দটিকে 'লোকমুখের ভাষা'- এরকম ব্যাসবাক্যে শ্রেণীবদ্ধ করা যায়। বোধকরি এটাই এই শব্দার্থের একমাত্র প্রায়োগিক স্বরূপ। এই 'লোক' কারা জানা চাই। এঁরা হলেন প্রাকৃত বা সাধারণ মানুষ, যাঁরা জন্মগতভাবে ও পরিবেশসূত্রে প্রচলিত কথ্যভাষাকে মাতৃভাষাজ্ঞানে আয়ত্ত করেছেন সহজে। প্রচলিত এই কথ্যভাষাকে লোকভাষা বলা উচিত। এই লোকভাষাকে নিঃসন্দেহে আঞ্চলিক ভাষাও বলা যাবে। এই লোকভাষা গ্রাম ও শহরে পৃথক স্বরূপে পরিচিত ও বিকশিত। আমাদের বিচারে গ্রামকেন্দ্রিক আঞ্চলিক ভাষা এবং লোকভাষা মূলত একই বস্তু।'।[১২]

অধ্যাপক পরেশচন্দ্র মজুমদার 'লোকভাষার স্বরূপ সন্ধানে' প্রবন্ধে বলেছেন —'লোকভাষা হলো বিভিন্ন কারণে-বিচ্ছিন্ন গোষ্ঠী, সম্প্রদায় বা কৌমজনের ভাষা যা-নানা কারণেই ক্রমক্ষয়িষ্ণু।'[১৩] তিনি আরোও বলেছেন 'সমাজভাষাবিজ্ঞানের নিরিখে লোকভাষাও(Folkspeech) এক সমাজ -উপভাষা (sociolect)। বিভিন্ন কারণে বিচ্ছিন্ন গোষ্ঠী, সম্প্রদায় বা উপজাতির মধ্যে লোকভাষা ধারাবাহিক সূত্রে জীবিত থাকে। এই ভাষা শহরে সংস্কৃতির প্রভাবে অথবা মান্যভাষা/শিষ্ট ভাষার চাপে সাধারণত বিপর্যস্ত বা ক্ষীয়মাণ হয়ে পড়ে। তবু লোকভাষাভাষীদের সমাজ-আনুগত্য এবং গোষ্ঠীসত্তা তাদের জীবনবোধের সংহতি বলে (solidarity) উচ্চতর সমাজের পরিশীলিত সামর্থের (Power) বিরুদ্ধে প্রতিরোধও রচনা করে থাকে। সুতরাং লোকভাষার গোষ্ঠী-অনুভব (Community-feeling) যতটা স্বাভাবিক ঐক্য গড়ে তোলে, তার চেয়ে বেশি গড়ে তোলে সামাজিক ঐক্য। আসলে লোকভাষার unit ভাষাগত নয়, সমাজগত।'[১৪]

ডঃ আশিসকুমার দে উপভাষাকে মূল হিসাবে ধরে তাকে তিনটি শ্রেণীতে বিন্যস্ত করেছেন— ১। শিষ্টভাষা, ২। জনভাষা এবং ৩। লোকভাষা। তিনি লোকভাষার সংজ্ঞা প্রসঙ্গে বলেছেন— 'লোকভাষা হলো বিচ্ছিন্ন গ্রাম্য মানুষের বৈশিষ্ট্য এবং তা ক্রমেই নিশ্চিহ্ন হয়ে যাচ্ছে।'[১৫] তিনি লোকভাষার বৈশিষ্ট্য হিসাবে বলেছেন ১। গ্রাম্য জীবনে এর ব্যবহার ২। স্থানীয় বৈশিষ্ট্য ও স্বাতন্ত্র্যের চিহ্ন এবং ৩। যার মধ্যে ঐতিহ্যের চিহ্ন বহমান থাকে। তাঁর মতে লোকভাষা হল আঞ্চলিক উপভাষার (regional dialect) প্রকার ভেদ।

অন্যদিকে 'লোকভাষা ও শৈলীবিজ্ঞান' নামক প্রবন্ধে সুভাষচন্দ্র রায়চৌধুরী লিখেছেন—

'একটি ভাষাসম্প্রদায়ের অন্তর্গত গ্রাম্যজীবননির্ভর লোকসমাজের ব্যবহৃত স্থানীয় বৈশিষ্ট্য ও স্বাতন্ত্র্যযুক্ত ভাষাকে লোকভাষারূপে গণ্য করা যায়।'[১৬]

আমরা অরুণ ঘোষের একটি প্রবন্ধে লোকভাষার স্বরূপ ও সংজ্ঞা নির্ণয়ের প্রচেষ্টা দেখি। তিনি সাধারণভাবে ভাষার তিনটি স্তর স্বীকার করেছেন—ভাষা (Language), উপভাষা (Dialect) এবং বিভাষা (Idolec)। তিনি আরোহ্ পদ্ধতির মাধ্যমে সিদ্ধান্ত করেছেন বিভাষার সামান্যীকরণ হ্ল উপভাষা, উপভাষার সামাণ্যীকরণ বৈশিষ্ট্য হ্ল ভাষা। আবার তিনি স্বীকার করেছেন উপভাষার অন্তর্গত ক্ষুদ্রক্ষুদ্র অঞ্চলে প্রচলিত ভাষারীতি ও বৈশিষ্ট্যকে।

এই জায়গাতেই ধরা থাকে বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর নিজস্ব বৈশিষ্ট্য যা অন্যান্য গোষ্ঠী বা বৃহত্তর উপভাষা গোষ্ঠী থেকে তাকে আলাদাভাবে চিহ্নিত করেছে। এই ক্ষুদ্রক্ষুদ্র অঞ্চলের ভাষা বৈশিষ্ট্যের সামান্যীকরণের নাম যদি লোকভাষা দিই, তাহলে হয়তো খুব একটা ভুল হবেনা।'[১৭] তিনিও লোকভাষার অস্তিত্ব গ্রামাঞ্চলে ও শহরাঞ্চলে বিদ্যমান বলে স্বীকার করেছেন।

এযাবৎ আমরা 'লোকভাষা' সম্পর্কে বিভিন্ন পণ্ডিতের সে অভিমত উদ্ধার করলাম তার প্রতি সজাগ দৃষ্টি রাখলে দেখতে পাব তাতে অনেক মতভেদ বা মতানৈক্য আছে।

আমরা লোকভাষার সংজ্ঞা নির্ণয়ের আগে 'লোকভাষা' শব্দটিকে বিশ্লেষণ করে দেখতে পারি। 'লোকভাষা' শব্দে একদিকে আছে 'লোক'/ 'Folk', অন্যদিকে ভাষা, 'Language'। তাই বলতে পারি লোকের ভাষাই হ্ল লোকভাষা। এখন প্রশ্ন হচ্ছে 'লোক' কাকে বলে? 'লোক' বলতে বর্তমানে আর শুধুমাত্র কৃষিকেন্দ্রিক গ্রাম্য কোন জনগোষ্ঠীকে বোঝাতে চাননা আধুনিক লোকসংস্কৃতিবিদরা, তাঁদের মতে 'লোক'/ 'Folk' হ্ল জাতি, ধর্ম, পেশা, বয়স, স্থান বা ভাষাগত যে কোন ধরণের ঐক্য বন্ধনে আবদ্ধ এমন এক জনসমাজ যা আপন ঐতিহ্যের উত্তরাধিকার বহন করে বলেছে। আমরা Random House Dictionary (1987) তে Folk বা লোকরে সংজ্ঞা পাই—

'People as the carriers of culture, esp. as representing the composite of social mores, customs, forms of behavioretic in a society.'

আবার Allan Dundes তাঁর 'Essays in folkloristies (1978)' গ্রন্থে সুন্দর ব্যাখ্যা দিয়েছেন ·

'The term folk can refer to any group of people whatsoever who share at least one common factor. It does not matter what the linking factor is– it could be a common occupation, language or religion- but what is important is that a group forms for whatever reason will have same traditions which it calls its own. তাই লোক বললে কমবেশী সমরূপ জীবনপরিবেশ ও জীবনাচারপুষ্ট যুথবদ্ধ কৌমচেতনা এবং সম-অনুভূতি সম্পন্ন যে কোন জনগোষ্ঠীকে বোঝায়।

আমরা 'লোক', folk এর সর্বজন গ্রহণগোয্য সংজ্ঞা পাই 'Webster's New Colle-

giate Dictionery (8th edition)'তে। সেখানে লোকের সংজ্ঞায় বলা হয়েছে—

'The great proportion at members of a people that determines the group character and that tennds to preserve its characteristic form of civilization and its customs, arts and carfts, legends, traditions, and superstitions from generation to generation.'

এই আলোচনার ভিত্তিতে 'লোকে'র বাংলা সংজ্ঞা নিরূপন করতে পারি এইভাবে, লোক হল এমন এক জন বা জনগোষ্ঠী, যারা ঐতিহ্যের অনুসৃতি স্বরূপ অবৈজ্ঞানিক ধ্যানধারণা দ্বারা নিজেদের সভ্যতা ও সাংস্কৃতিকে পরিচালিত ও নিয়ন্ত্রিত করে এবং যারা বংশানুক্রমিক ভাবে তাদের সভ্যতা ও সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্যকে— প্রথা, রীতিনীতি, সংস্কার- কুসংস্কার, অলৌকিক বা ধর্মীয় বিশ্বাস, ঐতিহ্য, উপকথা বা রূপকথা, কারু ও চারুশিল্প ইত্যাদি বহন করে চলে।

তবে এক্ষেত্রে কয়েকটা বিষয় আমাদের মনে রাখতে হবে— প্রথমত, আমরা 'লোক' বলতে কেবল এক বিশেষ জনগোষ্ঠী বা জনসমাজকেই বোঝায় নি, একককও (Single) বুঝিয়েছি। আমরা সাধারণ বৈশিষ্ঠ্য (common factor) হিসাবে যার মধ্যে ঐতিহ্য লালিত অবৈজ্ঞানিক ধ্যানধারণার প্রকাশ দেখি তাকেই লোক বলেছি। এই অর্থে প্রায় সমস্ত মানুষই লোক— নাগরিক শিক্ষিত, বা উন্নত সভ্যতা ও সাংস্কৃতির অথবা গ্রাম্য যেমনই হোক না কেন। তবে লোক (folk) শব্দের অর্থ পরিবর্তনশীল (dynamic)। নাগরিক, শিক্ষিত বা উন্নত সভ্যতা ও সাংস্কৃতিক মনোভাবাপন্ন মানুষের জীবনে যখন প্রথা, রীতিনীতি, সংস্কার কুসংস্কারের, অলৌকিক বা ধর্মীয় বিশ্বাসের বা ঐতিহ্যের অনুসৃতি দেখি তখন তারা 'লোক' (folk) বলে বিবেচিত হয়।

দ্বিতীয়ত, আমরা লোক সমাজকে নির্দিষ্ট কোন ভৌগোলিক বা আঞ্চলিক সীমায় বদ্ধ করতে চাই না। কেননা আধুনিক শিক্ষা সংস্কৃতির বিকাশ ও বিস্তারের ফলে লোক সমাজের ভৌগোলিক স্থায়িত্ব হারিয়ে যাচ্ছে। এই কারণেই লোকের অস্তিত্ব কেবল গ্রাম্য অঞ্চলেই প্রত্যক্ষ হয়না, শহরাঞ্চলেও বিদ্যামান। তবে একথাও স্বীকার করতেই হবে লোক সমাজ একটি নির্দিষ্ট অঞ্চলে গোষ্ঠীবদ্ধ হয়ে বাস করছে।

তৃতীয়ত, আমরা অবৈজ্ঞানিক ধ্যানধারণা বলতে বোঝাতে চেয়েছি যে সমস্ত লৌকিক ধারণা লোক সমাজের মনগড়া, অলৌকিক বিশ্বাস বা ধর্মীয় ব্যাখ্যা থেকে বা সামাজিক সংস্কার বা কুসংস্কার থেকে সৃষ্টি হয়ে বংশানুক্রমে বাহিত হয়ে এসেছে তাকে। অর্থাৎ যাকে বৈজ্ঞানিক যুক্তি দ্বারা বিশ্লেষণ করা হয়নি বা যায় না। যেমন ঘরে চাল না থাকলে কখনো বলতে নেই যে 'চাল নেই' বললে লক্ষ্মীদেবী অপ্রসন্ন হন, বলতে হয় 'চাল বাড়ন্ত', এই যে বিশ্বাস, এর পিছনে কোন বৈজ্ঞানিক ভিত্তি নেই, আছে লৌকিক বিশ্বাস। এই ধারণা যাদের মধ্যে দেখা যায় তারাই লোক।

তাই লোকভাষার সংজ্ঞায় বলতে পারি লোক জীবন, সমাজ ও সংস্কৃতি মথিত ভাষাই হল লোকভাষা। কোন ভাষাকে লোক ভাষা হতে হলে তা অবশ্যই লোকসংস্কৃতির বৈশিষ্ট্য-বিধৃত হতে হবে। লৌকিক বৈশিষ্ট্য সংপৃক্ত না হলে তাকে আমরা লোক ভাষা বলতে পারি না— তা হয় উপভাষা নতুবা ভাষা, অথবা বিভাষা। যেমন 'নাল' (< কাল), 'লতা' (< সাপ), 'মেকুর' (বিড়াল), 'কাচুয়া' (< কন্যা), ছুয়া (< শিশু), 'কান্টা' (< ঘরের পিছনে), 'নেকার' (<

পায়খানা/মল)ইত্যাদি এই সমুদয় ভাষা হল লোক ভাষা। কেননা এদের মর্মমূলে আছে লৌকিক ঐতিহ্যলালিত সংস্কৃতি। আমরা 'নাল' শব্দের মূলে কাল (আগামীকাল, গতকাল) শব্দের অস্তিত্ব দেখি। এখানে লৌকিক বিশ্বাস বা কুসংস্কার বসত কাল শব্দের পরিবর্তে 'নাল' শব্দের ব্যবহার হয়েছে। এখানে লৌকিক বিশ্বাস হিসাবে কাজ করেছে— বিবাহিতা নারী তাঁর স্বামীর বাড়ির গুরুজনের নাম করতে পারে না, তার নামের আদ্য অক্ষর পাল্টে বা অন্য পরিবর্তিত শব্দ প্রয়োগ করে তাকে প্রকাশ করবে— এই ধারণা। তাই 'নাল' এর লৌকিক অর্থ হল কাল। একইভাবে 'সাপ' শব্দের লৌকিক রূপ হয়েছে— লতা, পুকা/পোকা, 'ভূত' হয়েছে ইনাঁরা/ তিনাঁরা/ঠাকুর। আবার এমন শব্দ দেখি যেগুলো লোক সমাজ নিজে সৃষ্টি করে নিয়েছে অথবা মূল শব্দকে পরিবর্তিত-রূপান্তিরিত করে নবরূপদান করেছে, তারাও লোকভাষা বলে বিবেচিত হবে। যেমন— 'মেকুর' (বিড়াল), 'কাচুয়া' (কন্যা), 'কান্টা (ঘরের পিছন), 'নেকার' (মল) ইত্যাদি। 'মেকুর' শব্দ গঠনের পিছনে 'মাকুর' শব্দের ভূমিকা আছে কিনা তা 'রাসায়নিক' বিশ্লেষণ সাপেক্ষ, কিন্তু একথা ঠিক যে লোকসমাজ বিড়ালের ডাকের অনুকরণ করে মার্জারের নাম দিয়েছে 'মেকুর'। ঠিক এমনি ভাবেই লোকসমাজে সৃষ্টি হয়েছে হাম্বা (গরু), ম্যাঁ ম্যাঁ (গাছল)। তবে 'মুই'/'হামি', 'হামার'/'হামসার', 'ওয়া'/'ওহ', 'ওসা'/'উমমা', 'ওয়াক'/'ওসাক'; নদী > লদী, লাল > নাল, নীল > লীল, কাব্য > কাইব্ব, /কাব্ব, লোক > লুক, দোষ > দুষ, ভাত > বাত, শাক > হাগ, আম > রাম, রস > অস, পতাকা > ফত্‌কা ইত্যাদি উদাহরণের কোনটাই কিন্তু লোকভাষার অন্তর্গত নয়, প্রতিটিই কোননা-কোন উপভাষার বৈশিষ্ট্য। এর সাথে ঐতিহ্যগত লোক সংস্কৃতির কোন যোগ নেই, আছে কেবল, আঞ্চলিক উচ্চারণগত পার্থক্য। যেমন- শব্দের আদি স্বরবর্ণের আগে 'র' - এর আগম (আম > রাম) বরেন্দ্রী উপভাষার বৈশিষ্ট্য, আবার ঐ ভাষার দেখি শব্দের আদি 'র'-এর লোপ (রস > অস), অথবা শব্দের আদিই 'স' ও 'শ' স্থানে 'হ' উচ্চারিত হয় বঙ্গালী উপভাষায় (শাক > হাগ)। শব্দের প্রথমে বসা 'ল' 'ন'-তে পরিণত হয় রাঢ়ী উপভাষায় (লাল > নাল)। আবার আদি 'ন' 'ল' তে পরিণত হয় (লাল > নাল)।

লোকভাষা লোকসমাজের গণ্ডী অতিক্রম করে উপভাষায় অবাধ বিচরণ করলেও শিষ্ট ভাষায় তার স্থান খুবই সংকীর্ণ।

প্রচলিত একটি ধারণা হল লোকসাহিত্যের ভাষাই লোকভাষা। কিন্তু এই ধারণাটি সম্পূর্ণ ভ্রান্ত; এই ধারণাটি গড়ে উঠেছে ভাষা সম্পর্কে আমাদের সম্যক জ্ঞানের অভাবের জন্য। তাছাড়া এই ধারনার মূলে আছে ভ্রান্ত সাদৃশ্যবাদ। এই সাদৃশাবাদের ভিত্তিতে আমরা সমাজে প্রচলিত ও শিষ্ট সাহিত্যে ব্যবহৃত ভাষাকে যেমন শিষ্ট ভাষা বলি, তেমনি লোকসমাজে ও লোকসাহিত্যে প্রচলিত ভাষাকে বলি লোকভাষা। অর্থাৎ এই প্রচলিত ধারণায় লোকসাহিত্যে ব্যবহৃত সমস্ত ভাষাই লোক ভাষা। ফলে প্রচলিত মতানুসারে নিম্নোক্ত ছড়ার ভাষাকেও লোকভাষা বলতে হয়। কেননা এই ছড়াগুলিতো 'লোকসাহিত্য'।

১। ঘুম পাড়ানী মাসী পিসি ঘুম দিয়ে যেও
বাটা ভরে পানদেব গাল ভরে খেও।
ঘুম আয়রে ঘুম আয়রে ঘুমে লতা পাতা
দু দুয়োরে ঘুম যায় দুটী মোগল পাতা।

হেঁসেল ঘরে ঘুম যায়রে, ভ্রমরা ভ্রমরী
মায়ের কোলে ঘুম যায় দুদের কুমারী।।

২। সোনার বাটি ঝুমুর ঝুমুর, মিষ্টি বাটির তৈল
তাই লইয়া সূর্য ঠাকুর নাইতে গেলেন কৈ?
বাটি বাটি কুমার আটি, সকল পুড়িয়া গেল
লক্ষ টাকার বাঁটি আমার হারাইয়া গেল।
গেছে গেছে ইহ বাটি আপদ বালাই লইয়া
আরেক বাটি গড়াস নে চাক্কা সোনা দিয়া।

৩। তাই তাই তাই
মামার বাড়ীত্ যাই।
মামার বাড়ী বড় ভালা
কিল চুড়া নাই।

এখন প্রশ্ন, এই ছড়ার ভাষাকে যদি আমরা লোকভাষা বলি তবে নিম্মোক্ত শিষ্ট সাহিত্যের ভাষাকে কোন নামে অভিহিত করব; কেননা উভয়ের ভাষই তো এক, গঠন ভঙ্গিও তো অভিন্ন?

'এক যে আছে মজার দেশ,
সব রকমের ভালো,
রাত্তিতে বেজায় রোদ,
দিনে চাঁদের আলো।
আকাশ সেথা সবুজ বরন,
গাছের পাতা নীল,
ডাঙায় চরে কই কাতলা
জলের মাঝে চিল।, (যোগীন্দ্রনাথ সরকার)

কিন্তু আমরা কখনই যোগীন্দ্রনাথ সরকারের এই ছড়াটিকে লোকসাহিত্য বলব না, যদিও উভয় ছড়ার ভাষাই এক ও অভিন্ন। তাই আমরা বলতে পারি লোকসাহিত্যের ভাষামাত্রেই লোকভাষা নয়। তাই বলা যেতে পারে যে, লোকভাষা হল ঃ লোকজীবন, সমাজ ও সংস্কৃতি মথিত ভাষা এবং কোন ভাষাকে লোকভাষা হতে গেলে অবশ্য তা লোকসংস্কৃতির বৈশিষ্ট্যে বিধৃত হতে হবে।

প্রাচীনকাল থেকেই ভাষা (Language) বিশ্লেষণ হয়ে আসছে, নানা দৃষ্টিভঙ্গিতে। প্রাচীন কালে ভাষা বিশ্লেষিত হত মূলত ব্যাকরণ (Grammar) ভিত্তিক এবং তা ছিল মূলত নির্দেশমূলক ব্যাকরণ (Normative Grammar), যার শ্রেষ্ঠ দৃষ্টান্ত পাণিনির 'অষ্টাধ্যায়ী' ব্যাকরণ। তবে পাণিনিই প্রথম ভাষাকে বর্ণনামূলক ভাষাবিজ্ঞানের (Descriptive Linguistics) দৃষ্টি ভঙ্গিতে বিশ্লেষণ করেন। কালক্রমে এই Normative Grammar এর মাধ্যমেই জন্ম লাভ করল ভাষাবিশ্লেষণের এক নতুন পদ্ধতি (Method), যা বাঙ্‌মীমাংসা বা সাংস্কৃতিক ভাষাতত্ত্ব (Philology) নামে পরিচিত। অবশেষে আধুনিককালে ভাষাকে বৈজ্ঞানিক নীতি পদ্ধতির আলোকে

বিশ্লেষণের ফলে সৃষ্টি হল Linguistics বা ভাষাবিজ্ঞান। আধুনিককালের ভাষাবিজ্ঞানের (Linguistics) সাথে বাঙ্‌মীমাংসার (Philology) প্রভেদ মূলত উদ্দেশ্য, বিষয়ের গুরুত্ব এবং দৃষ্টি ভঙ্গির (attitude, emphasis and purpose)। 'The Philologist is concerned primarily with the historical development of languages as it is manifest in written texts and in the context of the associated literature and culture. The Linguist, though he may be interested in written texts and in the development of languages through time, tends to give priority to spoken languages, and to the problem of analyzing them as they operate at a given point in time without reference to their prevous history. The Lingust, in principle, is interested in all Languages and not merely in the great literary languages of the world.'[১৮]

আধুনিককালে জ্ঞানবিজ্ঞান ও প্রযুক্তির অভূতপূর্ব উন্নতির সাথে সাথে আমাদের দৃষ্টিভঙ্গি ও মানসিকতার বিস্তার ঘটেছে। ফলে নানান দৃষ্টিকোণ থেকে সমস্ত বিষয়ের মতো ভাষাকেও বিশ্লেষণ করা হয়েছে এবং গড়ে উঠেছে পরস্পর বিরোধী দৃষ্টিভঙ্গি। এখন ভাষাবিজ্ঞান চর্চার ক্ষেত্রে পরস্পর বিরোধী তিনটি পদ্ধতি প্রচলিত। এগুলি হল : ১। synchronic এবং Diachronic, ২। Theoretical এবং Applied, ৩। Microlinguistics এবং Macrolinguisties। সংক্ষেপে এদের দৃষ্টিভঙ্গির পার্থক্যটি তুলে ধরা যাক :

'A synchronic description of a language describes the language as it is at a given point in time; a diachronic description is concerned with the historical development of the language and the structural changes that have taken place in it between successive points in time. The goal of theoretical linguistics is the construction of a general theory of the structure of language or of a general theoretical framework for the description of languages (there is some controversy as to the difference between these two conceptions of the subject); the aim of applied linguistics is the application of the findings and techniques of the scientific study of language to a varity of practical tasks, especially to the elaboration of improved methods of language teaching. The terms microlinguistics and macrolinguistics are not yet well establised, and they are, in fact, used here purely for convenience. The former refers to narrower and the latter to much broader view of the scope of linguistics. According to the microlinguistics view, languages should be analyzed for their own sake and without reference to their social function, to the manner in which they are acquired by children, to the psychological mechanisms that underline the production and reception of speech, to the literary and aesthetic or communicative function of language, and so on. In contrast, macrolinguistics embraces all of these aspects of language. A number of areas within macrolinguistics have been given terminological recognition; psycholinguistics, sociolinguistics, anthropological linguistics, dialectology, mathematical and computational linguistics, and stylistics. Macrolinguistics should not be indentified with applied

linguistics. The application of linguistic methods and concepts to language teaching may well involve other disciplines in a way that microlinguistics does not. But there is, in principie, a theoretical aspect to every part of macrolinguistics, no less than to microlinguistics.'[১৯]

বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে ব্যাকরণের (Grammar) নবজন্ম ঘটে নোয়ম চমস্কির (Noam Chomsky) হাতে। তিনি গাণিতিক ভাষাবিজ্ঞানের (Mathemmtical Linguistics) আলোকে ব্যাকরণের নবজন্ম ঘটান। তিনি ব্যাকরণের বিশ্লেষণের পদ্ধতির উপর নির্ভর করে বাক্যের গঠন, বাক্যসৃজন পদ্ধতি এবং বাক্যের অর্থবোধের অসামঞ্জস্যতাকে ব্যাখ্যা করেন তাঁর রূপান্তর-সৃজনমূলক ব্যাকরণ তত্ত্বের (Transformational Generative Grammar Theory) মাধ্যমে।

আমরা উপরের বিভিন্ন ভাষাবিজ্ঞান ও তার পদ্ধতির (Principles) আলোকে যেকোন ভাষাকে বিশ্লেষণ করতে পারি। কিন্তু সেক্ষেত্রে আলোচনা জটিল হয়ে উঠবে। তাই আমরা অধুনা ব্যাপক প্রচলিত Synchronic or Descriptive Linguistics এবং Transformational Generative Grammar-এর আলোকে কবি লালনের কাব্যভাষাকে বিশ্লেষণ করব।

এবারে আমরা লালনগীতির ভাষাতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য (Linguistic Features) আলোচনা করছি। এ প্রসঙ্গে স্মরণীয়, আমরা প্রচলিত লালনগীতির ভাষার নানা পরিবর্তন ও পরিমার্জনের ফলে গঠিত নতুন রূপকে বিশ্লেষণ করব না। ড. শক্তিনাথ ঝা 'ফকির লালন সাঁই: দেশ কাল এবং শিল্প' নামক গবেষণা গ্রন্থে 'গানের খাতায়' যে গানগুলিকে উল্লেখ করেছেন, তাকে প্রামাণ্য ধরেই ভাষার বিশ্লেষণে অগ্রসর হচ্ছি। আমরা লালনগীতির ভাষাকে ধ্বনিতাত্ত্বিক, রূপতাত্ত্বিক এবং বাক্যতত্ত্বের বিশ্লেষণ রীতিতে তুলনা করে দেখবো।

প্রথমে লালনগীতির ধ্বনিতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্যগুলির প্রতি দৃষ্টিপাত করা যাক। ধ্বনিতাত্ত্বিক বিশ্লেষণে ধ্বনির স্বরূপ, বৈচিত্র্য, রূপ ও রূপান্তরকে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গিতে বিশ্লেষণ করা হয়। এই ধ্বনিতাত্ত্বিক বিশ্লেষণের ক্ষুদ্রতম একক হল স্বনিম (Phoneme) এবং বৃহত্তর একক হল শব্দ (Word)। এককালিক বা বর্ণনামূলক (Synchronic or Descriptive) ভাষাবিজ্ঞানে বিশ্লেষণ পদ্ধতিকে প্রয়োগ করে লালন কবির কাব্যভাষাকে বিচার করতে পারি।

লালনের 'গানের খাতা' অনুপুঙ্খ বিশ্লেষণ করলে ধ্বনি পরিবর্তনের বিচিত্র ও কুটিল পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়। এই পরিবর্তন যেমন স্বরধ্বনির ক্ষেত্রে তেমনি সরল ও যুক্ত ব্যঞ্জনধ্বনির ক্ষেত্রেও পরিলক্ষিত হয়। 'গানের খাতা'য় দেখি 'অ', 'আ'–তে পরিণত হয়েছে। উদাহরণ হিসাবে বলা যায়—ভূশান (ভূষণ), উপার (উপর), মাহাজনের (মহাজনের)।

'অ' কখনো কখনো 'ও'–তে পরিণত হয়েছে। এটা বাঙালীর স্বভাবগত স্বাভাবিক উচ্চারণ। যেমন—কোমল, বোন, জখোন, সোনে, ধোনো, ভোলো, শান্তো, তোরো। আবার 'অ', 'ই', 'ঈ' দুই হয়েছে। এক্ষেত্রে উদ্ধারযোগ্য—আলিস্য (আলস্য), অপমানী (অপমান), করণী

(করণ)। 'অ' যে আবার কখনো 'উ' বা 'এ' হতে পারে তারও দৃষ্টান্ত লালনগীতিকায় আছে— দুগদু (দুগ্ধ), ক্ষেমতা (ক্ষমতা), ক্ষেণেক (ক্ষণেক)।

'আ' স্বরধ্বনিটি লালনগীতিকায় নানারূপ ধারণ করেছে। 'আ' কখনো হয়েছে 'অ', 'ই', 'এ' কখনো বা 'য়'- শ্রুতিজাত 'য়া'। এক্ষেত্রে উদ্ধার করতে পারি অভরণ (আভরণ), পলাব (পালাব), ফনি (ফণা), শেরতে (শড়িতে), কিয়ার (কি আর)।

হ্রস্ব -'ই' কী বিচিত্র রূপ ধারণ করতে পারে তার পরিচয় মেলে লালনগীতিকায়। 'ই' হয়েছে যেমন 'অ', 'এ', 'উ', 'ও', তেমনি 'য়', 'ঔ'- ও। তাই দেখি 'দেরি' হয়েছে 'দের', 'আইন' হয়েছে 'আএন', 'বিহার' রূপ পেয়েছে 'বেহার','দ্বিতীয়ার' হয়েছে 'দুতিয়ার', 'দোহাই' পরিণত হয়েছে 'দোহায়' -এ, 'কই' স্থিতিলাভ করেছে 'কৌ'-এ।

দীর্ঘ 'ঈ'-এর রূপান্তর কদাচিৎ দেখা যায়। 'ঈ' পরিণত হয়েছে 'অ'-তে। যেমন, পক্ষী > পক্ষ।

লালনের 'গানের খাতা'য় হ্রস্ব 'উ'- কারের পরিবর্তন ঘটেছে 'অ', 'আ', 'ও'-তে। দৃষ্টান্ত হিসাবে বলা যায় ভাবক (ভাবুক), মখের (মুখের), নিরাপন (নিরূপণ) বা বোজাবে (বুঝাবে)।

'এ' লালনগীতিকায় কখনো 'অ', 'আ' কখনো বা 'ই' রূপে দেখি। যেমন তেন্নী > তন্নী, সাপের > সাপার, যেমন > জমন, আরেকটা > আরাকটা, কেবল > কিবল ইত্যাদি।

'ও' লালনগীতিতে হয়েছে 'অ', 'উ', 'ঔ', 'য়'। যেমন গপীর < গোপীর, দুষী < দোষী, চৌর < চোর, তারায় < তারাও।

'ঋ' ধ্বনিটির পরিবর্তন ঘটেছে বিচিত্র রকমের। 'ঋ' কখনো 'রি', 'র-ফলা' কখনো বা 'ই' রূপে স্থিত হয়েছে। এ প্রসঙ্গে উল্লেখ যোগ্য—রিশী (ঋষি), রিদয় (হৃদয়), ব্রক্ষ (বৃক্ষ), বিন্দাবনে (বৃন্দাবনে)।

যৌগিক স্বরধ্বনি দু'টি বাউল সঙ্গীতে ধ্বনিতাত্ত্বিক বৈচিত্র্য এনেছে। 'ঐ' হয়েছে 'ঔ', 'আই', 'আয়'— অকোতব (অকৌতব), আথাই (অথৈ), অথায় (অথৈ)।

ঔ > 'ঐ', 'ও', 'ওউ' —জৈবন (যৌবন), সওদামীনী (সৌদামিনী), গোউর (গৌর) ইত্যাদি।

লালনগীতিকায় ব্যঞ্জনধ্বনির নানারূপ পরিবর্তন ঘটেছে। আমরা ব্যঞ্জনধ্বনি বিচিত্রতর রূপান্তরের প্রতি চোখ ফেরালে দেখতে পাব এখানে 'ক' হয়েছে 'খ', কখনো বা 'গ'। যেমন— জোখের > জোকের, দিগে > দিকে।

'খ' ব্যঞ্জন ধ্বনির মহাপ্রাণতা লোপ পেয়েছে। যেমন— দেখ > দেক, মুখ > মুক, নিরিখ > নিরিক ইত্যাদি।

মহাপ্রাণ ঘৃষ্টধ্বনি 'ছ' রূপান্তরিত হয়েছে অল্পপ্রাণ 'চ'—তে। যেমন- করছে > করচে।

লালনগীতিকায় 'জ' হয়েছে 'চ'। যেমন 'বীজ' রূপান্তরিত হয়েছে 'বিচ'-এ।

'ঝ' এই মহাপ্রাণ বর্ণটির মহাপ্রাণতাও খসে গেছে লালনগীতিতে। ফলে 'বোঝ' হয়েছে 'বুঝি', 'বোঝাবে' হয়েছে 'বোজাবে', 'মাঝার' পরিণত হয়েছে 'মাজার'-এ।

'ঠ' হয়েছে লালনের বাউল সঙ্গীতে 'ট'। তাই 'কোঠা' থেকে 'কোটা', 'কাঠ' থেকে 'কাট' 'উঠিল' থেকে 'উটিল' হয়েছে।

'থ' লালনগীতিতে কখনো 'দ', কখনো বা 'ত' হতে দেখি। যেমন—সুপথ > সুপদ, পথ > পত, কথায় > কতায়, প্রথম > প্রতম।

'দ' রূপান্তর ঘটেছে কখনো 'ড', কখনো 'ধ'-তে। যেমন—দণ্ডে > ডণ্ডে, সাধি > সাদী, ক্ষুধা > খুদা, দংশায় > ডংশায়, সুধা > সুদা, আধার > আদার।

'প' কোন সময় 'ব' আবার কোন সময় 'ফ' হয়েছে। যেমন—দীপ > দিব, প্রতিপদে > প্রতিবাদে, খারাপ > খারাফ।

লালন কাব্যভাষায় 'ম' হামেসায় 'ব' হয়ে উঠেছে। যেমন—নাবাই < নামাই, নেবে < নেমে, বর্ত্তমান < বর্তমান।

'ফ' ব্যঞ্জনধ্বনিটির রূপান্তর ঘটেছে 'প' ও 'ব'-তে। লাফ > নাব, ফসল > সাপল।

'ভ' হয়েছে 'ব'। যেমন শোভা > শোবা, লোভ > লোব, স্বভাব > সবাব।

'ড়' ব্যঞ্জনধ্বনিটি 'র' ধ্বনিতে পরিণত হয়েছে। যেমন—পড়শী > পরশী।

সংযুক্ত ব্যঞ্জনধ্বনির পরিবর্তন ঘটেছে নানাভাবে। লালনের কাব্যে দেখি- ক্ষ > ক্‌খ, খ- বিছাখন < বিচক্ষণ। 'দ্ব', এই 'ব'-ফলা যুক্ত ব্যঞ্জনটি 'ব'-ফলা লুপ্ত হয়ে 'দ'-এ পরিণত হয়েছে। যেমন—'দ্বিধা' হয়েছে 'দিদা'।

একইভাবে সমস্ত 'ব'-ফলা যুক্ত সংযুক্ত ব্যঞ্জনধ্বনি থেকে 'ব' ফলা লোপ পেয়েছে। যেমন—'জ্জ্ব' হয়েছে 'জ্জ'। উদাহরণ উজ্জ্বলময় > উজ্জলাময়। 'ত্ত্ব' > ত্ত — তত্ত্ব > তত্ত। স্ব > স — স্বর্গ > সর্গ।

লালনগীতিতে যুক্তব্যঞ্জন 'দ্ধ,' 'দ্দ'-এ পরিণত হয়েছে। যেমন—সিদ্ধি > সিদ্দি, তিলার্দ্ধ > তিলর্দ্দ, সুদ্ধ > সুদ্দ।

'য'-ফলা যুক্ত ব্যঞ্জনধ্বনি পূর্ববর্তী ধ্বনির উচ্চারণ স্বরূপ অনুসারে নিজের উচ্চারণকে পরিবর্তিত করে তার উচ্চারণ বৈশিষ্ট্যকে গ্রহণ করেছে। ফলে 'দ্য' হয়েছে 'দ্দ'— সদ্য > সদ্দ।

'ধ্য' হয়েছে 'দ্দ' — সাধ্য > সাদ্দ। 'ত্য' রূপান্তরিত হয়েছে 'ত্ত'-এ— সত্য > সত্ত।

'জ্য' পরিণত হয়েছে 'জ্জ'-এ — রাজ্জে < রাজ্যে।

'গ্য' উচ্চারণ পাল্টে হয়েছে 'গ্গ', 'জ্ঞ'। যেমন—যোগ্য > যোগ্গ, আরোগ্য > আরাজ্ঞ, সৌভাগ্য > সৌভাজ্ঞ।

লালনগীতির ভাষা পরিবর্তনের এই প্রবণতাটি বর্তমান মান্য-বাংলার স্বীকৃত ধ্বনিতাত্ত্বিক পরিবর্তন। তবে লালনগীতির সাথে তার পার্থক্য হল—কবি লালন ধ্বনির উচ্চারণ অনুযায়ী বর্ণকে ব্যবহার করেছেন, আর আমরা শবদেহের মতো বর্ণকে বহন করে চলেছি। রবীন্দ্রনাথ যে চলিত বাংলা এবং তার উচ্চারণকে সাহিত্যের রাজদরবারে স্থান দিতে চেয়েছিলেন তাকে আমরা আধুনিক শিক্ষিত গণ্যমান্য হওয়া সত্ত্বেও সাহিত্যে স্থান দিতে সাহস করিনি— লোককবি হয়ে লালন সেই কাজটি করেছেন। তাই আমরা তাঁকে আধুনিক চলিত বাংলা ভাষার যথার্থ রূপকার বলতে পারি।

লালনগীতে 'ত্রে' ধ্বনি পরিবর্তিত হয়েছে 'তৃে' -তে। যেমন—ত্রেতা > তৃেতা।

ঋ-কার যুক্ত ব্যঞ্জন ধ্বনির ঋ-কার পরিবর্তিত হয়েছে কখনো -'ই'- কারে, কখনো বা র-ফলাতে। যেমন— মৃ > ম্রে — অমৃতা > অম্রেতো। কৃ > কি — প্রকৃতি > প্রকিতি। সৃ > ছি — সৃষ্টি > ছিসটি। বৃ > ব্র — বৃক্ষ > ব্রক্ষ।

লালনগীতিকায় 'প্র'- রূপান্তরিক হয়েছে 'পে'-তে। তাই 'প্রত্যয় + করিবি' > লালন গীতিকার নাম ধাতুজ ক্রিয়াতে পরিণত হয়েছে 'পেত্যাবি' রূপে।

লালনের কাব্যভাষায় হয়তো আরও কিছু কিছু স্বরধ্বনি ও ব্যঞ্জনধ্বনির রূপান্তর ঘটেছে। কিন্তু তা অতিসামান্য এবং তা কেবল কয়েকটা ক্ষেত্রে পরিলক্ষিত হয় বলে তা এখানে উল্লেখ করা হল না।

আমরা লালনগীতিতে দেখি আদর্শ চলিত বাংলা ধ্বনির উচ্চারণ রূপকে। ফলে বাংলায় যে-সমস্ত ধ্বনির উচ্চারণ নেই তাদের প্রয়োগ লালনগীতিকায় দেখা যায় না। তাই আমরা দেখি লালনের গানে ই - ঈ, এবং উ, ঊ-এর বানানের কোন প্রভেদ নেই। আর উ-কারের প্রয়োগই তাঁর কাব্যে অতিমাত্রায়। আবার লালনেব কাব্যে 'শ', স ও 'ষ' -এর পার্থক্য প্রায় লুপ্ত হয়ে গেছে। 'ন' ও 'ণ' ধ্বনির ক্ষেত্রে লালন কবির একই প্রবণতা দেখা যায়। তিনি উভয় বর্ণের সীমারেখা মুছে দিয়েছেন। আর 'য' বর্ণের একবারমাত্র প্রয়োগ দেখি সমগ্র লালনগীতিতে, সর্বত্র 'জ'-এর আধিপত্য স্থাপিত হয়েছে।

প্রচলিত ধ্বনি পবিবর্তনের বিভিন্নরীতির আলোকে লালনের কাব্যভাষাকে বিশ্লেষণ করতে গেলে দেখব, আধুনিক ধ্বনি পরিবর্তনের সমস্ত প্রকার প্রক্রিয়াই লালনগীতিকায় উপস্থিত।

লালনগীতিতে বর্ণলোপের বা ধ্বনিলোপের দৃষ্টান্ত অতিমাত্রায় পরিলক্ষিত হয়। এই বর্ণলোপের মূলে একদিকে যেমন আছে শ্বাসাঘাত প্রক্রিয়া ও দ্রুত উচ্চারণভঙ্গি, তেমনি ছন্দ-মিলের জন্য অক্ষর হ্রাস ও আঞ্চলিক উচ্চারণ বৈশিষ্ট্য। লালনগীতিতে একদিকে আছে স্বরবর্ণলোপের দৃষ্টান্ত, অন্যদিকে ব্যঞ্জনলোপের উদাহরণ। প্রথমে স্বরধ্বনিলোপের স্বরূপকে

দেখতে পারি। এখানে আদিস্বরলোপ (Aphesis/Apaeresis), মধ্যস্বরলোপ (syncope) অন্ত্যস্বরলোপ (Apocope) এবং দ্বিমাত্রিকতা বা দ্ব্যক্ষরতা (Bimorism/Bisyllabism) লোপের দৃষ্টান্ত, সবই দেখা যায়। যেমন— মোর > মর, মানুষ > মনুস, জানতে > জেন্তে, দেশান্তরী > দেসন্তরী, অসময়ের > অশোমার, দেরী কি > দের্‌কি, জায়গায় > জাগায়, দেখিতে > দেখ্‌তে, ভাড়ুয়া > ভেড়ো, পক্ষী > পক্ষ ইত্যাদি।

লালনের কাব্যভাষায় ব্যঞ্জনধ্বনি লোপের প্রবণতা অনেক বেশি। স্বরধ্বনি যেমন শব্দের আদি, মধ্য ও অন্ত্য যেকোন স্থান থেকেই লোপ পেতে পারে, ব্যঞ্জনধ্বনিও তেমন লোপ পায়। এখানে আদি, মধ্য ও অন্ত্য অবস্থান থেকে ব্যঞ্জনলোপের নিদর্শন প্রায় সমান।

আদি ব্যঞ্জনধ্বনি লোপের দৃষ্টান্ত হল—হৃদয় > রিদয়, স্কন্ধ > কন্দ ইত্যাদি।

মধ্যব্যঞ্জনধ্বনি লোপের দৃষ্টান্ত হিসাবে উল্লেখ করতে পারি— কুস্বভাব > কুসাভাব, একমন > এমন, কবুলতি > কবুতি, জীব > জিও , মরলি > মলি, কাজিয়াল > কাজিল, মাকড়সার > মাকড়ার, অপারগের > অপারের, অনায়াসে > অনাসে, পড়লে > পলে, অন্তিমকালে > অন্তিকালে।

অন্যদিকে অন্ত্য ব্যঞ্জন লোপ ঘটেছে নিম্নোক্ত দৃষ্টান্তে—নদে > নয়ে, আনল > আন, নিষ্কলঙ্ক > নিষ্কল, যোগী > জোই, সন্দেহ > সন্দ, রাহু > রু ইত্যাদি।

লালনগীতিকায় বর্ণাগমের দৃষ্টান্তও প্রচুর মেলে। এখানে যেমন স্বরধ্বনির আগম ঘটেছে, তেমনি ব্যঞ্জনধ্বনিও এসেছে। এখানে স্বরধ্বনি আগমনের দৃষ্টান্ত হিসাবে উদ্ধার করতে পারি— পাপ > পাপো, ডিম্ব > ডিম্বু, জন > জোন, অপযশটি > আপোজসটী, বৎসর > বতসর, স্কুলে > ইসকুলে, লম্পট > লমপটো, বর্জখ > বরজোগ, মর্ম > মরমো, নয়ন > নয়ান। আর ব্যঞ্জনাগমের তালিকায় পড়ে—দুইরূপ < দুইরূপ, সতন্তে < সততে, শুক্‌কল < শুক্ল, ওনুস্বারে < অনুসারে, মন্ত্রী > মন্ত্রী, বর্জখ > বরজোগ।

সমীভবন (Assimilation) প্রক্রিয়াটি বাংলা ভাষার উচ্চারণ পদ্ধতির বিশেষ বৈশিষ্ট্য। লালনকাব্য ভাষায় এই প্রক্রিয়ার দৃষ্টান্ত প্রচুর। এখানে যেমন আছে প্রগত সমীভবন (Progressive Assimilation), পরাগত সমীভবন (Regressive Assimilation), অন্যোন্য সমীভবন (Mutual/ Reciprocal Assimilation), তেমনি এক নতুন ধরনের সমীভবন দেখা যায়, যা কিনা বর্গীয়বর্ণের অবস্থান ভিত্তিক। যেমন দ্বিধা > দিদা, অন্য > ওর্ম্ন, সিদ্ধি > সিদ্দি, নিত্য > নিত্ত, কার্য > কায্য, করলি > কল্লী, সাধ্য > সাদ্দ, শুদ্ধ > সুদ্দ, দণ্ডী > ডণ্ডী দুগ্ধ > দুগদ্‌, পদ্ম > পর্দ্দ, শুদ্ধ > সুদ্দ, দুর্লভ > দুল্লভ, যোগ্য > জোগ্গ,সত্য > সত্ত, মারিলি > মাল্লি, পূর্ণিমাতে > পুন্নিমাতে, চারটি > চাড্ডি, তুল্য > তূল্লা, স্বর্ণ > সন্ন, সৃষ্টি > ছিষ্টী, কর্ণিকা > কন্নিকা, মধ্যে > মদ্দী, আদ্য > আর্দ্দ, আত্মা > আর্ত্তা, সৃষ্ট > ছিস্ট।

সমীভবনের বিপরীত প্রক্রিয়া হল বিসমীভবন (Dissimilation)। লালনগীতিতে এই প্রক্রিয়ার

দৃষ্টান্ত কম হলেও দৃষ্ট হয়। যেমন : কোকতাড়া > ফোকতাড়া, লাল > নাল, লাঙ্গল > নাঙ্গল, ননীতে > লনিতে, স্নালন > নালন।

ছন্দের খাতিরে, সুর ও লয়ের জন্য সংযুক্ত ব্যঞ্জন ধ্বনিকে বিভক্ত করে শব্দে অতিরিক্ত স্বরধ্বনি আনায়ন করার প্রবণতা প্রচুর পরিমাণে দেখা যায় লালনসঙ্গীতে। ফলে তাঁর কাব্যে স্বরভক্তি বা বিপ্রকর্ষের (Anaptyxis) প্রাধান্য দেখা যায়। যেমন —শুক্র > শুক্কল, যন্ত্রী > জনতরি, জন্ম > জনম, মিশ্র > মিছির, বিক্রমে > বিকরমে, দর্শন > দরসন, রত্ন > রতন, মর্ম > মরমো।

চলিতবাংলা ভাষার মৌখিক রীতিতে অভিশ্রুতির (Umlaut) ব্যবহার বেশি। এই প্রক্রিয়া মূলত ক্রিয়ার ক্ষেত্রে অধিকমাত্রায় কার্যকর। লালন মুখের ভাষায় কাব্যসঙ্গীত রচনা করেছেন বলে তাঁর ভাষাতেও অভিশ্রুতির প্রয়োগ অধিক। যেমন ব'লে, ক'রে, ক'তে ম'রে, উ'ড়ে, ও'ড়ে, শু'নে/সু'নে, ফে'রে, প'লো, ভ'জে।

লালন কাব্যভাষায় স্বরসঙ্গতি (Vowel Harmony) নানাভাবে নানারূপে ঘুরে ফিরে এসেছে। লোককবি স্বরধ্বনিকে মৌখিক উচ্চারণের দ্বারা কাব্যে তুলে ধরেছেন। ফলে স্বরসঙ্গতিতে নানাবৈচিত্র্য এসেছে। যেমন—দিলে > দেলে, কিসে > কিশি, ঠিকানা > ঠেকেনা, আমরা > আমারা, কান্দিলে > কেন্দেলে, লিখেছে > লেখেছে, ভূষণ > ভূসোন, যোজন > জোজোন।

বিপ্রকর্ষের বিপরীত প্রক্রিয়া হল সম্প্রকর্ষ। এই সম্প্রকর্ষের সংঘটনের জন্য লালনগীতিতে শব্দ মধ্যস্থ স্বরধ্বনি লুপ্ত হয়ে সরল ব্যঞ্জন, যুক্তব্যঞ্জনে পরিণত হয়েছে। যেমন—জানতে > জেন্তে, বলিলে > বল্লে, এমনি > এম্নী, আপনি > আপ্নী, মারিলি > মাল্লি।

লালন কাব্যভাষায় অপিনিহিতির ব্যবহারও আছে, তবে পরিমাণে অতি সামান্য। যেমন—খেলি > খেইল, চারি > চাইর, জাতি > জাইত, আজি > আইজ।

নাসিক্যীভবনের দৃষ্টান্ত লালনগীতিতে দেখা যায়। অর্থাৎ এখানেও আনুনাসিক বর্ণ উচ্চারণের প্রভাবে পরিবর্তিত হয়েছে চন্দ্রবিন্দুতে (ঁ)। আবার পাশাপাশি বিনাসিক্যীভবন ও স্বতোনাসিক্যীভবনের উদাহরণ পাওয়া যায়। তবে নাসিকীভবন প্রক্রিয়াটি নির্দিষ্ট নিয়ম মেনে চলেনি। যেমন, চাদ < চন্দ্র, আদার < আঁধার।

বাংলার মৌখিক উচ্চারণে দেখা যায় ব্যঞ্জনধ্বনির মহাপ্রাণতার লোপ। এখানেও ব্যঞ্জনধ্বনি মহাপ্রাণতা ও ঘোষত্ব হারিয়ে অল্পপ্রাণ ও অঘোষ ধ্বনিতে পরিণত হয়েছে। যেমন— সন্ধি > সন্দি, কাঠ > কাট, অবোধ > অবোদ, পাছ > পাচ, প্রতিশোধ > প্রতিশোদ, ক্ষুধা > খুদা, সাধন > সাদন, ভিখারী > ভিকারী, তিথি > তিতি, লোভ > লোব, ভেড়ো > বেড়ো, আধেলা > আদেলা, শোভা > শোবা।

পক্ষান্তরে উল্টো রকমও ঘটেছে অর্থাৎ অল্পপ্রাণ ও অঘোষধ্বনি মহাপ্রাণ ও ঘোষধ্বনিতে পরিণত হয়েছে। যেমন অগাধ > অঘাত, টের > ঠের, শুকনো > সুখনো, পুতলা > পুথলা, গর্ত

> গর্থ, সবায় > সভায়, বেহস্তখানা > ভেহেস্তেখানা, বাক > বাগ, বিকারে > বিগারে, শোকানল > শোগানল, পিপাসা > পেবসা।

কবি লালন ছিলেন গায়ক, সুরের সাধক। ফলে সঙ্গীতের সুর তাল রক্ষার জন্য শব্দের সঙ্কোচন ও প্রসারণ দুই ঘটেছে। তবে শব্দের প্রসার-প্রবণতার চেয়ে সঙ্কোচপ্রবণতা অধিক মাত্রায় কার্যকর। তাই এখানে 'বানর' হয় 'বান্দর', 'নৈরাকার' হয় 'নয়রেকার', 'সৃষ্টি' হয় 'ছিসটী', 'গো + চোনা' হয় 'গোরোচনা' ইত্যাদি।

লালনের কাব্যভাষার রূপতত্ত্বের (Morphology) কিছু বিশেষ বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায়। তিনি বিশেষ বিশেষ প্রত্যয়, বিভক্তি ও উপসর্গ প্রয়োগ করে গঠন করেছেন নতুন নতুন শব্দ। আবার তিনি কখনো কখনো অর্থসাদৃশ্যের ভিত্তিতে নতুন নতুন প্রত্যয়, বিভক্তি ও উপসর্গ নির্মাণ করেছেন। তৎসম, বিদেশী এবং লৌকিক বা দেশী উপসর্গ প্রয়োগে তাঁর অভিনবত্ব লক্ষ্য করার মতো। যেমন— অজান, নিগুম, নি-আকার, বেহাল, বেমতি, অপার, অপারি, অবধারি, অনিরূপ, নিরান্তরি, নিরাপন, বেহুসারে, বেসুমার, বিওগী, বেভরসা, বেরোগ, সুপদ, সুরাগ, সুভাব, শুপত, সুজন, সুমাধরী, কুলোক, কুঘারে, কুদিন।

লালনের এই উপসর্গ প্রয়োগ তাঁর নিজস্ব ভাষা সৃজনের স্বরূপকে তুলে ধরে। কবি অর্থ সাদৃশ্যের ভিত্তিতে নতুন নতুন শব্দ নির্মাণ করেছেন। তবে ব্যাকরণের নিয়ম ও যুক্তিকে তিনি উপেক্ষা করেছেন কোন কোন সময়ে।

লোককবির কাব্যভাষায় যেমন আছে তৎসম অনুসর্গ, তেমনি বিদেশী ও লৌকক বা আঞ্চলিক অনুসর্গের ব্যবহারও দেখা যায়। আবার কবি অনুসর্গপ্রতিম একধরনের শব্দাংশ ব্যবহার করেছেন। ফলে তাঁর কাব্যভাষা মান্য ও আঞ্চলিক চলিত ভাষার সংমিশ্রণে অভিনব হয়ে উঠেছে। কবি ভাষা প্রয়োগে কোন প্রকার সংকীর্ণতার পরিচয় দেননি। যেমন—ভিলকী মেরে, এস্তেজারি, কোন পাকে, হুকুমের গতো, ফকসা মারা, ভূতের বোঝা, পলি ফেরে ইত্যাদি।

কারকবাচক অনুসর্গ হল 'বিনা'। আমরা লোককবির ভাষায় নানাভাবে নানা অর্থে ঘুরে ফিরে আসতে দেখি বারবার। যেমন—বিনে কাষ্ঠে, বিনে স্থলে, রসিক বিনে।

আধুনিক বাংলায় প্রচলিত বহুবচন নির্দেশক বিভক্তিগুলিকে যেমন প্রয়োগ করেছেন, তেমনি একবচন নির্দেশক বা নির্দিষ্ট বস্তুবাচক বিভক্তিকেও প্রয়োগ করেছেন। তাঁর ভাষায় নির্দিষ্ট বস্তুবাচক বিভক্তিগুলি হল— খানা, খানি, টি, টা ইত্যাদি। যেমন— ভেহেস্তখানা, পাখিটা, বারামখানা, শ্রীরচরণখানা, মনের তিনটি বাসনা, অপজশটী, ঘরখানি ইত্যাদি।

রূপতত্ত্বের আসল বৈচিত্র্য পরিলক্ষিত হয় ভাষার কারক ও বিভক্তির ব্যবহারে। লালনের কাব্যভাষায় বিভক্তির বিশিষ্ট ব্যবহারগুলি হল :

বিভিন্ন কারকে 'এ/তে' বিভক্তির ব্যবহার—

সাধন পথে কিনা হলো।

জন্ত্র পড়িএ।

তাইতে কি অলষপানা।

প্রেম কি সামান্নেতে রাখা য়ায়।

ভগ্নদশা ভারি দেখি আখেরে।

সকলি কপালে করে।

বুঝালে না বুজে ধর্ম কাহিনী।

নেংটি ঝারা করলে আমারে।

বৈদিগে জ্ঞান চক্ষু ঝাপা,

পারো বৈলে।

করবে দিশে।

জাতে পয়দা দিনের রাসুল,

নিরে নিরাঞ্জন আমার।

গৌণ কর্মকারকে 'কে' বিভক্তির পরিবর্তে 'রে' বিভক্তির প্রয়োগের দৃষ্টান্তও দেখা যায়। যেমন— জেনিব তোরে।

আবার সম্বন্ধ পদের 'র' বিভক্তির পরিবর্তে 'ক' বিভক্তির ব্যবহার ও লালনের সাহিত্যে দেখি। যেমন—সিরাজ সাইকগুন।

আপনা থেকে 'র' বিভক্তির প্রবণতা লক্ষ্য করা যায় লালনের গানে। যেমন—সাইর, গোসাইর, আহাম্মদর ইত্যাদি।

লোকসাহিত্যের একটি বিশেষ প্রবণতাই হ'ল ব্যাকরণের প্রচলিত নিয়ম অক্ষরে অক্ষরে না মানা। রবীন্দ্রনাথ ছেলে ভুলোনা ছড়াতে এই ব্যাকরণ লঙ্ঘনের দৃষ্টান্তকে তুলে ধরেছেন এবং তিনি আরও বলেছেন এই ব্যাকরণ লঙ্ঘনের মাধ্যমে লোকসাহিত্যে সৃষ্টি হয়েছে এক অদ্ভুত সৌন্দর্য ও স্বাভাবিকতা। লালনও পরিচিত শব্দের ইতর বিশেষের মাধ্যমে ব্যাকরণ লঙ্ঘন করে-সৃষ্টি করেছেন নতুন শব্দ। যেমন—মৃতাগতি, মনের বুজি, মায়াকারী, ত্রিপীনি, দারিদ্রে, বেহুসার, অপার ভেবে, ঘোলা, ভোলে, তেজের ঘর, কাল রাগিনী ইত্যাদি।

ভাষার আঞ্চলিক প্রবণতার জন্য হয়তো বা মাত্রার খাতিরে স্থানবিশেষে অতিরিক্ত বিভক্তি প্রযুক্ত হয়েছে লালন গীতিতে। যেমন—দারিদ্রে, কোরাণেতে, তিলকেতে, কবিরাজেরে, ঘোরতরে, বারাবারি, নিরাঙ্করি ইত্যাদি।

লিঙ্গ সচেতনার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত আছে লালন সঙ্গীতে। কবি লিঙ্গ সচেতনায় অভিনবত্ব দেখিয়েছেন। যেমন—ভূজাঙ্গনা, জাদুকারী, নিরঞ্জনা, ডুরি, কাণ্ডার, কিশোরা, কিশোর, সাধকি বা শ্রীনারায়ণী ইত্যাদি।

ক্রিয়াপদের বৈচিত্র্য লালন কাব্যভাষার বিশেষ বৈশিষ্ট্য। তিনি ক্রিয়াপদের নানাবিধ রূপকে তুলে ধরেছেন। তাঁর কাব্যে নামধাতুজ ক্রিয়ার ব্যবহার দেখা যায় লৌকিক উচ্চারণ প্রবণতা অনুসারে। যেমন—বন্দবো, উত্তারিলে, নেহারে, জিজ্ঞাশীলে ইত্যাদি। আমরা অন্ত্যমধ্য বাংলা ভাষাতেও এই নামধাতুজ ক্রিয়ার ব্যাপক প্রয়োগ লক্ষ্য করি। নামধাতুজ ক্রিয়ার প্রয়োগে লালন ভাষাকে যেমন মধুর ও ভাবঘন করে তুলেছেন, তেমনি ঐতিহ্যকে অনুসরণ করেছেন।

পঙ্গুধাতু এবং পঙ্গুধাতুজ ক্রিয়ার ব্যবহার আমরা লালন সঙ্গীতে পাই। তাঁর এই পঙ্গুধাতুজ ক্রিয়ার প্রয়োগ অনেকটা ঝাড়খণ্ডী উপভাষার বৈশিষ্ট্যের মতো। যেমন— সেই বটে উপাশোনা, অধমো পামর বটে, ও চাঁদ বটে কি, ও দুইটি নুরের ভেদ বিচার জানা উচিত বটে ইত্যাদি।

মৌখিক বাংলা ভাষার বিশেষ বৈশিষ্ট্য হল যৌগিক ক্রিয়ার ব্যবহার। দু'টি ভিন্ন ধাতুজাত ক্রিয়াপদ পাশাপাশি অবস্থান করে একটি মাত্র ক্রিয়ার অর্থকে প্রকাশ করে যৌগিক ক্রিয়াতে। এই যৌগিক ক্রিয়ায় কখনো প্রথম ক্রিয়া পদটির অর্থ প্রধান হয়ে উঠে, কখনো বা দ্বিতীয় ক্রিয়াপদটির অর্থ প্রধান হয়। লালন সঙ্গীতে এই যৌগিক ক্রিয়ার প্রয়োগ-বৈচিত্র্য অনন্য-সাধারণ। যেমন—তেজ্জ করে, গঠন গঠেছে, জেন্তে পায়, বশে খাইলাম, আএ দেখে জা, নাব দিয়ে চাও ধরতে, দেখীয়া দিবে ইত্যাদি।

কবি লালনের ভাষায় নঞর্থক ক্রিয়াপদের প্রয়োগও বিশেষত্ব লাভ করেছে। যেমন—না-হক, নাজানে, না দেখিলাম, দেখনা, জপনা, নারি, নাএ, নারা ইত্যাদি।

কবি চলিত বাংলা ক্রিয়ার তিনটি কাল ও কালের বিভিন্ন পুরুষ অনুসারে বিভিন্ন রূপকে তুলে ধরেছেন। আমরা তাঁর কাব্যে বাচ্যানুসারে ক্রিয়ার রূপ দেখতে পাই। কবির কর্ম ও ভাববাচ্যের ক্রিয়ার রূপের উদাহরণ হল— কভু না বাজিতে পারে, ভরসা নাই কখন, না জানো সেবা সাধন। পাশাপাশি কবির কর্মভাববাচ্যের প্রশ্নাত্মক রূপটি বিশেষ আকর্ষণীয়। যেমন— না বাজাও বেজিবে কেনে, কুলকি কারু সঙ্গে যাবে।

মান্য বাংলায় প্রচলিত সমস্ত সর্বনাম পদের পাশাপাশি লৌকিক বা গ্রাম্য আঞ্চলিক ভাষায় যে সমস্ত সর্বনাম প্রচলিত ছিল তারও কিছু কিছু নিদর্শন লালনের বাউল সঙ্গীতে পাওয়া যায়। তাঁর কাব্যে যেমন ব্যক্তিবাচক সর্বনাম আছে তেমনি অনির্দিষ্ট অজ্ঞাতবস্তুবাচক সর্বনামও আছে। যেমন ব্যক্তিবাচক সর্বনাম হল— তাইরি, তাহারি, তারি, তার; আমা, আমাকে, মোকে, মোর, মর; কারু কারো, কাহারো, কাহারু প্রভৃতি। আর অনির্দিষ্ট অজ্ঞাত বস্তু বা বস্তুর বিশালতাকে প্রকাশ করার জন্য যারে তারে, কি সে, শে যে, অন্নী তন্নী -এর বহুল ব্যবহার করেছেন লালন।

লালনের কাব্যভাষায় বাক্যতত্ত্ব (syntax) বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করে আছে। বাক্যতত্ত্বে বাক্যের গঠন, বাক্যের বিভিন্ন উপাদানের পরস্পরের সম্পর্ক, বাক্যের সামগ্রিক অর্থ আলোচিত হয়। আমরা লালনের কাব্যভাষায় আঞ্চলিক কথারীতির সঙ্গে চলিতরীতি এবং সাধুরীতির সংমিশ্রণ ঘটতে দেখি। কবির ভাষায় এই মিশ্রণ ঘটেছে বলে একই বাক্যে তিন ধরনের

বাক্যের উপাদানই বর্তমান। কবির বাউল সঙ্গীতে কথ্য, চলিত ও সাধুরীতির ক্রিয়াপদ সর্বনাম ও শব্দের ব্যবহার দেখি। লালনের গানে ক্রিয়াপদের তিনটি রূপই কথ্য, শিষ্ট চলিত এবং সাধু, পাই। যেমন—কৈরে, করে, করিএ, করিয়া; বলে, বৈলে, বলিএ, বলিয়া, বল্লে প্রভৃতি। আবার সর্বনাম পদের তিনটি রূপ হল— তাইরি, তাহারি, তারি, তার; আমা, আমাকে, মোকে, মোর, মর; কাউ, কাহারো, কারো, কাহার ইত্যাদি।

প্রত্যেক ভাষায় বাক্যের উপাদানের প্রয়োগের নির্দিষ্ট ক্রম (order) আছে। প্রচলিত কথ্য ও সাহিত্যিক উভয় ক্ষেত্রেই এই নির্দিষ্ট পদক্রম বজায় রাখতে হয়। তবে প্রত্যেক সাহিত্যিক আপনব্যক্তিত্ব ও প্রতিভানুসারে এই নির্দিষ্ট পদক্রমের বিপর্যয় ঘটাতে পারেন। তবে তখন তা কখনোই বাক্যগঠনের ত্রুটি বলে বিবেচিত হবে না, তা সাহিত্যের বিশেষত্ব (style) বলে পরিচিত হবে। আমরা দেখি লোককবি লালন তাঁর বাউল সঙ্গীতেও বাক্যের নির্দিষ্ট পদক্রমের লঙ্ঘন ঘটিয়ে কাব্যে আপন বৈশিষ্ট্যকে (style) মুদ্রিত করে দিয়েছেন।

কবি কাব্যের খাতিরে ভাষার সৌন্দর্য বৃদ্ধির জন্য কথ্যরীতির, পদনির্বাচনে, পদনির্মাণের ক্ষেত্রে পদান্বয়ে নানা বিপর্যাস (inversion) ঘটি[illegible]। যেমন—

	সাধারণরীতি		বিপর্যাস
১।	বিশেষণ + বিশেষ্য	১।	বিশেষ্য + বিশেষণ
ক.	বিবাগী মন	ক.	মন বিবাগী
খ.	তিরোধারা ত্রিপিনীরো	খ.	ত্রিপীনেরো তিরোধারা
গ.	চিত্ত জাদুকারী সাধু গৌরাঙ্গ	গ.	গৌরাঙ্গ সাধু চিত্ত জাদুকারী
২।	কর্ম + ক্রিয়া	২।	ক্রিয়া + কর্ম
ক.	অনুরাগ তরি ভাসাও	ক.	ভাসাও অনুরাগ তরি
খ.	তবে ত্রিবিনে আইজ ফাঁদ পাতো	খ.	তবে ফাঁদ পাতো আইজ ত্রিবিনে
৩।	কর্তা + ক্রিয়া	৩।	ক্রিয়া + কর্তা
ক.	দরবেষ দেল ঢুরে	ক.	দেল ঢুরে দরবেষ যারা
খ.	এবার আমি ঘোর সাগরে পড়েছি	খ.	পড়েছি এবার আমি ঘোর সাগরে
গ.	দয়াল এসে কেশে ধরে পার করো	গ.	পার করো দয়াল আএ কেশো ধরে
৪।	অধিকরণ + ক্রিয়া	৪।	ক্রিয়া + অধিকরণ
ক.	ঘাট আঘাটায় ডুবালে	ক.	ডুবালে ঘাট আঘাটায়
খ.	ভারের ভুবনে তার সদায় বেহার হচ্ছে	খ.	তার সদায় বেহার হচ্ছে ভাবের ভুবনে

৫। যৌগিক ক্রিয়া ও সংযোগাত্মক ক্রিয়ার বিপর্যয় বা উলোটপালোট ঘটতে দেখা যায় লালনের গানে। যেমন— দিলাম দোহাই, দেখ ধরি, হলেম চোক থেকিতে কানা, নিষ্ঠা হৈলে মিলবে তারি

ঠেকে না।

৬। নেতিবাচক, বিশেষ্য এবং সমাপিকা ক্রিয়ার বিপর্যাস ঘটতে দেখা যায় লালন সঙ্গীতে। যেমন—নাইরে কালামালা ধারণ, একদিনো না দেখিলাম তারে, শাস্ত্রবিনা নাই সে কূলে, না দেখি উপায়, তারে চেনা না গেল, সে মানুষ অচিন।

লোককবির ভাষায় স্থান বিশেষে বিভক্তি বা সংযোগাত্মক অব্যয় লুপ্ত হয়ে গেছে। যেমন—কারু কয়, মাসুক রূপ হৃদয় রেখে, যে ভাবে আইল হরি এই নদীয়া, বিষমৃতো আছে মিলন।

অনেক সময় নেতিবাচক শব্দাংশ তিনি অবধারণার্থক ইতিবাচক অর্থে প্রয়োগ করেছেন। যেমন— মুখে সাইর নাম জপনা, থেকতে বাতি উজ্জলাময় দেখ না।

লালনের কাব্যভাষায় বিরোধী বা বিপরীত শব্দ যুগ্মক দিয়ে পদ গঠনের দৃষ্টান্তও দেখা যায়। যেমন—জাত-ছেফাত, দিন-রজনী, সামান্য বিশেষ, কামিপ্রেমী, তল উপর, সার অসার, স্বরূপ বিরূপ, শব্দ নিঃশব্দ প্রভৃতি।

লালন বাক্যতত্ত্বের ক্ষেত্রে নানা কুটিল পরিবর্তন সাধন করেছেন, যার ফলে তাঁর কাব্যভাষায় নানা বৈচিত্র্য এসেছে।

অবশেষে আমরা লালনের কাব্যভাষা বিশ্লেষণ করে বলতে পারি, লোককবি লালন যে বিচিত্র অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছেন জীবন যাত্রা পথে, তাকেই কাব্যে রূপ দিয়েছেন এবং ঐতিহ্যবাহিত উপাদানকে তিনি আত্মস্থ করে কাব্যে তুলে ধরেছেন। ফলে তাঁর কাব্যভাষায় যেমন কথ্য-আঞ্চলিক ভাষা, মান্যচলিত ভাষা স্থান পেয়েছে, তেমনি সাধুভাষাও নিজের স্থান করে নিয়েছে। সব মিলিয়ে বলা যায়, তাঁর কাব্যভাষায় জীবন্ত কথ্যভাষার সহজতা, স্বতঃস্ফূর্ত প্রাণাবেগ, নিম্নবর্গের উল্লাস ও জীবনস্পন্দন পাওয়া যায়। কবি লালন সমস্ত উপাদানকেই অনুভূতির রসে জারিত করে সাহিত্যের উপাদানে পরিণত করেছেন।

লোককবি লালন : ধর্ম-দর্শন ও কাব্যমূল্য

ত্য মানব সভ্যতা বিকাশের ঐতিহ্যে সুদীর্ঘকাল থেকে প্রবাহিত হয়ে আসছে। লোকায়ত সমাজজীবন এর উৎসভূমি। জল-মাটি-কাদা, গাছ-পালা, পশুপাখি—সহজ-সরল পরিবেশে মানব প্রকৃতির গহনচৈতন্যে লোকসাহিত্য তার স্বাভাবিক গতিতেই বিকশিত হয়ে চলেছে — পৃথিবীর সকল দেশের আধুনিক সাহিত্যের ভিত্তিভূমিরূপে। বাংলাদেশের লোককবির প্রতিভায় বাংলা লোকসাহিত্যও তথ্য ও তত্ত্বে পূর্ণ ভাবসম্পদ নিয়ে অনুরূপ ঐতিহ্যে প্রবাহিত হয়ে চলেছে। একদিকে কিরীটি ধারিণী তুষারশৃঙ্গ, অন্যদিকে সবুজে-শ্যামলে গড়া এই নদীমাতৃক বাংলা সরোবরে সিদ্ধাচর্য, যোগী, বৈষ্ণব, বাউল, সুফী প্রভৃতি মরমীবাদের প্রস্ফুটিত পঙ্কোজরাজি — বাঙালীর প্রাণ-ভ্রমরাকে পাগলপারা করেছে, ভাব উন্মাদ করেছে প্রতিক্ষণে। মরমীবাদ থেকেই উদ্ভূত হয়েছে মরমী সঙ্গীত। মারফতী, মুর্শিদী, বাউল প্রভৃতি এই পর্যায়ভুক্ত। বাউল গান হলো 'ভাবসঙ্গীত'। 'বাউল কবি লালন শাহ' গ্রন্থে ডক্টর আনোয়ারুল করিম যথার্থই বলেছেন—

"ভাষার লালিত্য না রইলেও এই গানগুলোতে এক সহজ সরল অনুভূতির পরশ পাওয়া যায়। সভ্যতার আলোকপ্রাপ্ত মানুষ এর অন্তর্নিহিত তাৎপর্য উপলব্ধি করতে পেরে বিস্মিত হয়েছে। এ গানগুলোর রচয়িতা যারা তারা সাধক।"

—এই সাধক সম্প্রদায়ের পুরোধা হলেন বাংলার মরমী লোককবি লালন শাহ।

সকলেই কবি নয়, কেউ কেউ কবি—আর যাঁরা কবি তাঁরা হৃদয়ের উপলব্ধ সত্যকে ভাব দিয়ে ভাষা দিয়ে চেতনার রঙে রাঙিয়ে তোলেন। কোন সংজ্ঞা ধরে, সূত্র ধরে বা দর্শন মেনে কেউ কবিতা লেখেন না, কবিদের জীবনানুভূতিই পরে দর্শনের রূপ নেয়। লালন মূলত ছিলেন দার্শনিক কবি—উদাসীন বাউল, লোককবি; তাঁর হৃদয় বীণার তন্ত্রীতে তন্ত্রীতে অনাঘ্রাতা যূথীর মতো যে সত্যসুন্দর - ঈশ্বরের বাণী ঝঙ্কৃত হতে লাগল, তা ভাষায় প্রকাশ করতে গিয়ে তিনি ভাবজগতে আত্মহারা হয়ে পড়েছেন। 'আলেকমানুষ' খুঁজতে গিয়ে লালন শ্রান্ত হয়ে পড়েছেন, কিন্তু পথহারা হননি। ঈশ্বরকে জীবনের ধ্রুবতারা করে—তাঁকেই পাবার চেষ্টা করেছেন আজীবন। এই হৃদয়-দেবতা কিন্তু মন্দিরে মসজিদে নেই, জপে-তপে পাওয়া যায় না তাঁকে। তিনি লুকিয়ে আছেন ভক্তের হৃদয়েই। তাঁকে শুধু সন্ধানী দৃষ্টি দিয়ে খুঁজে নিতে হবে। তাই হৃদয়ের মণি-কোঠায় তাঁকে পাবার জন্য মুরশিদ ধরেছেন লালন। এই মুরশিদই তাঁর পথপ্রদর্শক।

তাই আমরা দেখি লালন গীতিতে স্রষ্টার প্রিয় সৃষ্টি মানুষের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা ও মানবপ্রেম যেমন আছে তেমনি আছে তত্ত্ব, তথ্য, দর্শন ও সাহিত্যগুণ। তাই লালনগীতির কাব্যশৈলী বিশ্লেষণ করতে গেলে স্বভাবতই লালন মানসের তাত্ত্বিক আলোচনা প্রসঙ্গক্রমে এসে যায়। কিন্তু মনে রাখতে হবে, এই তত্ত্ব লালনের শিল্পি-মানসের জাদু স্পর্শে কাব্যসত্যে রূপান্তরিত হয়েছে। লালনের ধ্যানগম্ভীর সাধকচিত্ত, যে সত্যের সন্ধান করেছে তা হলো—এই মানবদেহের অন্তর্গত 'অচিন পাখি'কে জানা। মানুষ তাঁর বুকের মাঝেই বিশ্বলোকের সাড়া পেতে পারে—বিশ্বনাথের উপস্থিতি-অনুভব করতে পারে। সে বিরাট, অনন্ত আরাধ্যদেব স্বর্গে নেই, মর্ত্যে নেই,

কোথাও সে নেই—সে আছে আমাদেরই বুকের মাঝে, এই দেহভাণ্ডে। তাইতো লালন গেয়েছেন—

খাঁচার ভিতর অচিন পাখি
কেমনে আসে যায়।
ধরতে পারলে মনোবেড়ি
দিতাম পাখির পায়।।

আমাদের এ দেহ দেহ নয় - খাঁচা। সেখানে বাস করে আত্মারূপ পাখি। সে পাখি উড়ে গেলেই শূন্য খাঁচা খাঁ-খাঁ করে; মাটির দেহ মাটিতেই মিশে যায়। 'সুত-মিত-রমণী' সমৃদ্ধ সমাজ -সংসার সবই শূন্যতায় পর্যবসিত হয়। দেহ ছেড়ে আত্মার উধাও হয়ে যাওয়ার মধ্যে অনন্তের স্বাদ উঁকি দিচ্ছে। এ হলো বিশেষ থেকে নির্বিশেষের দিকে মঙ্গলময়-সত্যের জগতে আত্মার উর্দ্ধায়ণ। যিনি সাধক তিনি দেহের মধ্যেই আত্মাকে - এই 'অচিন পাখি'র স্বরূপকে উপলব্ধি করতে পারেন। তাই ড. শশীভূষণ দাশগুপ্ত বলেছেন —

"এই যে রূপের খাঁচার মধ্যে একটি অধরা অচিন পাখির আসা-যাওয়ার রহস্য রক্ত মাংসের মানুষের ভিতরেই যে আর একটি মনের মানুষের অবস্থান — ইহার আভাসই বাউল-সঙ্গীতকে আধুনিক কালে এত জনপ্রিয় করিয়া তুলিয়াছে।"

লালন বলেছেন যে, ক্ষ্যাপার মতো— "মনের মানুষ বনে" সদায় খুঁজে বেড়াবার দরকার নেই। কারণ —

"সোনার মানুষ রসে ভাসে।।
যেই করে সেই রস পান,
সেই দেখিতে পায় অনাশে।।"

— অর্থাৎ সাধক, আত্মার স্বরূপ উপলব্ধি করতে পারে তাঁর দেহের মধ্যেই। দেহরূপ ব্যক্তি 'আমি'র মধ্যেই বিরাজ করছেন 'বিরাট আমি'—চিরন্তন পরমসত্তা; সাধক তাঁকেই ধরতে চান। এখান থেকেই জন্ম নিয়েছে লালনের 'মানুষ-রতন'-তত্ত্ব । এ হলো লালন দর্শন; তিনি বলেন —

"এই মানুষে আছে রে মন,
যারে বলে মানুষ রতন"।

ড. খোন্দকার রিয়াজুল হক বলেছেন যে, —

"এই মানুষ রতন সাধারণ অর্থে বিশ্বের মনুষ্যজাতির অন্তর্নিহিত মানবতা এবং পূর্ণমানবের মধ্যস্থিত শুদ্ধ মানবসত্তা। একটি সেকুলার হিউম্যানিজম, অন্যটি স্পিরিচুয়াল হিউম্যানিজম। স্পিরিচুয়াল হিউম্যানিজম অর্থে কবি বুঝেছেন তাঁর মনের মানুষকে।"
(লালন মৃত্যুশতবার্ষিকী স্মারকগ্রন্থ পৃ ৯০)

— এই 'মনের মানুষে'র সঙ্গে মিলনের জনাই লালন সাধনা করে গিয়েছেন। তিনি বলেছেন —

"মিলন হবে কতদিনে।

আমার মনের মানুষের সনে।।"

মনের মানুষের সঙ্গে এই মিলন, নারী পুরুষের যৌন মিলনের মধ্যে দিয়েই হতে পারে। লালন মনে করেন যে, পুরুষ-প্রকৃতির যথার্থ মধুর মিলনেই আত্মার উপলব্ধি সম্ভব। এখানে যেন তান্ত্রিক কায়াসাধনার আভাস স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। প্রথমে তান্ত্রিকদের মূল বক্তব্যগুলো জেনে নেওয়া যেতে পারে। তান্ত্রিকেরা বিশ্বাস করে যে, তাদের দেহের মধ্যেই সত্য বিরাজ করে। বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের প্রতিমূর্তিই যেন এই নরদেহ। তান্ত্রিকেরা দেহের মধ্যেই দেখতে পান বাইরের জগতের চন্দ্র-সূর্য, সুমেরু-কুমেরু, গঙ্গা - যমুনা প্রভৃতি যাবতীয় তত্ত্ব । তান্ত্রিকদের মূল কথাটি হচ্ছে —

"এই দেহই সত্যের মন্দির, সকল তত্ত্বের বাহন। ইহাকেই যন্ত্র করিয়া ইহার ভিতরেই শিব শক্তির মিলন ঘটাইতে হইবে। নিজের ভিতরে এই শিব শক্তির মিলনের দ্বারা সত্য প্রতিষ্ঠা হইলেই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের ভিতর দিয়াও সেই সত্যকে উপলব্ধি করা সহজ হইবে। সাধককে তাই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড হইতে ফিরিয়া আসিতে হইবে দেহভাণ্ডে, ইহাই তান্ত্রিক সাধনার প্রথম অঙ্গ।"

— শশীভূষণ দাশগুপ্ত - (ভারতীয় সাধনার ঐক্য, কলি - ১৩৫৮ পৃ - ২০)

তান্ত্রিকেরা মনে করে দেহের মেরুদণ্ড হলো মেরুপর্বত। এর উর্ধ্বভাগে বা উত্তরাংশে রয়েছে সুমেরু এবং সর্বনিম্নে রয়েছে কুমেরু। সুমেরুতে সহস্রার এবং কুমেরুতে মূলাধার চক্র অবস্থিত। মূলাধার চক্রে সার্ধ-ত্রিবলিত কুণ্ডলীর মধ্যে কুলকুণ্ডলিনীরূপিণী শক্তি সুষুপ্তা—যোগ-সাধনার দ্বারা এই নিদ্রিতা শক্তিকে জাগাতে হবে এবং সেই সাধনা বলে তাকে উর্ধ্বাভিমুখে নিয়ে যেতে হবে—বিভিন্ন চক্র অতিক্রম করে সহস্রারে শিবের সঙ্গে মিলন করাতে পারলেই সাধক অদ্বয় সত্য লাভ করবে। এখানে বিভিন্ন চক্র অর্থে মূলাধার এবং সহস্রার মধ্যে অবস্থিত পাঁচটি চক্রের কথা বলা হয়েছে। দেহের বিভিন্ন অংশে কয়েকটি চক্রের নির্দেশ করেছেন তান্ত্রিকগণ। যেমন—

১। গুহ্যদেশ ও জননেন্দ্রিয়ের মধ্যভাগে মূলাধার চক্র।
২। জননেন্দ্রিয় মূলে স্বাধিষ্ঠানচক্র।
৩। নাভিতে মণিপুর চক্র।
৪। হৃদয়ে অনাহত চক্র।
৫। কণ্ঠে বিশুদ্ধ চক্র।
৬। ভ্রূদ্বয়ের মধ্যস্থলে মতান্তরে তালুতে আজ্ঞা চক্র এবং
৭। মস্তিষ্কদেশে সহস্রার।

তান্ত্রিক কায়াসাধকেরা দেহের নাড়িকে সংযত করে সাধনার পথে অগ্রসর হবার কথাও বলেছেন। তারা মনে করেন বাম দিকের ইড়া নাড়ি হলো শক্তি এবং ডান দিকের পিঙ্গলা নাড়ি হলো শিব, এদের মধ্যবর্তী হচ্ছে সুষুম্না। এই ইড়া পিঙ্গলার মধ্য দিয়ে প্রবাহিত করে আপন ও প্রাণবায়ুকে যোগ সাধনার বলে সুষুম্নাতে এসে মিলিত করাতে হবে। তারপর সেই সুষুম্না-পথে তাকে উর্ধ্বাভিমুখে পরিচালিত করে বিভিন্ন চক্র অতিক্রম করে সহস্রারে নিয়ে যেতে হবে।

আমরা জানি, মহাযানী বৌদ্ধদের শূন্যতা ও করুণা, সহজানী বৌদ্ধদের প্রজ্ঞা ও উপায়ে

পরিণত হয়েছে। এই প্রজ্ঞা ও উপায়ই ললনা ও রসনা নাম ধারণ করে পরবর্তী পর্যায়ে ইড়া-পিঙ্গলার সঙ্গে অভিন্ন হয়ে গেছে। আর বোধিচিত্ত অবধূতিকা রূপে সুষুম্নার সঙ্গে শেষ পর্যন্ত অভিন্ন কল্পিত হয়েছে। হিন্দু তন্ত্রের মতো বৌদ্ধ তন্ত্রেও চারটি চক্র কল্পিত হয়েছে। হেবজ্রতন্ত্র অনুসারে এগুলি নিম্নরূপ—

১। নির্মাণ চক্র — জননেন্দ্রিয় থেকে নাভি পর্যন্ত এর স্থান বিস্তৃত।
২। ধর্মচক্র — এরস্থান হৃদয়ে।
৩। সম্ভোগচক্র — এর স্থান কণ্ঠে।
৪। মহাসুখচক্র — এ চক্র মস্তকে অবস্থিত।

বৌদ্ধতন্ত্র অনুসারে, ললনা ও রসনার মিলনে যে বোধিচিত্ত উৎপন্ন হয়, নির্মাণকায়ে অবস্থানকালে সে হচ্ছে সংহত বোধিচিত্ত— জননেন্দ্রিয় থেকে নাভি পর্যন্ত নির্মাণচক্রের প্রবৃত্তির রাজ্যে তার বিচরণ; এই বোধিচিত্তের স্বভাব চঞ্চল এবং তা কামকেলির মত্ততায় নীচের দিকে ধাবিত হবার সম্ভাবনা বেশি। কিন্তু যোগসাধন বলে একে উর্ধ্বমুখী করতে পারলে সে রূপান্তরিত হয় প্রেমে—পারমার্থিক বোধিচিত্তে। এই পারমার্থিক বোধিচিত্তই চর্যাপদে উল্লিখিত হয়েছে সহজ সুন্দরী, নৈরামনি, নৈরাদেবী প্রভৃতি নামে।

লালনসঙ্গীতে এই তত্ত্ব কাব্যরূপ লাভ করেছে। তিনি বলেছেন—

'এ বড় আজব কুদরতি
আঠারো মোকামের মাঝে
জ্বলছে একটি নূরের বাতি।'

—দেহের মধ্যে রয়েছে আঠারো মোকাম বা কক্ষ। এই কক্ষের কোথায় কি আছে না আছে সাধকের তা জানা দরকার—

আট কুঠরী নয় দরজা আটা
মধ্যে মধ্যে ঝলকা কাটা
তার উপরে সদর কোঠা
আয়না মহল তায়।

—এ ছাড়াও দেহের ভিতরে রয়েছে ষট্‌চক্র, বারোবরোজ, চারচন্দ্র, চৌদ্দভুবন, ষড়রিপু, এবং দশ ইন্দ্রিয়। এই সবের মধ্যে কামরিপুর তাড়না অত্যন্ত প্রবল।

তারই প্রভাবে মানুষ নিম্নগামী হয়—সংসারে মায়ার বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে পড়ে। এই কামকে সাধন বলে জয় করে প্রেমের রাজ্যে নিয়ে যেতে পারলেই পারমার্থিক সুখলাভ হয়। লালন কামকে অমাবস্যা এবং প্রেমকে পূর্ণিমার প্রতীক রূপে নির্দেশ করেছেন। এই অমাবস্যা ও পূর্ণিমার তথা কাম ও প্রেমের মিলনেই আনন্দানুভূতিরূপ সত্তার স্বার্থকতা আসে। এই তত্ত্বকে কাব্য কৌশলে প্রকাশ করেছেন লালন। তিনি বলেছেন—

'অমাবস্যায় চাঁদের উদয়
—দেখিতে যার বাসনা হয়

লালন বলে থেকো সদয়
ত্রিবেণীর কিনারে বসে।'

—অর্থাৎ কামের আবিলতায় মত্ত অবস্থাতেই চাঁদের উদয় তথা প্রেমের উদয় হয়। যিনি সাধক তিনি ত্রিবেণীর কিনারে অর্থাৎ 'নির্মাণ চক্র' বা জননেন্দ্রিয় থেকে নাভি পর্যন্ত বিস্তৃত প্রবৃত্তির রাজ্যে বিচরণ করেও প্রেমের পথে অগ্রসর হতে পারেন। ত্রিবেণীর ধারে বসে সাধক বুঝতে পারেন আগে আসে কাম পরে উদয় হয় প্রেমের।

'শুদ্ধ প্রেম সাধলো যারা কাম রতি রাখিল কোথা
বলগো রসিক রসের মাফিক ঘুচাও আমার মনোব্যথা
আগে উদয় কামের রতি—
রস আগমন তারই গতি
সে রসের করে স্থিতি—
খেলছে মানুষ প্রেম-দাতা।।'

—অর্থাৎ কামাচারের মধ্য দিয়ে যোগ সাধনার সিদ্ধিলাভ সম্ভব। কিন্তু সে বড় কঠিন সাধনার ধন। তাই লালন বলেন—

'কামে থেকে নিষ্কামী সে হয়
কামরূপে প্রেম শক্তির আশ্রয়
লালন ফকির ফাঁকে ফেরে
কঠিন দেখে শুনে।।'

কামের জগতে যেজন ডুব মেরে আর উঠতে পারে না সে জনই মড়া। কিন্তু কামকে লালন অস্বীকার করেননি। কেননা নর-নারীর সম্পর্ক প্রকৃতির স্বাভাবিক বিধান। এখানেই লালন বস্তুবাদী কবি। তিনি বাস্তব স্বীকৃত জীবনেরই জয়গান গেয়েছেন। তাই বলেছেন—

'কি বলবো সেই প্রেমের কথা
কামে হয়েছে প্রেমের লতা
কামবিনা প্রেম যথা তথা
কই সে আগমন।'

কাম ছাড়া প্রেম সম্ভব নয়। কিন্তু লালন কামকে অতিক্রম করে প্রেমের জগতে , সৌন্দর্যের জগতে, সত্যের জগতে পৌঁছতে চেয়েছেন। এখানে তাঁর কবিপ্রাণ বস্তুবাদ অতিক্রম করে মিষ্টিক পর্যায়ে উত্তীর্ণ হয়েছে। তাই দেখি কবি বলেছেন—

'রস রতি অনুসারে
নিগূঢ় ভেদ জানতে পারে
রতিতে মতি ঝরে
মূল খণ্ড হয়।'

—তাই কামকে মেনে নিয়েও কামের ঘরে কপাট মারা সম্ভব। লালন বলেছেন—

'কপাট মার কামের ঘরে।।
মানুষ ঝলক দিবে রূপ নিহারে।।'

এই মানুষকে ধরতে গেলে প্রেমনদীতে ডুব দিতে হবে। তাই লালন বলেছেন—

'ডুবে দেখ দেখি প্রেম নদীর জলে
মীন রূপে সাঁই খেলে।।
প্রেম ডুবারু না হইলে মীন
বাধবে না জালে।।'

এই মীন ধরতে গেলে স্রষ্টা, সৃষ্টি এবং আত্মতত্ত্ব জানা দরকার। লালন বলেছেন যে, দেহের মধ্যে আত্মা দ্বিদল পদ্মে অধিষ্ঠান করেন—

মনের মানুষ খেলছে দ্বিদলে
যেমন সৌদামিনী মেঘের কোলে।

যিনি সাধক তিনি এই মনের মানুষকে সহজেই লাভ করতে পারেন। ড. শশিভূষণ দাশগুপ্ত বলেছেন—

"এই রূপ যিনি উপলব্ধি করিতে পারেন তিনিই সাধক। তাহার আর কোন শাস্ত্র গ্রন্থাদির প্রয়োজন নাই।

সেই সহজরাগের রসিক হইলেই ইহা জানা যায়। পাণ্ডিত্যের দ্বারা বা জ্ঞানের দ্বারা সেই অনুভূতি লভ্য নহে, অনুরাগে হৃদয়-সমুদ্রে ডুব দিলে অন্তরতম পরম সত্য উপলব্ধি করা যায়। সেই অন্তরসত্তা মনুষ্যরূপ, তিনি মানবরূপে এই দেহসৃষ্টি করিয়াছেন, সেই জন্য মানুষকে ভজনা করিলেই পরম সত্যকে পাওয়া যাইবে। দেহকে আশ্রয় করিয়া দেহাতীত সত্তা বিরাজ করিতেছেন। দেহের সহিত তাহার সম্পর্ক অবিচ্ছেদ্য। তিনি সৃষ্টির মূলীভূত কারণ, সেই মূল হইতে সৃষ্টি। দেহ হইতেছে রূপ এবং দেহ মধ্যস্থিত আত্মা স্বরূপ। মূল হইতে শাখার সৃষ্টি হইয়াছে, শাখা ধরিলে মূলকে অন্বেষণ করা যাইবে, সেইরূপ দেহরূপ অন্বেষণ করিলে পরম সত্তার উপলব্ধি হইবে।"

অর্থাৎ লালন মনে করেছেন যে, জীবন নিয়ন্তা থেকেই জীবনের সৃষ্টি। বীজ থেকে বৃক্ষ এবং বৃক্ষ থেকে ফল সৃষ্টি হয়— কিন্তু বীজ, বৃক্ষ, ফল যেমন কেউ ভিন্ন নয়— স্রষ্টা ও সৃষ্টিও তেমনি; এই সৃষ্টিতত্ত্ব লালনের মুখে কাব্যবাণী লাভ করেছ। লালন বলেছেন—

জানা উচিত বটে দুটো নূরের ভেদ বিচার।।
নবীজী আর নিরূপ খোদা নূর কি প্রকার।।
নবীর যে আকার ছিল
তাহাতে নূর চোয়ায় বলো
নিরাকারে কী প্রকারে
নূর চোয়ায় খোদার।
আকার বলিতে খোদা
শরাতে নিষেধ সদা,

আকার বিনা নূর ছোঁয়নো
প্রমাণ কি তার।।
জাত এলাহি ছিল জাতে
কিরূপে এলো ছিপাতে
লালন বলে নূর চিনিলে
ঘোচে অন্ধাকার।।

তাই দেখি সাধক কবির মনে জীবাত্মা-পরমাত্মার ভেদরেখা বিলুপ্ত হয়ে গিয়েছে। তিনি আত্মভাবে বিভোর হয়ে বলেছেন—

আমি কি তাই জানলে সাধন সিদ্ধ হয়।।
আমি কথার অর্থ ভাবি 'আমি' সে তো আমার নয়।।
অনন্ত শহর বাজারে
'আমি' আমি শব্দ করে
আমার আমি চিনতে নারে
বেদ পড়ি পাগলের প্রায়।।

মনসুর হাল্লজ ফকির সে তো বলেছিল আমি সত্য।

সই পথ সাঁইর আইন মত
সরায় কি তার মর্ম পায়।।

জীবাত্মা পরমাত্মার একাত্মতা সম্পর্কে লালন আরো বলেছেন—

আত্মতত্ত্ব না জানিলে
ভজন হবে না পড়বি গোলে
আগে জানলে কাল্লুলা
আনল হাবা আল্লা
যারে মানুষ বলে।

এই আত্মতত্ত্ব জানতে গেলে গুরুর কৃপা অবশ্যই প্রয়োজন। তিনিই মুক্তির পথ দেখাবেন। তাই লালন বলেছেন—

গুরু যার আছে সদয়
শমন বলে তার কিসের ভয়,
লালন বলে মনরে আমায়
করিল দোষী।।

তাই লালন বলেছেন—

গুরুপদে ডুবে থাকরে আমার মন।
গুরুপদে না ডুবিলে জনম যাবে অকারণ।।

ড. শশিভূষণ দাশগুপ্ত তাই বলেছেন—

"যদি জীবনের শেষে পরম স্বার্থকতা লাভ করিতে হয়, ঈশ্বরের সত্তার সহিত একাত্ম হইতে হয়, তবে ঠিকমতো গুরুর নির্দেশে সেই নূরের সাধনা করিতে হইবে। সাধনার শ্রেষ্ঠতম ফল হইতেছে ব্যক্তিসত্তার ধ্বংস সাধন (ফানা) এবং ঈশ্বরের স্বরূপে অবস্থিতি (বাকা)। বাকা তাই জীবিত থাকা, ঈশ্বরের সহিত একাত্মতা বোধ করিলে ঈশ্বরের অবস্থিতি হয়, ইহাই জীবিত অবস্থা।"

বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ছিলেন লালনের একান্ত ভক্ত। তাই লালনের মতোই রবীন্দ্রনাথও হৃদয়ের মাঝেই পরম সত্তার সন্ধান পেয়ে গেয়ে উঠেছেন—

আমার হিয়ার মাঝে লুকিয়ে ছিলে
দেখতে আমি পাইনি।
তোমায় দেখতে আমি পাইনি।
বাহির পানে চোখ মেলেছি
আমার হৃদয়পানে চাইনি।

কিন্তু হৃদয়পানে তাকিয়ে প্রাণের মাঝে নিত্য-নিয়ত সেই রহস্যময় হৃদয়েশ্বরের সন্ধান পেয়েই যেন কবি বলেছেন—

আমার প্রাণের মানুষ আছে প্রাণে
তাই হেরি তায় সকল খানে।।
আছে সে নয়ন তারায় আলোক ধারায়।
তাই না হারায়—
ওগো তাই দেখি তার যেথায় সেথায়
তাকাই আমি যেদিক পানে।।

রবীন্দ্রনাথের জীবনদেবতা-তত্ত্বও লালনতত্ত্বের পরিপূরক। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন—

"আপন সত্তার মধ্যে দুটি উপলব্ধির দিক আছে। এক, যাকে বলি আমি, আর তারি সঙ্গে জড়িয়ে মিশিয়ে যা কিছু যেমন আমার সংসার, আমার দেশ, আমার ধন জন মান। এই যা কিছু নিয়ে মারামারি কাটাকাটি ভাবনা চিন্তা। কিন্তু পরমপুরুষ আছেন এই সমস্তকে অধিকার করে এবং অতিক্রম করে নাটকের স্রষ্টা ও দ্রষ্টা যেমন আছে নাটকের সমস্তটাকে নিয়ে এবং তাকে পেরিয়ে, ...সত্তার এই দুই দিককে সব সময়ে মিলিয়ে অনুভব করতে পারিনে। একলা আপনাকে বিরাট থেকে বিচ্ছিন্ন করে সুখ দুঃখে আন্দোলিত হই। তার মাত্রা থাকে না। তার বৃহৎ সামঞ্জস্য দেখিনে। কোন এক সময়ে দৃষ্টি ফেরে তার দিকে, মুক্তির স্বাদ পাই তখন .... আমার এই অনুভূতি প্রকাশ পেয়েছে জীবন দেবতা শ্রেণীর কাব্যে।'

ওগো অন্তরতম
মিটেছে কি তব সকল তিয়াষ
আসি অন্তরে মম?

আমি যে পরিমাণে পূর্ণ অর্থাৎ বিশ্বভূমিন সেই পরিমাণে আপন করেছি তাকে। ঐক্য হয়েছে

তার সঙ্গে। সেই কথা মনে করে বলেছিলাম তুমি কি খুশি হয়েছ আমার মধ্যে তোমার লীলার প্রকাশ দেখে।

বিশ্বদেবতা আছেন তাঁর আসন লোকে-লোকে, গ্রহচন্দ্রতারায়। জীবনদেবতা বিশেষভাবে জীবনের আসনে হৃদয়ে হৃদয়ে যাঁর পীঠস্থান, সকল অনুভূতি সকল অভিজ্ঞতার কেন্দ্রে। বাউল তাঁকেই বলেছে 'মনের মানুষ'। ('প্রবাসী ১৩৪০, জ্যৈষ্ঠ, মানুষের ধর্ম পৃঃ ১০-১১)

কেউ কেউ বলতে পারেন লালনের গান হলো তত্ত্বকথা—কবির বাণী নয়। কিন্তু আমরা বলব লালনের বাণী, তত্ত্ব হলেও সত্য, তাই এ কাব্য। রবীন্দ্রনাথ 'আমি' কবিতায় বলেছেন—

আমারই চেতনার রঙে পান্না হল সবুজ
চুনি উঠল রাঙা হয়ে।
আমি চোখ মেললুম আকাশে
জ্বলে উঠল আলো
পুবে পশ্চিমে
গোলাপের দিকে চেয়ে বললুম 'সুন্দর'
সুন্দর হল সে।
তুমি বলবে এ যে তত্ত্বকথা, এ কবির বাণী নয়।
আমি বলব এ সত্য
তাই এ কাব্য

লালনের গান ভাববাদ থেকে উদ্ভূত হয়ে অমূর্তভাবের দ্যোতনা জাগিয়েছে এবং গানের জগতে বৈচিত্র্যের স্বাদ এনেছে। তাঁর গান শিল্পতত্ত্ব বা সৌন্দর্য্যতত্ত্বের বিচারে অনন্যসাধারণ অভিব্যঞ্জনায় রসরূপ লাভ করেছে। লালনের গান তত্ত্ব হলেও তা শিল্প সুষমার এমন অপূর্ব অভিযোজনা লাভ করেছে যে লালন তত্ত্ব রসজ্ঞপাঠকের হৃদয় মন হরণ করে নিয়েছে।

স্থাপত্য, ভাস্কর্য, নৃত্য বা চিত্রকলার মতো সঙ্গীতও শিল্প। লালনসঙ্গীত সেদিক থেকেও শিল্পমহিমার দাবিদার। লালনের গানে দেহসাধনা, 'মানুষরতন' -তত্ত্ব প্রভৃতি এসেছে ভাবের প্রয়োজনে, কিন্তু সে তত্ত্ব শুধু তত্ত্বের খাঁচাতেই আবদ্ধ থাকেনি তা হয়ে উঠেছে শিল্পের এক অভিনব নির্দশন। একজন নিরক্ষর গ্রামের সাধারণ মানুষের মনো-জগৎ কিভাবে কাব্য চেতনায় ভরপুর হয়ে উঠেছিল তা ভাবলে অবাক হতে হয়। তিনি যেন বাংলা কাব্য-সম্পদের রত্নাকর— তাঁর মধ্যে আছে হীরা, মণি-মাণিক্য জহরতের অফুরন্ত ভাণ্ডার। তাঁর প্রতিটি গানের মধ্যেই এসব ধনরত্নের দ্যুতি বিচ্ছুরিত হয়েছে রামধনুকের শোভার মতো।

কবিতা হল সহজাত ভাবের স্বতঃস্ফূর্ত স্পন্দনের কাব্যিক আকার। অন্তরের ভাব ভাষার মাধ্যমে বাহিত হয়। লালন হলেন সেই অন্তরের, ভাবের কবি, শব্দকুশলী ভাষার কবি নন। লালন সঙ্গীতে ভাব গভীর কিন্তু তার ভাষা সহজ সরল সাবলীল। তাঁর গানের ভাষা নিজস্ব বৈশিষ্ট্যে (style) সমুজ্জ্বল, কবি হৃদয়ের উত্তাপে, ভাব-সম্পদে ঋদ্ধ। সকল কবির একটি নিজস্ব ভাষার জগৎ আছে, যেখানে তিনি অনন্য। যেমন—জয়দেব, চণ্ডীদাস, রামপ্রসাদ, ভারতচন্দ্র প্রমুখ প্রাচীন ও মধ্যযুগের কবিদের কবিভাষা স্বকীয় রূপসৌন্দর্যে দীপ্যমান, style -এ স্বতন্ত্র। আধুনিক

কবি রবীন্দ্রনাথ, জীবনানন্দ দাশ, বিষ্ণু দে, সুধীন্দ্রনাথ দত্ত, সমর সেন, বুদ্ধদেব বসু প্রমুখ, তাঁদের নিজস্ব কাব্যভাষার জগৎ নির্মাণ করেছেন, যেখানে প্রত্যেকে অন্যের থেকে স্বতন্ত্র। লালন কবিও তেমনি তাঁর কাব্যভাষা নির্মাণে একক-কৃতিত্বের দাবিদার। মাতৃভাষার প্রতি লোককবির অপরিসীম ভালোবাসা ও গভীর টান ছিল। তাঁর একটি সঙ্গীতে দেখি--

'বাংলা কেতাব দশজনে পড়ে
আরবী পারসী নাগরী বুলি
কে বুঝিতে পারে?
যদি শিখতে চাও ইংরেজদের বুলি
আগে বাংলাখান লও পাশ করে।'

লালন ভাবের কবি, ভাষার কবি নন। তবু তাঁর শিল্প চেতনায় স্বচ্ছ ভাষিকবোধ সমরূপে জাগরূক। তাঁর এই বোধ অনেকটা মিশ্র প্রকৃতির। তাই তিনিও ভারতচন্দ্রের মতো হয়তো বিশ্বাস করতেন—

উচিত সে আরবী ফারসী হিন্দুস্থানী
পড়িয়াছি সেই মত বর্নিবারে পারি
কিন্তু সে সকল লোকে বুঝিবারে ভারি।
নারবে প্রসাদগুণ না হবে রসাল
অতএব কহি ভাষা যবানী মিশাল
প্রাচীন পণ্ডিতগণ গিয়াছেন কয়ে
যে হোক্ সে হৌক্ ভাষা কাব্যরস লয়ে।।

লালন কবিরও আরবী, ফার্সী ভাষা সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান থাকা সত্ত্বেও তিনি, 'যবানী মিশাল' ভাষাই কাব্যসঙ্গীতে ব্যবহার করেছেন। কেননা তাঁরও উদ্দেশ্য ছিল ভাষাকাব্য রসলয়ে সহজ সরল মধুর ও হৃদয়গ্রাহী হয়। আধুনিক কবি জীবনানন্দের ভাষা সম্পর্কে যে অভিমত—

"মানুষের ভাষা তবু অনুভূতির দেশ থেকে আলো না পেলে নিছক ক্রিয়া; বিশেষণ ও এলোমেলো নিরাশ্রয় শব্দের কঙ্কাল, জ্ঞানের নিকট থেকে ঢের দূরে থাকে।"

(জীবনানন্দ দাশ, ১৯৪৬-৪৭)

লোককবি লালনের উপলব্ধিতে তা যেন বহু আগে অনুভূত হয়েছিল। লালন কবির ভাষা এই অনুভূতির আলোকে সঞ্জীবিত। ফলে তাঁর সঙ্গীত অন্তর্মুখী ভাবের ঐশ্বর্যে ঋদ্ধ বহির্মুখী শব্দের চাকচিক্যে ভাস্বর নয়। কবির ভাষা সহজ সরল সাবলীল, অনুভূতি নির্ভর, ভাবগম্ভীর ও বিষয়ানুগ।

লালন কবির কাব্যভাষার প্রধান ও শ্রেষ্ঠগুণ হলো তার চলিত ভাষার সহজ সরল স্বতঃস্ফূর্ত প্রাণাবেগ, জীবনস্পন্দন। কাব্যভাষার সহজতা, সরলতা ও নিরলঙ্কৃত রূপের মধ্যেই আছে, লালন কবির কাব্যভাষার বিশেষত্ব। গভীর দার্শনিক উপলব্ধিকে অতি সরল অনাড়ম্বর ভাষায় রূপদানের লিপি কৌশল চণ্ডীদাস ও জীবনানন্দের মতো লালন কবির অধিগত ছিল। যেমন—

সদায় মনের মানুষ খেলছে দ্বিদলে
জমন সওদামীনি মেঘের কোলে
নিরূপন হবে জখোন
মানুষ ধরা জাবে তখন

সাপন হবে রূপ দেখিলে।।

অথবা, *খাঁচার ভিতর অচিন পাখি*
কেমনে আসে যায়
ধরতে পারলে মনোবেড়ি
দিতাম পাখির পায়।।

বা, *মেঘের বিদ্যুৎ মেঘে যেমন*
লুকালে না পাই অন্বেষণ
কালারে হারয়ে তেমন
ঐ রূপ হেরি এ দর্পণে।

এই দৃষ্টান্তে সাধক কবির চলিত শব্দের সহজ স্বচ্ছন্দ ব্যবহারে যেমন আমরা মুগ্ধ হই—তেমনি আশ্চর্য হই কবির সহজ ভাষায় গভীর ভাবকে রূপ দানের ক্ষমতা দেখে। বলার ধরনটিও যেন তাঁর স্বচ্ছ নির্ঝরের প্রবাহ, আকাশলীনা জলদ গম্ভীর ভাবটি যেন সেই জলপ্রবাহে স্নিগ্ধ ও মধুর সঙ্গীতময়। লালন কবির ভাষার এই স্বাভাবিক স্বচ্ছন্দ লীলাচপল গতি সম্পর্কে অধ্যাপক আবদুল হাই বলেছেন—'সহজ সরল বাংলা শব্দের মধ্যে কত যে রহস্য লুকিয়ে থাকতে পারে, তাঁর গানের শব্দপ্রয়োগ ও অনায়াস বয়ন কুশলতাই সে সাক্ষ্য বহন করছে। এমন ঝরঝরে নির্ভার তদ্ভব শব্দ প্রয়োগের কারুকলা আর কোনো লোককবির গানে দেখা যায় না। লালন তাঁর সমসাময়িক এবং পূর্ব ও পরবর্তীকালের অন্যান্য লোককবির থেকে এখানেই বিশিষ্টতার দাবি করেন। সেজন্যে লালন শ্রেষ্ঠ বাউল ও লোককবি।'

লালন কবির ভাষার বিশেষত্বই হল বিষয় ও ভাব অনুযায়ী ভাষাশৈলীর প্রয়োগ। তাঁর সঙ্গীতে ইসলামী ভাবধারা ও তার মর্যাদা রক্ষার জন্য আরবী, ফার্সী, শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। হিন্দু ঐতিহ্যবাহিত সঙ্গীতে প্রযুক্ত হয়েছে তৎসম, তদ্ভব শব্দ। কবিতায় কোন্ শব্দের ব্যবহার কতটা উপযোগী কিংবা মূল শব্দের বিভাজনে অথবা দেশজ শব্দের কুশল প্রয়োগে রচনা কী পরিমাণে শ্রুতিমধুর ও হৃদয়গ্রাহী হতে পারে, লালনের শিল্প চেতনায় সেই বোধটি নীরবে সক্রিয় থাকায় তাঁর সঙ্গীতের জগৎ রসময়, শিল্পময় ও বাণীময় হয়ে উঠেছে; লাভ করেছে নিটোল কাব্যকায়া। তাঁর কাব্যে বিষয়ানুগ সহজ সরল ও সাবলীল ভাষা প্রয়োগের শিল্প সৌকর্য পাঠক চিত্তকে মুগ্ধ করে। যেমন—

এলাহি আলমনি গো আল্লাহ
বাদশাহ্ আলমপানা তুমি।

এই ভাষা যেমন বিষয়ানুসারী তেমনি ঝরঝরে ও সাবলীল। কবি-হৃদয়ের উত্তাপ এখানে সঞ্চারিত হয়েছে। এখানে কবির আরবী-ফার্সী শব্দ প্রয়োগের মুন্সীয়ানা লক্ষ্য করা যায়।

কিংবা, আপন ছুরাতে আদম গঁটলে দয়াময়।
নইলে কী ফেরেসতারে সেজদা দিতে কয়।।
আল্লা আদম না হইলে, পাপ হতো সেজদা দিলে
সেরেক পাপ যারে বলে এ দিন দুনিয়ায়।

এখানে আরবী-ফার্সী শব্দকে কবি অনন্য শৈল্পিক কুশলতায় বয়ন করেছেন।

লালন কবি যখন হিন্দু ঐতিহ্যভিত্তিক বিষয়কে সঙ্গীতে রূপ দিয়েছেন, তখন তাঁর কাব্যে তৎসম ও দেশজ শব্দের প্রাচুর্য দেখা গেছে। প্রাকৃত ও দেশজ শব্দের মিলনে গড়ে উঠেছে তাঁর শব্দজগৎ। যেমন —

অস্থি চর্ম শূন্য রূপ
তাতে মহারসের কূপ
বেগে ঢেউ খেলে।
ও তার এক বিন্দু অপার সিন্দু
হয় রে এই ভূমণ্ডলে।
উপাসনা নাই গো তার
দেহের সাধন সর্ব সার
তীর্থ ব্রত যার জন্যে
এই দেহে তার সব মিলে।

এখানে তত্ত্বব, তৎসম শব্দ প্রয়োগ এবং হিন্দু দেবতার প্রসঙ্গ বিশেষ ভাবে লক্ষণীয়। চলিত বাক্‌রীতি এবং হিন্দু - ঐতিহ্য বিষয়ে দেশজ ভাষার ব্যবহার এই অংশকে অনন্য করেছে। লালন শব্দের অর্থমাত্রা বা ভারবহনের ক্ষমতাকে উপযুক্তভাবে উপলব্ধি করেছিলেন এবং শব্দকে যথাযথভাবে প্রতিস্থাপন করেছেন — কবি যেন ওজন করে কাব্যে ভাষাকে প্রয়োগ করেছেন। এখানেই তাঁর কৃতিত্ব ও শ্রেষ্ঠত্ব।

আবার কবি যখন দেহতত্ত্ব বা সাধন পদ্ধতিকে কাব্যিক রূপ দিয়েছেন, তখন স্বাভাবিকভাবেই লেখনী মুখে এসে ভিড় করেছে তান্ত্রিক ও সাধন পদ্ধতির গূঢ়ার্থবাচক শব্দাবলী।

যেমন —

স্ত্রী-লিঙ্গ, পুং লিঙ্গ, ভবে
ন-পুংসক না সম্ভবে
যে-লিঙ্গ ব্রহ্মাণ্ড প'রে
কি দিব তুলনা তারে
রসিকজনা জানতে পারে
অরসিকে চমৎকার।।

অথবা —

অমাবস্যায় পূর্ণিমা যোগ
আজব সম্ভব সম্ভোগ
জানিলে তা খণ্ডে ভবরোগ
গতি হয় অখণ্ডদেশে।

লালন শব্দকুশলী শিল্পী না হয়েও তিনি যে সচেতনতার পরিচয় দিয়েছেন তা অবিস্মরণীয়। তিনি ভাষাকে করেছেন বিষয়মুখী এবং ভাবকে করেছেন ভাষার প্রাণ। ফলে তাঁর ভাষা হয়ে উঠেছে সজীব ও জীবন্ত।

লালনের কাব্যভাষার অনন্যতার প্রধান কারণ তার সুর ও স্পন্দন। এ ভাষা সজীব প্রাণবান, প্রাণের আবেগ ও অনুভূতিকে প্রাণের ভাষায় তুলে ধরেছেন লোককবি লালন। তাঁর কাব্যভাষার এই বিশেষ গুণ রবীন্দ্রনাথকে মুগ্ধ করেছিল; লালনের গানের ভাষার প্রশংসায় 'ছন্দ'-এ তিনি বলেছেন —

"ভাষার শব্দে অর্থ আছে, সুর আছে। অর্থ জিনিসটা সকল ভাষাতেই এক, সুরটা প্রত্যেক ভাষাতেই স্বতন্ত্র। 'জল' শব্দে যা বোঝায় 'ওয়াটার' শব্দেও তাই বুঝি, কিন্তু ওদের সুর আলাদা। ভাষা এই সুর নিয়ে শিল্প রচনা করে, ধ্বনির শিল্প। সেইরূপ সৃষ্টির যে ধ্বনিতত্ত্ব বাংলা ভাষার আপন সম্বল, পণ্ডিতেরা তাকে অবজ্ঞা করতে পারেন। কেননা তাঁরা অর্থের মহাজন, কিন্তু যাঁরা রূপরসিক তাঁদের মূলধন ধ্বনি। প্রাকৃত বাংলার দুয়োরানীকে যাঁরা সুয়োরানীর অপ্রতিহত প্রভাবে সাহিত্যের গোয়ালঘরে বাসা না দিয়ে হৃদয়ে স্থান দিয়েছে সেই অশিক্ষিত লাঞ্ছনাধারীর দল যথার্থ বাংলা ভাষার স্পন্দন নিয়ে আনন্দ করতে বাধা পায় না। তাঁদের প্রাণের গভীর কথা তাঁদের প্রাণের ভাষায় উদ্ধৃত করে দিই।

'আছে যার মনের মানুষ আপন মনে,
সে কি আর জপে মালা!
নির্জনে সে বসে বসে দেখছে খেলা।....
ওরে লালন ভেড়োর লোক দেখানো
মুখে হরি হরি বলা।'

আর একটি, —

এমন মানব জনম আর কি হবে
যা কর মন ত্বরায় কর, এই ভবে।....

এই ছন্দে ভাষা একঘেয়ে নয়। ছোট বড় নানা ভাগে বাঁকে বাঁকে চলেছে। সাধু প্রসাধনে মেজেঘষে এর শোভা বাড়ানো চলে, আশা করি এমন কথা বলবার সাহস হবে না কারো। এই খাঁটি বাংলার সকল রকম ছন্দেই সকল কাব্যই লেখা সম্ভব, এই আমার বিশ্বাস। ....

এই যে বাংলা বাঙালীর দিনরাত্রির ভাষা, এর একটা মস্ত গুণ—এ ভাষা প্রাণবান। এইজন্য সংস্কৃত বল, ফারসী বল—ইংরাজী বল, সব শব্দকেই প্রাণের প্রয়োজনে আত্মসাৎ করতে পারে। হিন্দী ভাষারও সেই গুণ। যাঁরা হেডপণ্ডিত মশাইয়ের কাছে পড়েনি তাঁদের একটা লেখা তুলে দিই। —

চক্ষু আঁধার দিলের ধোঁকায়
কেশের আড়ে পাহাড় লুকায়
কি রঙ্গ সাঁই দেখছ সদায়
বসে নিগম সাঁই

প্রাকৃত বাংলাকে গুরুচণ্ডালী দোষ স্পর্শ করে না। সাধু ছাঁদের ভাষাতেই শব্দের মিশাল সয় না।"

'কাব্যং গ্রাহ্যাং অলঙ্কারাৎ' — অলঙ্কার শাস্ত্রের এই কাব্য-সংজ্ঞা বহুকাল আগেই খণ্ডিত হয়েছে। অলঙ্কার বহুল বাক্যও কাব্য হয়নি আব নিরলঙ্কার বাক্যও যে কাব্য হতে পারে সে দৃষ্টান্ত

আলঙ্কারিকেরা দিয়েছেন। অলঙ্কারশাস্ত্রকে অস্বীকার না করেও যে কাব্য রচনা সম্ভব তা এ যুগের অনেক কবিই মনে করেন। তাই কবি বুদ্ধদেব বসুকে বলতে শুনি —

"তথাকথিত অলঙ্কারগুলোকে সম্পূর্ণরূপে বর্জন করেও মহৎ কবিতা সম্ভব হতে পারে, এবং ভালো কবিতায় যখনই এদের ব্যবহার হয় তখনই এরা অলংকার মাত্র থাকে না, অপরিহার্য অঙ্গ হয়ে ওঠে। কবিতাকে আমরা একটি অখণ্ড সত্তা বলে ধারণা করি, তাতে আদর্শ অনুসারে, এমন কিছুই থাকবে না, যা তার হয়ে ওঠার পক্ষেই প্রয়োজন ছিলো না, শুধু শোভা বৃদ্ধির জন্য যোগ করা হয়েছে।"

এখানে বোঝা যাচ্ছে অলংকার কাব্যের দেহসৌন্দর্যের গৌণ উপাদান। অলংকার ছাড়াও কাব্য সৌন্দর্য মণ্ডিত হয়ে উঠতে পারে যে সব গুণের জন্য, তা হলো চিত্রময়তা, সঙ্গীত,ধর্ম, বাগ্‌ভঙ্গি, ছন্দের বিচিত্র দোলা, সুভাষণ বা প্রবাদ প্রবচন প্রভৃতি কাব্য সম্পদের নানা উপকরণ। লালনের গানে এসব উপাদান ছড়িয়ে আছে বাংলাদেশের মল্লিকা-যূথিকার মতো।

লালনের গানে চিত্রধর্মীতা ফুটে উঠেছে সুললিত শব্দ চয়ন ও বয়ন দক্ষতার অপূর্ব মহিমায়। যেমন —

ক. দেখতে শোভা যেন অমনি
তারার মালা চাঁদের গলে।।

— তারার মালা চাঁদের গলায় পরালে যেমন চিত্র ফুটে ওঠে শোভাটি দেখতে তেমনি অপরূপ।

খ. 'কিবা রূপের ঝলক দিচ্ছে দ্বিদলে
রূপ দেখলে নয়ন যায় ভুলে
ফনী মণি সৌদামিনী —
জিনি এরূপ উজলে।'

— দ্বিদল পদ্মে আত্মার অবস্থান, তার জ্যোতির্ময় রূপ দেখলে নয়ন পরিতৃপ্ত হয়। সাপের শিরে যে মণি থাকে কিংবা সৌদামিনী বা বিদ্যুতের ঝলকের নয়ন ঝলসানো রূপকে জয় করে নিতে পাবে, এমনই উজ্জ্বল রূপে বিরাজ করছে পরমাত্মা।

গ. 'যেমন নিকট থেকে দূরে দেখায়
মেঘের আড়ে পাহাড় লুকায়।'

— মেঘাবৃত গগন দূর থেকে দেখে মনে হচ্ছে মেঘের আড়ালে পাহাড় লুকাচ্ছে — নভোমণ্ডলের এই চিত্রকল্প সত্যিই নয়ননন্দিত।

ঘ. মাকাল ফলটি রাঙাচোঙা
তাই দেখে মন হলি ঘোঙা
লালন কয় তা'লো ডোঙা
কোন ঘড়ি ডোবে তুফানে।।

— মাকাল ফলের অপরূপ চিত্রকল্প ফুটে উঠেছে এখানে। সঙ্গে এসেছে তালগাছের তৈরি ডোঙা এবং ঊর্মিমুখর জলরাশির বিপদসঙ্কুল তুফানের চিত্র।

ঙ. রাই সাগরে নামল শ্যাম রায়

তোরা ধরগো হরি ভেসে যায়।।

— খরস্রোতা নদীতে শ্যামরায় ভেসে যাওয়ার চিত্র অপূর্ব — তাকে ধরার পরামর্শ ও ব্যাকুলতার আকুতি ও নিবিড়।

চ. চাঁদেতে চাঁদের আসন
রেখেছে ফিকিরে
চাঁদে চাঁদে ঢাকা দেওয়া
চাঁদে চাঁদে চাঁদের খেওয়া (দেয়রে)
জমিনেতে ফেলছে মেওয়া
ঐ চাঁদের সুধা ঝোরে।

— চাঁদের উপর চাঁদ আসন পেতেছে এবং চাঁদ যেন খেয়া পারাপার করছে এবং তা থেকে মাটিতে সুধা ঝরে পড়ছে। এইসব চিত্রকল্প যেমন আমাদের চোখের সামনে দৃষ্টিগ্রাহ্য বাস্তব মনোহর চিত্র ফুটিয়ে তোলে তেমনি অধ্যাত্মগামী সোপান বেয়ে আমাদের নিয়ে যায় রহস্যময় মিষ্টিক জগতে।

ছ. আমি একদিনও না দেখিলাম তারে।।
বাড়ির কাছে আরশী নগর পরশী বসত করে।।
গেরাম বেড়ে অগাধ পানি,
নাই কিনারা নাই তরণী পারে।
বাঞ্ছা করি দেখব তারে
কেমন সেথা যায় রে।।
কি কব পড়শীর কথা
হস্তপদ স্কন্দ মাথা নাইরে।
ক্ষণেক থাকে শূন্যের উপর
ক্ষণেক ভাসে নীরে।।
পড়শী যদি আমায় ছুঁতো
যম যাতনা সকল যেতো দূরে।
সে আর লালন একখানে রয়
লক্ষ যোজন ফাঁক্‌রে।।

— এখানে চিত্রকল্প সত্যই অতুলনীয়, কবি-কল্পনাও অনুপম — যা আমাদের মুগ্ধ করে। এই অপূর্ব শৈল্পিক মহিমা লালনকে কবি করে তুলেছে।

লালন গীতিতে শুধু চিত্রকল্প নয়, অপূর্ব সঙ্গীতময়তাও লক্ষ্য করার মতো। ধ্বনির সুষম অবস্থান ও ব্যঞ্জনা, গানের বিশেষ অপরিহার্য অঙ্গ। লোককবি লালনের গানে এই গুণ ব্যতিক্রমী দৃষ্টান্ত। সমকালে অন্যান্য লোককবি কিংবা শিষ্ট কবিদের অনেকের মধ্যেই লালনের মতো শব্দ চয়ন ও ধ্বনি মহিমা ছিল না।

সমকালীন কবিগানের তাৎক্ষণিক বিনোদনের ভাষা কিংবা আখড়াই, হাফ - আখড়াইয়ের অশ্লীল — আবিলতাপূর্ণ গানের ভাষা ও আঙ্গিকই তার উৎকৃষ্ট প্রমাণ। কিন্তু লালনের - রুচিবোধ শব্দচয়নের নিপুণতা, কথা ও সুরের হর-গৌরী সম্মিলন প্রভৃতি তাঁকে বিশিষ্ট কবির গৌরবে ভূষিত

করেছে।

সহজ - সরল ভাবের কবি চণ্ডীদাসকে বাদ দিলে মধ্যযুগের বেশির ভাগ কবির গানই একা সুর নির্ভর, রামপ্রসাদের গানও এই একই সূত্রে গ্রথিত। কিন্তু লালনের গানের সুর বাদ দিলে তা উৎকৃষ্ট কাব্য সম্পদের স্বাদ এনে দেয়—তা হয়ে ওঠে এক একটি শ্রেষ্ঠ কবিতা। নিম্নের উদাহরণগুলি তারই প্রমাণ

১. 'অনুভবে ভেবে কতই করি সার।
রোহিণী চাঁদের উত্তম কি চাঁদ আছে আর।।
চাঁদে চাঁদ হরণ,
সেই বা কেমন,
ভক্তিহীন লালন
বসে ভাবে তাই।।'

২. মোহাম্মদ জন্মলতা
নবী হলেন ধর্মপিতা
লালন বলে এই তো পতা
রাছুলউল্লাহ ফানা ফিল্লাহ
আল্লাহতে মিশে রয়।।

৩. বারিতে ব্রহ্মাণ্ডের জীবন
বারিতে হয় পাপ বিমোচন
হয় সরারি।
দরবেশ সিরাজ বলে লালন
চিনে তার মহাজন
থাক নেহারি।।

৪. অমাবস্যায় পূর্ণিমা যোগ
আজব সম্ভব সম্ভোগ
জানিলে তা খণ্ডে ভবরোগ
গতি হয় অখণ্ড দেশে।।

৫. পূর্ণচন্দ্র কৃষ্ণ রসিক সেজন
শক্তিতে উদয় শক্তিতে সৃজন
মহাভাবে সর্বচিত্ত আকর্ষণ
বৃহদাগমে তারে বিষ্ণুবলা।

এইভাবেই সুরকে বাদ দিয়েও শুধু শব্দচয়ন ও বিষয়ানুসারে তা প্রয়োগের নৈপুণ্যেই লালন সঙ্গীত শ্রেষ্ঠ কবিতা হয়ে উঠেছে।

শুধু ভাষা গৌরব নয়, ভাবের গভীরতা ও লালন সঙ্গীতের অনন্য কাব্য সম্পদ। লালনের গান অধ্যাত্ম চেতনা সমৃদ্ধ, তত্ত্বদর্শনে ভরপুর, কিন্তু তাঁর কবিপ্রাণের যাদু স্পর্শে তত্ত্বকথা আচ্ছন্ন হয়ে পড়েছে। আর সহজ সরল কথার মধ্যে গভীর ভাব ধরা পড়েছে কাব্যসুষমায়। যেমন —

'মেঘের বিদ্যুৎ মেঘে যেমন
লুকালে নাই পাই অন্বেষণ
কালারে হারায় তেমন
ঐ রূপ হেরি এ দর্পণে।।

— এখানে কাব্য, তত্ত্ব, দর্শন সবই মিলে মিশে একাকার হয়ে গিয়েছে। সরল ভাষার ছাঁচে গভীর ভাব নতুন মূর্তি নিয়েছে।

শুধু তাই নয় লালন যেখানে জাত নিয়ে আলোচনা করেছেন, সেখানেও কবি লালনকে চিনে নিতে অসুবিধা হয় না। যেমন —

সব লোকে কয় লালন কি জাত সংসারে।
লালন বলে জাতের কি রূপ,
দেখলাম না দুই নজরে।।
যদি সুন্নত দিলে হয় মুসলমান
নারী লোকের কি হয় বিধান
বামন চিনি পৈতায় প্রমাণ
বামনী চিনি কিসে রে।।
কেউ মালা কেউ তসবী গলে
তাইতে কি জাত ভিন্ন বলে
আসা কিংবা যাবার কালে
জাতির চিহ্ন রয় কারে।।
জগত বেড়ে জাতির কথা
লোকে গৌরব করে যথাতথা
লালন বলে জাতির ফাতা
ডুবাইছি সাধ-বাজারে।।

— বক্তব্যের এই প্রাঞ্জলতার মধ্যেই কবির অনন্যতাকে বুঝে নেওয়া যায়। এখানে এ সংকীর্ণ জাতিভেদের ঊর্ধ্বে কবির গভীর মানব প্রেম কাব্যবাণী লাভ করেছে।

লালন সঙ্গীতে ছন্দের বিচিত্র দোলাও লক্ষ্য করার মতো, বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথও একথা ঘোষণা করেছেন। লালন সঙ্গীত থেকে উদ্ধৃতি দিয়েই রবীন্দ্রনাথ প্রাকৃত ছন্দের আলোচনা করেছেন। মাইকেল মধুসূদন দত্তের 'মেঘনাদবধ' কাব্য যে বিদেশী ভাষার কাঠামো ধার না করে লালন-ভাষাতে লেখা যেতো। এবং লিখলে তা উৎকৃষ্ট কাব্যই হতো। একথা 'ছন্দ' গ্রন্থে বলেছেন কবিগুরু — "এই প্রাকৃত বাংলাতে মেঘনাদ বধ কাব্য লিখলে যে বাঙালীকে লজ্জা দেওয়া হতো, সে কথা স্বীকার করব না।" বিশ্ব কবির প্রশংসা ধন্য লালনের কাব্য-ছন্দ তাই সাহিত্যিক ক্ষেত্রে বিশেষ কৃতিত্বের দাবি করতে পারে।

লালন সঙ্গীতের নির্মাণ কৌশল বেশ চমৎকার। তাঁর গানে সাধারণত প্রথম ছত্রটি মুখ বা ধরন, তার পরেই থাকে আরেকটি ছত্র, একে বলা হয় কোল অন্তরা এবং অবশিষ্ট তিন বা চারটি সম-আকারের অন্তরা থাকে। যেমন —

(ধরন) সুভাব দাও আমার মনে।।
(কোল অন্তরা) তোমার চরণ যেন ভুলিনে।।
(অন্তরা) তুমি নিদয় যার প্রতি
তার সদায় ঘটে কুমতি
তুমি মনোরথের সারথি
যথা লও যাই সেইখানে।।

লালন সঙ্গীত বৈচিত্র্যময়। এখানে আছে বিচিত্র রকমের গঠন - কাঠামো। দুই পংক্তি থেকে আট পংক্তি পর্যন্ত আকৃতি বিশিষ্ট গানগুলি পয়ার থেকে সমিল মুক্তক ছন্দ পর্যন্ত প্রসারিত হয়েছিল। রবীন্দ্রনাথের বলাকা লালনের এই মুক্তক ছন্দের আদর্শেই রচিত। লালন তাঁর কাব্যদেহের আঙ্গিক রচনায় যেমন ছিলেন স্বচ্ছন্দ তেমনি ছিলেন স্বাভাবিক। তাই তাকে কষ্ট করে, চেষ্টা করে, কৃত্রিম কাব্য দেহ গঠন করতে হয়নি। তাঁর সব কাব্যই হৃদয়ের স্বতঃস্ফূর্ত আবেগ থেকে উৎসারিত। তাঁর গানের আঙ্গিকসজ্জা উদ্ধৃতি দিয়ে বোঝানো যেতে পারে।

১. আপন খবর না যদি হয়
যার অন্ত নাই, তার খবর কে পায়?

২. যেতে চাও মক্কা
যদি পাও ধাক্কা
ফিরে দাড়াও তৎক্ষণাৎ

৩. মৃণাল কান্তি রসের খেলা
নব ঘাট নব ঘাটেলা
দশম যোগ বারিতালা
যোগেশ্বর তা জানি।

৪. বেশরা নেয়ে যারা
তুফানে যাবে মারা
এক ধাক্কায় —
তখন নায়ের বদর গাজী
থাকবে কোথায়?

৫. যৌবন কালের কালে
রঙ্গে দলি মন
দিনে দিনে হারালি পিতৃধন।
গেল রবির জোর
আঁখি হলো ঘোর
কোন দিন ধরবে মহাকালে এসে।।

৬. মানুষ - গঙ্গা গভীর অঠাই
নাই দিশে তাই

প্রেম রসিক ভাই
ভেবে সিরাজ শহের চরণ
ম'জেছে লালন
আমি চুবনি খেলাম
যেয়ে সেই কিনার।

৭. প্রহ্লাদ চরিত্র ছিল
দৈত্য ধামে
কতো কষ্ট পেল প্রহ্লাদ
সেই কৃষ্ণ নামে।
হস্তীর পদতলে দিল
তারে অনলে ডালিল
তবু না ভুলিল প্রহলাদ
শ্রীরূপ সাধনা।।

৮. ক্ষ্যাপা'
'তুই না জেনে তোর
আপন খবর
যাবি কোথায়?

— উদ্ধৃত আট রকম স্তবক নির্মিতির মধ্য দিয়ে বৈচিত্র্যের স্বাদ মেলে। ছন্দ অনুযায়ী পংক্তি সজ্জা ও স্তবক নির্মাণ লালনের সহজাত কবি প্রতিভারই প্রকাশ।

লালন সঙ্গীতের সুরমূর্ছনা, গায়নরীতি, বিশ্বজনীন অনুভূতি এবং মর্মস্পর্শী মানবিক আবেদন হিন্দু-মুসলমান, ধনী-দরিদ্র, উচ্চ-নীচ সকল শ্রেণীর মানুষের হৃদয়মন মাতিয়ে আবেশ বিহ্বল করে তোলে। লালন সঙ্গীতের মধ্যে বৈষ্ণব পদাবলীর ভাব, শক্তিগীতির অভিব্যঞ্জনা, ধুয়া-গানের আমেজ, দেহতত্ত্ব মূলক বাউল গানের গতিময় সুর এবং অন্যানা লোকগীতির ভাব ও সুরমূর্ছনা সম্পৃক্ত হয়ে বিচিত্র স্বাদ এনে দিয়েছে, তা কাব্য-সম্পদরূপে অনন্য হয়ে উঠেছে।

আধুনিক কবিসাহিত্যিকদের অনেকেই লালন সঙ্গীতের মধ্যে আরোপিত বাউল সুরে মোহিত হয়েছেন। রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং ফকিরীগানের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন, তিনি বলেছেন —

"বহুকাল পূর্বে এক বৈরাগীর মুখে শুনেছিলাম — আমি কোথায় পাব তারে, আমার মনের মানুষ যে রে। সে আরো গেয়েছিল — আমার মনের মানুষ যেখানে কোন সন্ধানে যাই সেখানে। এই কথাগুলো আজ পর্যন্ত আমার মনের মধ্যে ঘুরে বেড়াচ্ছে।"

— প্রথম গীতিছত্রটি গগন হরকরার আর দ্বিতীয়টি লালন শাহ্ রচিত। লালনের গান বিশ্ব কবির মনের রাজ্যে ঘুরে বেড়াবার মতোই হৃদয়গ্রাহী। এখানে লালনের ভাবসম্পদ ও কাব্যসম্পদ প্রশংসনীয়। লালন-সঙ্গীতে আরোপিত বাউল সুরে রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত মোহিত হয়েছিলেন। তিনি বলেছেন — " আমার অনেক গানেই আমি বাউলের সুর গ্রহণ করেছি। এবং অনেক গানে অন্য রাগ-রাগিণীর সাথে আমার জ্ঞাত-অজ্ঞাত সারে বাউল সুরের মিল ঘটেছে। এর থেকে বোঝা যাবে বাউল সুর ও বাণী কোন এক সময়ে আমার মনের মধ্যে সহজ হয়ে মিশে গেছে।"

— রবীন্দ্র প্রতিভায় যে সঙ্গীত প্রভাব বিস্তার করতে পারে, তার কাব্য গুণ যে কী গভীর ব্যঞ্জনাপূর্ণ হতে পারে তা ব্যাখ্যা করে বোঝাবার দরকার নেই। এখান থেকে বোঝা যায় লোক কবি হয়েও লালন কেন আজও এত জনপ্রিয়।

লালন ব্রাত্য লোকায়ত কবি হলেও তাঁর কাব্যদেহ সুসজ্জিত হয়েছে নানা রকমের অলঙ্কারে - যা তাঁর গানকে মনোরম ও আকর্ষণীয় করে তুলেছে। কাব্যকলাবিদরা মনে করেন যে ভাষাছন্দের চেয়ে অলঙ্কারই বেশি আকর্ষণীয়। কাব্যের রসানুভূতির অন্যতম বিষয় হলো বিভাব, অনুভাব, সঞ্চারীভাব এবং স্থায়ীভাব। স্থায়ীভাব উৎপন্ন হয় বিভাবের কারণে। আলম্বন বিভাব ও উদ্দীপন বিভাব—এই দুই শ্রেণীতে বিভাবকে বিভক্ত করা হয়ে থাকে। মনে সুখ উদ্দীপ্ত হয়ে যাকে আলম্বন করে, তাকে বলে অনুভাব। আর যে ভাব মানবচিত্তে কখনো আবির্ভূত ও কখনো অন্তর্হিত হয়, তাকে বলে সঞ্চারীভাব। আর যখন রতি, উৎসাহ, ক্রোধ, হাস্য, বিস্ময়, জুগুপ্সা, শোক, ভয়, শম ইত্যাদি নয়টি ভাব কঠিন ভাবে মানবমনে স্থায়িত্ব লাভ করে তখন তাকে বলে 'স্থায়ীভাব'। লালন সংস্কৃত অলঙ্কার শাস্ত্রে নির্দেশিত নিয়ম-বিধি মেনে সচেতনভাবে কাব্য রচনা করেননি। তবু তাঁর কাব্যে স্বতঃস্ফূর্তভাবে শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য মধুর প্রভৃতি বিশেষ বিশেষ রসের সঞ্চার হয়েছে। উদাহরণ হিসাবে নিম্নের সঙ্গীতগুলি বিশ্লেষণ করা যেতে পারে :

'কি সাধনে আমি পাই গো তারে।
ব্রহ্মা - বিষ্ণু ধ্যানে পায় না যারে।।
শূন্যে শিখর যার নির্জন গোফা,
স্বরূপে সেই তো চাঁদের আভা,
আভা ধরতে চাই,
হাতে নাহি পাই,
কেমনে সে রূপ যায় গো সরে।।
জেনে মাত্র ভাস কেহ কেহ কয়,
পঞ্চ তান্ত্রিক হলে সেই তারে পায়
পঞ্চ তন্ত্রের ঘর,
আনন্দ নিকর,
নিরপেক্ষ তৈ ছে হয় বিচারে।।
গুরুপদে যদি হতো মরণ,
তবে বুঝি সার হইত সাধন,
ভাবিয়া লালন,
কহে ওরে মন,
আমার ভাগ্যে তা তো ঘটল নারে।।'

— বিশিষ্ট লালন-গবেষক ডক্টর এস. এম. লুৎফর রহমান সঙ্গীতটি বিশ্লেষণ করে

বলেছেন —

"কবিতাটির মূল রস শান্ত, স্থায়ীভাব রতি, আলম্বন আভা, উদ্দীপন সাধনা, অনুভব মরণ এবং সঞ্চারীভাব নয়টি। সেগুলো যথাক্রমে —

চিন্তা - ক. কি সাধনে আমি পাই গো তারে।

খ. ভাবিয়া লালন কহে ওরে আমার মন।

স্মৃতি—ব্রহ্মা বিষ্ণু ধ্যানে পায় না যারে।

মতি—শূন্য শিখর যার নির্জন গোফা।

আবেগ—আভা ধরতে চাই।

চপলতা—হাতে নাহি পায়,

কেমনে সেরূপ যায় গো সরে।

অবহিত্থা—জেনে মাত্র ভাস কেহ কেহ কয়,

পঞ্চ তান্ত্রিক হলে সেই তারে পায়।

বিতর্ক—পঞ্চতত্ত্বের ঘর

আনন্দ নিকর

নিরপেক্ষ তৈ ছে হয় বিচারে।

ঔৎসুক্য—গুরুপদে যদি হতো মরণ

তবে বুঝি সার হইত সাধন।

বিষাদ—আমার ভাগ্যে তা তো ঘটল নারে।

উদ্ধৃত গানটিতে তেত্রিশ প্রকার সঞ্চারীভাবের মধ্যে নয় প্রকার ভাবের প্রকাশ ঘটেছে। এভাবে দাস্য রসের উদাহরণ স্বরূপ লালন শাহের 'পার কর দয়াল আমায় কেশে ধরে', সখ্য রসের উদাহরণ স্বরূপ 'আর কি আসবে সেই গোরাচাঁদ এই নদীয়ায়,' বাৎসল্য রসের উদাহরণ স্বরূপ 'কিভাব নিমাই তোর অন্তরে', মধুর রসেব উদাহরণ স্বরূপ 'ধন্য ভাব গোপীর ভাব আ মরি মরি' ইত্যাদি গানের উল্লেখ করা যায়।'

লালন সঙ্গীত শব্দালঙ্কার ও অর্থালঙ্কারে ভরপুর, নারীর সৌন্দর্য বৃদ্ধির মতো যা কাব্যদেহের সৌন্দর্য বৃদ্ধি করেছে। ফলে লালন সঙ্গীত হয়েছে আকর্ষণীয় ও মনোরম। যেমন —

১। অনুপ্রাস

ক. পাখী কখন জানি উড়ে যায়।

বদ হাওয়া লেগে খাঁচায়।।

খাঁচায় আড়া পল ঢসে

পাখী আর দাঁড়াবে কিসে

ঐ ভাবনা ভাবছি বসে

চমক জরা বইছে গায়।

(অন্ত্যানুপ্রাস)

খ. আকার আকার নয়, নিরাকার।

(বৃত্তানুপ্রাস)।

২। যমক — যাদের সঙ্গে রঙ্গে রলি চিরকাল

কালাকালে তারাই হবে কাল।

৩। শ্লেষ — কেন মলি রে মন

ঝাঁপ দিয়ে তোর বাপের পুকুরে।

৪। রূপক — ক. অহিমুণ্ডে উভয় যদি

হিংসা ছেড়ে হয় পীরিতি

লালন কয় সুধা নিধি

খেলে অমর হয় সে রে।

—সাপ ও ব্যাঙ এখানে কাম ও প্রেমের রূপক।

খ. অমাবস্যায় চাঁদের উদয়

দেখিতে যার বাসনা হয়

লালন বলে থেকো সদায়

ত্রিবেণীর কিনারে বসে।

রূপকার্থে অমাবস্যা এখানে কামের প্রতীক, চাঁদ প্রেমের।

গ. লাগলো ধূম প্রেমের থানাতে।

মন চোরা পেয়েছে ধরা রসিকের হাতে।।

ভক্তি জমাদারের হাতে

দুদিন চোর জিম্মা থাকে

তিন দিনের দিন দেয় সে চালান

আষ্ঠে পিষ্ঠে বেঁধে।।

ঘ. খাঁচার ভিতর অচিন পাখি

কেমন আসে যায়।

ধরতে পারলে মনো বেড়ী

দিতাম পাখির পায়

৫। উপম— ক. চাতক স্বভাব না হলে।

অমৃত মেঘের বারি কথায় কি মেলে।।

— এখানে চাতকের প্রকৃতিকে উন্নততর মানব প্রীতির সঙ্গে, মেঘের পানিকে স্বর্গীয় সুধার সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে।

খ. স্বরূপের ঘরে অটল রূপ বিহারে

চেয়ে সখী দেখনা তোরা।

ফণীর মণি জিনি, রূপের বাখানি

দুই রূপে এক রূপ হল করা।।

— এখানে সাপের মাথার মণি থেকে বিচ্ছুরিত জ্যোতির সঙ্গে ঐশী জ্যোতির তুলনা করে বক্তব্য পেশ করা হয়েছে।

গ. আশেকের মাশুক নামাজ

যাতে রাজী - সাঁই বেনিয়াজ

— এখানে মাশুক বা প্রেমকে নামাজ বা উপাসনার সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে।

৬। উপমা-রূপকের মিলিত ব্যবহার —

ক. সোনার কটুরী কোটা রে মন

সোনার খাট পালঙ্ক যেমন

শেষে হবে সব অকারণ

সার এই মাটির বিছানা।।

ঈমান ধন আখেরের পুঁজি

সে ঘরে দিলে না কুঞ্জি

লালন বলে হারলে বাজী

শেষে কাঁদলে সারবে না।।

খ. 'শরিয়ত আর মারফত যেমন

দুগ্ধেতে মিশান মাখন

মাখন তুললে দুগ্ধ তখন

ঘোল বলে তা জানে সবাই।।

মারফত মূল বস্তু-বাণী

শরিয়ত তার সরপোষ খানি

সার বস্তু পাওয়া যায়।।

আওল আক্কেল দরিয়া
দেখ না মন তাতে ডুবিয়া
মুরশিদ ভজন যে লাগিয়া
লালনের ভুল হয় সদায়।।'

— এখানে শরিয়ত এবং মারফতকে দুধ ও মাখনের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে। দুধে মাখন মিশানো থাকে, কিন্তু মাখন তুলে নিলে যেমন ঘোল অবশিষ্ট থাকে তেমনি মারফতই মূল বস্তু বাণী তাকে তুলে নিলে শরিয়ত শুধু পড়ে থাকে। এখানে উপমা অলঙ্কার রয়েছে।

আবার 'আক্কেল দরিয়া' বা হৃদয়রূপ সাগরে মনকে ডুব দিতে বলা হয়েছে। এখানে হয়েছে রূপক।

এইভাবে উপমা-রূপকের চমৎকার প্রয়োগে ধর্মতত্ত্বের প্রকাশ ঘটেছে।

৭। উৎপ্রেক্ষা— বলবো কি সেই ফাঁদের কথা,
কাক মারতে কামান পাতা।

৮। অতিশয়োক্তি— লালন মল জল পিপাসায়
কাছে থাকতে নদী মেঘনা।
হাতের কাছে ভরা কলস
তৃষ্ণা মেটে না।।

৯। বিশেষোক্তি— হারালে চায় পেলে লয়না।
ভব জীবের ভ্রান্তি যায় না।

১০। অসঙ্গতি— মায়েরে ভজিয়ে হয়
সে বাপের ঠিকানা।

১১। বিভাবনা— যা ছুঁইলে প্রাণে মরি
এ জগতে তাইতে তরি।

১২। কারণমালা— লোভে - পাপ, পাপে মরণ।

১৩। বিরোধাভাস— মন রে বোঝাতে আমার
দিন হলো আখেরী।
বোঝে না মন আপন মরণ
একি অবিচারী।

১৪। ব্যাজস্তুতি—ক. লালন বলে আমি পামর
তাইতে দোহাই দেহ বটে।

খ. ব্রহ্মা - বিষ্ণু আর নারানে
ম'লো মাগীর বোঝা টেনে
তাই না বুঝে আম লোকে
বাধালো ঠকটকি।।
মাগীর দায় নন্দের বেটা
বাধালো লটাপটা

মহেশ্বর মাগীর দাসী
মাগীর দায় শিব শ্মশানবাসী
সিরাজ শা' কয় লালন তুমি
কিসের বৈরাগী।।

এইভাবে বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে বিভিন্ন অলঙ্কারের উপযুক্ত সন্নিবেশের মাধ্যমে ভাব এবং তত্ত্বের যেমন সঠিক অভিব্যক্তি ঘটেছে তেমন তাঁর গীতিমালা মাধুরীময় হয়ে উঠেছে। মাইকেল মধুসূদন ও রবীন্দ্রনাথের মতোই লালনগীতিও ছন্দ - অলঙ্কারের বিচিত্র সম্ভারে সমৃদ্ধ, যা বাংলা কাব্যভাণ্ডারের অমূল্য রত্ন। এখানেই লোককবি লালনের অনন্যতা। মুহম্মদ মনসুরউদ্দীন বলেছেন —

"কাব্যের ও তথ্যের অপূর্ব সমাবেশ লালন সঙ্গীতে দেখতে পাওয়া যায়। তাঁর সমকালীন কোন মুসলমান কবির রচনায় এত উন্নত চিন্তা ও উপমার সুকুমারতা দেখতে পাওয়া যায় না। তিনি অজস্র উপমা তাঁর রচনায় ব্যবহার করেছেন।"

— এখানেই মরমী কবি লালনের বিশিষ্টতা।

লালন সঙ্গীতে প্রবাদ - প্রবচনেরও সার্থক সমন্বয় ঘটেছে। লালন ভাবের কবি, তাঁর কাব্যজগৎ ভাষার শিল্প সৌকর্যে দৈনা হলেও ভাবের ঐশ্বর্যে ঋদ্ধ। কেননা তিনি আপন সহজ আধ্যাত্মিক উপলব্ধিজাত বোধকে জনসাধারণের অমার্জিত ভাষায় কাব্য রূপ দান করেছেন। তিনি লৌকিক জীবন থেকে উপাদান ও উপকরণ নিয়ে আপন বোধ ও বোধির সংমিশ্রণে নির্মাণ করেছেন তাঁর কাব্যমহল। ফলে তাঁর কাব্যভুবনে একদিকে যেমন লোকজীবনের বিশ্বাস-অবিশ্বাস, সংস্কার-কুসংস্কার, আচার রীতিনীতি বিদ্যমান, তেমনি লোকসমাজ নির্মিত প্রবাদ প্রবচন, সুভাষণও বর্তমান। লালন ফকিরের বাউল সঙ্গীতে অজস্র প্রবাদ-প্রবচন বা বাগধারা মণিমুক্তার মত ইতস্ততঃ ছড়িয়ে আছে আর এই সকল বাগ্‌ধারা সুভাষিতের মধ্যে লুকিয়ে আছে মানবজীবনের ইতিহাস—বহু চিরন্তন জীবন ও সমাজ-সত্য।

এইসব সুভাষিত লোকমুখে আজো প্রচলিত। কিন্তু তাদের রচয়িতার নাম প্রায় অজ্ঞাত। কেননা লোকজীবনের কোন উপাদানই ব্যক্তির নয়, সমষ্টির। আর এই সুভাষিত বা প্রবচনও সমগ্র লোকসমাজের, ব্যক্তি বিশেষের নয়।

প্রবাদ প্রবচন বা চিরায়ত বাণী বা সূক্তি ব্যবহার মহৎ কবিতার বৈশিষ্ট্য। এর সুচারু বা যথাযথ প্রয়োগ কবিতাকে প্রসারিত, হৃদয়বেদ্য মনোরম করে তোলে. আর কবিতার প্রতি সহৃদয় পাঠকের সৃষ্টি হয় প্রসন্ন অনুরাগ। লালন শাহের গানে তন্বী কবিতার এই লক্ষণ অনন্য শৈল্পিক সৌন্দর্যে প্রস্ফুটিত হয়ে উঠেছে। বাংলার কবি তাঁর কাব্যে শুধু প্রচলিত প্রবাদ-প্রবচনই হৃদয়রসে জারিত করে প্রয়োগ করেননি। সেইসঙ্গে তাঁর নিজেরও বহু উক্তি প্রবাদ প্রতিম হয়ে উঠেছে। এমন করে নিজের সৃষ্টি ও সমাজে প্রচলিত প্রবাদ-প্রবচনের ব্যবহারে লালনগীতি দ্যুতিকান্ত ও শিল্পশ্রীমণ্ডিত হয়ে উঠেছে। লালন শাহের গানে এমন কতকগুলি চিরায়ত বাণী বা সূক্তি বিদ্যমান যা অনুভূতির গভীরতা ও ভাবমাধুর্যে অতুলনীয়। এই জাতীয় সুভাষিতের গৌরব তাঁর ভাবের ঐশ্বর্য, কেননা তা অনেকখানি ভাবরসকে স্ফটিকঘন ভাষায় প্রকাশে সক্ষম। এই সূক্তিগুলো যেন এক একটি মহামূল্য সমুজ্জ্বল হীরা, যার আলোকচ্ছটায় উদ্ভাসিত হয় দর্শন - কেন্দ্রিক নিবিড় জীবনরস। কিছু উদাহরণ তুলে দেখানো যেতে পারে লালন শাহের শৈল্পিক সৌন্দর্য। যেমন —

১) বনের আগুন সবে দেখে
মনের আগুন কেবা লখে।

২) চোরে যেমন চুরি করে
ধরে ফেললে দোষ পড়ে —
মারুফতি সেই প্রকারে
চোরা মালের তেজারতি।

৩) পিঁড়েয় বসে পেঁড়োর খবর
কেবা তারে দেয়।

৪) বিনা কর্মে ধন উপার্জন
কে করতে পারে।

৫) মারে মৎস্য না ছোঁয় পানি
হাওয়া ধরে বায় তরণী।

৬) করলি বহু পড়াশোনা
কাজের বেলায় ঝলসে কানা
কথায় চিড়ে ভেজে না
জল কিংবা দুধ না দিলে।।

৭) লোভে পাপ পাপে মরণ
তাও কি জান না রে মন।

৮) ভোগ করে ত্যাগ ভাল কথা
এ সংসারে কে করে তা

লালন বলে নাড়ী মাথা
আন্দাজে সবায়।।

৯) বোবায় কথা কয়
কালায় শুনতে পায়
আন্ধেলাতে পরখ করছে সোনা।।

১০) খেয়েছি বিজাতে[১] কচু না বুঝে।
এখন তেঁতুল কোথা পাই খুঁজে।।

১১) তিলকে তাল বাধায় হামেহাল
মনে মোর বাধায় তাল-কানা।

১২) বিন্দু মাঝে সিন্ধু বার
মাঝখানে তার শূন্য গিরি
অধর চাঁদের শূন্য পুরী
সেহি তো তিল প্রমাণ জাগায়।

১৩) সাপের মুখে নাচায় ব্যাঙা
সে বড় আজব রঙা।

১৪) বিনা মেঘে বর্ষে বারি
শুদ্ধ শাস্ত্র রসিক হলে
মর্ম জানে তারি।

১৫) কপাল বিমতি হলে
দুর্বো বনে বাঘে মারে।

১৬) পুরুষ ও প্রকৃতি স্মরণ
থাকতে কি হয় প্রেমের করণ
সিংহের দায় দিয়ে লালন
শৃগালের কাজ করে ফেরে।।

১৭) চিরদিন ইচ্ছা মনে
আল ডিঙিয়ে ঘাস খাব।

১৮) অনুরোধের কাজ দেখ ভাই
ঢেঁকি গেলার মতো
ওসে যায় না গেলা তলা গলা

ফেড়ে হয় সে হত।।

১৯) বিনে কাড়ির সদায় কেনা
মুখে আল্লার নাম জপনা

২০) সকলি কপালে করে
কপালের নাম গোপালচন্দ্র
কপালের নাম গুয়ে গোবরে।।

২১) বিনা মেঘে নীর বরিষণ
করিতে হয় তার অন্বেষণ
যাতে হল বিম্বুর গঠন
থাকিয়া আবিম্ব স্তম্ভবাসে।।

২২) তলে তলে তলগোজা খায়
লোকের কাছে সতী কওলায়।

২৩) সদরে সাজ করছ ভালো
পাছ বাড়ি তোর নেই বেড়া।

২৪) ভিতরে লালসার থলি
উপরে জল ঢালাঢালি।

২৫) শরিয়ত আর মারফত যেমন
দুগ্ধেতে মিশান মাখন
মাখন তুললে দুগ্ধ তখন
ঘোল বলে তা জানে সবায়।

২৬) মনটা যাতে রাজী হয়
প্রাণটা তাতে আপনি যায়
পাথর দেখে শোলার মতো
বেগার ঠেলা
ঢেঁকি গেলা
টাকশালে সই নয়তো।।

২৭) শুনতে নাই আন্দাজী কথা
বর্তমানে জানো হেথা।

২৮) অদৃশ্য ভজনা করা

অন্ধকারে সর্প ধরা।

২৯) দুগ্ধ জল মিশাইয়ে

বেছে খায় রাজহংস হলে।

উপরে যে সমস্ত প্রবাদ-প্রবচন বা জ্ঞানগর্ভ উক্তি উদ্ধার করা হয়েছে তার স্বরূপ বিচিত্র কখনো এই সমস্ত পরম্পরাক্রমে চলে আসা বাক্য বা কিংবদন্তীকে কবি অপরিবর্তিতরূপে' ব্যবহার করেছেন, আবার কখনো কবি তাকে আত্মসাৎ করে নবরূপে বিন্যস্ত করেছেন। যেমন — 'লোভে পাপ পাপে মরণ' বা 'মারে মৎস্য না ছোঁয় পানি' ইত্যাদি। এখানে প্রবাদ-প্রবচনের গঠনক্রম অপরিবর্তিত।

কিন্তু —

'খেয়েছি বিজাতে কচু না বুঝে

এখন তেঁতুল কোথা পাই খুঁজে।

— এখানে মূল প্রবাদ-প্রবচনকে (যেমন বুনো ওল তেমনি বাঘা তেঁতুল) কিছুটা পরিবর্তন বা রূপান্তরের মাধ্যমে নতুনরূপে কাব্যে স্থান দিয়েছেন কবি।

লালন গীতিতে আমরা যে অজস্র প্রবাদ-প্রবচন পাই তার গুরুত্ব নানাভাবে নির্ধারণ করা যায়। প্রথমত, লালনগীতির সুভাষিত কাব্যের দেহকে মধুর ও দ্যুতিময় করে তুলেছে। অর্থাৎ তা কাব্যের প্রসাধন কলার বৈভবকে বাড়িয়ে দিয়েছে। দ্বিতীয়ত, তা অনেকখানি ভাবরসকে স্ফটিকঘন ভাষায় প্রকাশ করতে সক্ষম। এগুলো অনুভূতির গভীরতায় ও ভাবমাধুর্যে অতুলনীয়। তৃতীয়ত, এই সমস্ত চিরায়ত বাণী বা সূক্তির মাধ্যমে উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছে দর্শনকেন্দ্রীত নিবিড় জীবনরস। অর্থাৎ এখানে বিধৃত আছে মানব জীবনের অভিজ্ঞতা ও গভীর জীবন জিজ্ঞাসা। তাছাড়া এই প্রবাদ-প্রবচনগুলি কালের চিহ্ন আপন অঙ্গে ধারণ করে মানুষের মুখে এখন জীবন্ত হয়ে আছে। তাই এক-একটি প্রবাদে লুকিয়ে আছে মানব সভাতার এক-একটি ইতিহাস।

এইভাবে বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে অসংখ্য প্রবাদ-প্রবচন সুভাষণের ব্যবহারে লালনগীতি যেমন হৃদয়বেদ্য ও মনোরম তেমনি হয়ে উঠেছে লাবণ্যময়, জ্যোতির্ময় এবং সত্য-শিব-সুন্দরের উপযুক্ত প্রকাশ মাধ্যম। ত্রিকালদর্শী মরমী কবি লালন এভাবেই লোককবি হয়েও যেন বিশ্বকবির উজ্জ্বল মহিমায় পৌঁছে গিয়েছেন। এখানেই লোককবি লালনের শ্রেষ্ঠত্ব।

আরো যেসব বিশিষ্ট গুণাবলী কবি লালনকে গৌরবের সর্বোচ্চ শিখরে পৌঁছে দিতে সহায়তা করেছে তা নিম্নরূপ হতে পারে :

১। হৃদয়ের গভীর অনুভূতি ও মননশীলতা লালন সঙ্গীতে সুন্দররূপে ফুটে উঠেছে। কবি যখন বলেন —

শিয়রে শমন বসে

কখন জানি বাঁধবে কসে

ভুলে রইলি বিষয় বিষে

দিশে হলো না।

— তখন আমাদের অনুভূতির জগতে, চেতনার জগতে আলোড়ন সৃষ্টি হয় এবং জাগতিক আসক্তি থেকে মুক্তি পেয়ে ঐশী জগতে উত্তরণের জন্য হৃদয় ব্যাকুল হয়ে ওঠে। এই অনুভূতির কাব্যিক ব্যঞ্জনা প্রকাশ পেয়েছে লালনের গানে।

২। প্রতিবেশ সৃষ্টি লালনগীতির একটি বিশেষ গুণ। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন —

"একাকী গায়কের নহে তো গান

গাইতে হবে দুই জনে

গাহিবে একজন খুলিয়া গলা

আর একজন গাবে মনে"।।

লালনের গানেও শিল্পী ও শ্রোতার এই সম্মিলনের প্রয়াস লক্ষ্য করা যায়। তিনি ভাবের নদীতে সুরের স্রোতে শ্রোতাকে ভাসিয়ে নিয়ে গিয়ে পরম প্রার্থীত মহাসমুদ্রে মিলিয়ে দিতে চেয়েছেন।

৩। নিঃসর্গ প্রীতি লালন সঙ্গীতকে মনোরম করে তুলেছে। সূর্য উঠলে পদ্ম প্রস্ফুটিত হয়, চাঁদের কিরণে কুমুদ বিকশিত হয়—নিঃসর্গের এই অপরূপ শোভা লালন সঙ্গীতে মরমী তত্ত্বকে কাব্যিক ব্যঞ্জনা দান করেছে। যেমন :

দেখে দিনমণির কিরণ

কমলিনীর প্রফুল্ল বদন

কিংবা,

নীচে পদ্ম-চরক বাণে

যুগল মিলন চাঁদ চকোরা

৪। লালন সঙ্গীত হ'ল মহামানবের মিলন তীর্থ, মানবতাবাদের অপূর্ব বিকাশ তার মধ্যে। মহাপ্রভু চৈতন্যদেব যেমন মুচি রামদাস থেকে যবন হরিদাস পর্যন্ত সকলকেই প্রেমদান করেছিলেন, লালনও তেমনি জাতি, ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে সমস্ত মানুষকে এক করে দেখতে চেয়েছেন। লালন জীবনবাদী কবি-ধর্ম নিরপেক্ষ কবি। এই জীব জগৎকে একই স্রষ্টার সৃষ্টি বলে মনে করেছেন তিনি। এই সমন্বয়ী অনুভূতির কাব্যিক প্রকাশ ঘটেছে লালন সঙ্গীতে। যেমন —

ক) মানুষ গুরু নিষ্ঠা যার, সর্ব সাধন সিদ্ধি তার।

খ) রাম রহিম করিম কালা এক আল্লাহ্ জগৎময়।

গ) জাত গেল জাত গেল ব'লে

একি আজব কারখানা

সত্য কাজে কেউ রাজি নয়

সব দেখি তানা-না না।

যখন তুমি ভবে এলে

কি জাত তুমি হ'য়ে এলে

যাবার বেলা কোন জাত হ'লে

সে কথা খুলে বল না।।

ব্রাহ্মণ শূদ্র যবন মুচি

এক জলে হয় সবার শুচি

দেখে শুনে হয় না রুচি

যম তো কারো ছাড়ে না।।

গোপনে কেউ বেশ্যার ভাত খায়

তাতে জাতির কি ক্ষতি হয়

লালন বলে জাত কারে কয়

ঐ ভ্রম তো আর গেল না।।

৫। লালন সঙ্গীত গীতিকবিতার স্তরে উন্নীত হয়েছে। আমরা দেখি রাধা কৃষ্ণকে পাবার জন্য আকুল হয়ে কেঁদেছে :

এন কেন কাঁদছ রাধা বসে নির্জনে।

ও রাধে, যেই কালে মান করেছিলে

সেই কথা তোর নেই মনে।।

— এখানে রাধার ব্যাকুলতার মধ্যে পরমাত্মাকে পাবার জন্য জীবাত্মার আগ্রহ প্রকাশ পেলেও গীতিকবিতার সুর ঝঙ্কার আমাদের মুগ্ধ করে।

৬। লালনের গানে আত্মনিবেদনের সুর কাব্যিক অভিব্যঞ্জনায় ব্যক্ত হয়েছে। যেমন —

"কোথায় হে দয়াল কাণ্ডারী।

এ ভব তরঙ্গে আমার দয়াল,

দাও দাও তোমার চরণ তরী।।

যত করি অপরাধ, তত ক্ষমা দাও হে নাথ,

পতিত পাবন নাম ধরেছে

এসে কিনাবে লাগাও তরী।।

তুমি হে করুণা সিন্ধু, অধম জনার বন্ধু

দাও হে তোমার পদার বিন্দু

যাতে তুফান তরীতে পারি।।

পাপি যদি না তরাবে, পতিত পবন নাম কে লবে,
জীবের ভাগ্যে আর কি হবে,
যাবে নামের মরম তোমারি।।
ডুবাও ভাসাও হাত তোমার,
এ জগতে কেউ নাই আমার,
ফকির লালন বলে দোহাই তোমার,
এসে চরণ স্থান দাও হে তরি।।

— এখানে চণ্ডীদাস বা বিদ্যাপতির আত্মনিবেদন বা প্রার্থনার মতোই লালনের শেষ প্রার্থনা কাব্য সুষমায় উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। এখানেই লোককবি লালনের মাহাত্ম্য।

পরিশিষ্ট : ক

'হিতকরী' পত্রিকায় লালন জীবনী :

কুষ্টিয়া লাহিনী পাড়া থেকে প্রকাশিত 'হিতকরী' পাক্ষিক পত্রিকার (১৮৯০ খ্রীস্টাব্দের ৩১ অক্টোবর) প্রথম ভাগ ১৩ শ সংখ্যাতে তিনটি সম্পাদকীয় নিবন্ধ প্রকাশিত হয়েছিল। পত্রিকাটির সম্পাদক ছিলেন মীর মশার্‌রফ হোসেন এবং তার সহ-সম্পাদক ও এজেন্ট ছিলেন রাইচরণ দাস (মতান্তরে বিশ্বাস)। মনে হয় রাইচরণ এই নিবন্ধটি লিখেছিলেন। এখানে লালনের জীবনী ও তথ্যবহুল নিদর্শন পাওয়া যায়। লালনের মৃত্যুর (১৮৯০ খ্রীস্টাব্দের ১৭ অক্টোবর) ১৪ দিনের মাথায় প্রকাশিত এই নিবন্ধটি লালন সম্পর্কে প্রকাশিত তথ্যাবলীর মধ্যে সর্বাপেক্ষা প্রাচীন। তাই লালন-চর্চা প্রসঙ্গে নিবন্ধটি অতি মূল্যবান। নিম্নে নিবন্ধটি তুলে দেওয়া হলো :

মহাত্মা লালন ফকির

''লালন ফকিরের নাম এ অঞ্চলে কাহারও শুনিতে বাকী নাই। শুধু এ অঞ্চলে কেন, পূর্বে চট্টগ্রাম, উত্তরে রঙ্গপুর, দক্ষিণে যশোহর এবং পশ্চিমে অনেক দূর পর্যন্ত বঙ্গদেশের ভিন্ন ভিন্ন স্থানে বহুসংখ্যক লোক এই লালন ফকিরের শিষ্য, শুনিতে পাই ইহার শিষ্য দশ হাজারের উপর। ইঁহাকে আমরা স্বচক্ষে দেখিয়াছি, আলাপ করিয়া বড়ই প্রীত হইয়াছি। কুষ্টিয়ার অনতিদূরে কালীগঙ্গার ধারে সেওরিয়া গ্রামে ইহার একটি সুন্দর আখড়া আছে। আখড়ায় ১৫/১৬ জনের অধিক শিষ্য নাই। শিষ্যদিগের মধ্যে শীতল ও ভোলাই নামক দুইজনকে ইনি ঔরসজাত পুত্রের ন্যায় স্নেহ করিতেন, অন্যান্য শিষ্যগণকে তিনি কম ভাল বাসিতেন না। শিষ্যদিগের মধ্যে তাঁহার ভালবাসার কোন বিশেষ তারতম্য থাকা সহজে প্রতীয়মান হইত না। আখড়ায় ইনি সস্ত্রীক বাস করিতেন, সম্প্রদায়ের ধর্ম্ম মতানুসারে ইহার কোন সন্তান-সন্ততি হয় নাই। এই আশ্চর্য ব্যাপার শুধু এই মহাত্মার শিষ্যগণের মধ্যে নহে বাউল সম্প্রদায়ের অধিকাংশ স্থানে এই ব্যাপার লক্ষিত হয়। সম্প্রতি সাধুসেবা বলিয়া এই মতের এক নূতন সম্প্রদায় সৃষ্টি হইয়াছে। সাধুসেবা হইতে লালনের শিষ্যগণের না হউক নিজের মত বিশ্বাস অনেকাংশে ভিন্ন ছিল। সাধুসেবা ও বাউলের দলে যে কলঙ্ক দেখিতে পাই, লালনের সম্প্রদায়ে সে প্রকার কিছু নাই। আমরা বিশ্বস্তসূত্রে জানিয়াছি সাধুসেবায় অনেক দুষ্টলোক যোগ দিয়া কেবল স্ত্রীলোকদিগের সহিত কুৎসিত কার্যে লিপ্ত হয় এবং তাহাই তাহাদের উদ্দেশ্য বলিয়া বোধ হয়। মতে মূলে তাহার সহিত ঐক্য থাকিলেও সম্প্রদায়ের তাদৃশ ব্যভিচার নাই। পরদার ইহাদের পক্ষে মহাপাপ। তবে প্রত্যেক সৎ নিয়মের ন্যায় ইহারও অপব্যবহার থাকা অসম্ভব নহে। বাউল, সাধুসেবা এবং লালনের মতে এবং বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের কোন শ্রেণীতে যে একটি গুহ্য ব্যাপার চলিয়া আসিতেছে লালনের দলে তাহাই প্রচলিত থাকায় ইহাদের সন্তান জননের পথ এককালে রুদ্ধ। 'শান্ত-রতি' শব্দের বৈষ্ণব শাস্ত্রে যে উৎকৃষ্ট ভাব বুঝায় ইহারা তাহা না বুঝিয়া অস্বাভাবিক প্রক্রিয়ায় ইন্দ্রিয় সেবায় রত থাকে। এই জঘন্য ব্যাপারে এ দেশ ছারখারে যাইতেছে, তৎসম্বন্ধে পাঠকবর্গকে বেশী কিছু জানাইতে স্পৃহা নাই।

শিষ্যদিগের ও তাঁহার সম্প্রদায়ের এই মত ধরিয়া লালন ফকিরের বিচার হইতে পারে না, তিনি এ সকল নীচ কার্য্য হইতে দূরে ছিলেন ও ধর্ম-জীবনে বিলক্ষণ উন্নত ছিলেন বলিয়া বোধ হয়। মিথ্যা জুয়াচুরিকে লালন ফকির বড়ই ঘৃণা করিতেন। নিজে লেখাপড়া জানিতেন না। কিন্তু তাঁহার রচিত অসংখ্য গান শুনিলে তাঁহাকে পরম পণ্ডিত বলিয়া বোধ হয়। তিনি কোন শাস্ত্রই পড়েন নাই, কিন্তু ধর্মালাপে তাঁহাকে বিলক্ষণ শাস্ত্রবিদ বলিয়া বোধ হইত। বাস্তবিক ধর্মসাধনে তাঁহার অন্তর্দৃষ্টি খুলিয়া যাওয়ায় ধর্মের সারতত্ত্ব তাঁহার জানিবার অবশিষ্ট ছিল না। লালন নিজে কোন সাম্প্রদায়িক ধর্মাবলম্বী ছিলেন না, অথচ সকল ধর্মের লোকেই তাঁহাকে আপন বালিয়া জানিত। মুসলমানদিগের সহিত তাঁহার আহার-ব্যবহার থাকাতে অনেকে তাহাকে মুসলমান মনে করিত, বৈষ্ণব ধর্মের মত পোষণ করিতেন দেখিয়া হিন্দুরা তাঁহাকে বৈষ্ণব ঠাওরাইত। জাতিভেদ মানিতেন না, নিরাকার পরমেশ্বরে বিশ্বাস দেখিয়া ব্রাহ্মদিগের মনে ইঁহাকে ব্রাহ্ম ধর্মাবলম্বী বলিয়া ভ্রম হওয়া আশ্চর্য্য নহে, কিন্তু ইহাকে ব্রাহ্ম বলিবার উপায় নাই, ইনি বড় গুরুবাদ পোষণ করিতেন। অধিক কি ইহার শিষ্যগণ ইহার উপাসনা ব্যতীত আর কারও উপাসনা শ্রেষ্ঠ বলিয়া মানিত না। সর্বদা 'সাঞ' এই কথা তাহাদের মুখে শুনিতে পাওয়া যায়। ইনি নামাজ করিতেন না। সুতরাং মুসলমান কি প্রকারে বলা যায়? তবে জাতিভেদ বিহীন অভিনব বৈষ্ণব বলা যাইতে পারে; বৈষ্ণব ধর্মের দিকে ইঁহার অধিক টান, শ্রীকৃষ্ণের অবতার বিশ্বাস করিতেন। কিন্তু সময় সময় যে উচ্চ সাধনের কথা ইহার মুখে শুনা যাইত, তাহাতে তাঁহার মত ও সাধন সম্বন্ধে অনেক সন্দেহ উপস্থিত হইত। যাহা হউক তিনি একজন পরম ধার্মিক ও সাধু ছিলেন, তৎসম্বন্ধে কাহারও মতভেদ নাই। লালন ফকির নাম শুনিয়াই হয়ত অনেকে মনে করিতে পারেন ইনি বিষয়হীন ফকির ছিলেন। বস্তুতঃ তাহা নহে, ইনি সংসারী ছিলেন, সামান্য জোতজমা আছে, বাটী-ঘরও মন্দ নহে। জিনিসপত্রও মধ্যবর্তী গৃহস্থের মত। নগদ টাকা প্রায় ২ হাজার রাখিয়া মরিয়া যান। ইহার সম্পত্তির কতক তাঁহার স্ত্রী, কতক ধর্মকন্যা, কতক শীতলকে ও কতক সৎকার্য্যে প্রয়োগের জন্য ইনি একখানি চরম পত্র করিয়া গিয়াছেন। ইনি নিজে শেষকালে কিছু উপায় করিতে পারিতেন না। শিষ্যেরাই ইঁহাকে যথেষ্ট সাহায্য করিত। বৎসর অন্তে শীতকালে একটি ভাণ্ডার (মহোৎসব) দিতেন। তাহাতে সহস্রাধিক শিষ্যগণ ও সম্প্রদায়ের লোক একত্রিত হইয়া সংগীত ও আলোচনা হইত। তাহাতে তাঁহার ৫/৬ শত টাকা ব্যয় হইত।

ইঁহার জীবনী লিখিবার কোন উপকরণ পাওয়া কঠিন। নিজে কিছুই বলিতেন না। শিষ্যেরা হয়ত তাঁহার নিষেধক্রমে না হয় অজ্ঞতাবশতঃ কিছুই বলিতে পারে না, তবে সাধারণে প্রকাশ লালন ফকির জাতিতে কায়স্থ ছিলেন। কুষ্টিয়ার অধীন চাপড়া ভৌমিক বংশীয়েরা ইঁহার জ্ঞাতি। ইঁহার কোন আত্মীয় জীবিত নাই। ইনি নাকি তীর্থগমনকালে পথে বসন্তরোগে আক্রান্ত হইয়া সঙ্গিগণ কর্তৃক পরিতক্ত হয়েন। মুমূর্ষু অবস্থায় একটি মুসলমানের দয়া ও আশ্রয়ে জীবন লাভ করিয়া ফকির হয়েন। ইহার মুখে বসন্ত রোগের দাগ বিদ্যমান ছিল। ইনি ১১৬ বৎসর বয়সে গত ১৭ই অক্টোবর শুক্রবার প্রাতে মানবলীলা সম্বরণ করিয়াছেন। এই বয়সেও তিনি অশ্বারোহণ করিতে দক্ষ ছিলেন এবং অশ্বারোহণেও স্থানে স্থানে যাইতেন। মৃত্যুর প্রায় একমাস পূর্ব হইতে ইঁহার পেটের ব্যারাম হয় ও হাত পায়ের গ্রন্থি জলস্ফীত হয়। দুধ ভিন্ন পীড়িত অবস্থায় অন্য কিছু খাইতেন না। মাছ খাইতে চাহিতেন। পীড়িত কালেও পরমেশ্বরের পথ পূর্ববৎ সাধন করিতেন, মধ্যে মধ্যে গানে উন্মত্ত হইতেন। ধর্মের আলাপ পাইলে নববলে বলীয়ান হইয়া রোগ যাতনা

ভুলিয়া যাইতেন, এই সময়ের রচিত কয়েকটি গান আমাদের নিকট আছে। অনেক সম্প্রদায়ের লোক ইঁহার সহিত ধর্মালাপ করিয়া তৃপ্ত হইতেন। মরণের পূর্ব রাত্রিতেও প্রায় সমস্ত রাত গান করিয়া রাত্রি ৫টার সময় শিষ্যগণকে বলেন 'আমি চললাম।' ইহার কিয়ৎকাল পরে শ্বাস রোধ হয়। মৃত্যুকালে কোনো সম্প্রদায়ী মতানুসারে তাঁহার অন্তিম কার্য্য সম্পন্ন হওয়া তাঁহার অভিপ্রায় ও উপদেশ ছিল না। তজ্জন্য মোল্লা বা পুরোহিত কিছুই লাগে নাই। গঙ্গাজল, হরে রাম নামও দরকার (হয়) নাই। হরিনাম কীর্তন হইয়াছিল। তাঁহারই উপদেশ অনুসারে আখড়ার মধ্যে একটি ঘরের ভিতর তাঁহার সমাধি হইয়াছে। শ্রাদ্ধাদি কিছুই হইবে না। বাউল সম্প্রদায় লইয়া মহোৎসব হইবে। তাহার জন্য শিষ্যমণ্ডলী অর্থ সংগ্রহ করিতেছেন। শিষ্যদিগের মধ্যে শীতল, মহরম সা, মাণিক সা ও কুধু সা প্রভৃতি কয়েকজন ভাল লোক আছেন। ভরসা করি, ইহাদের দ্বারা তাঁহার গৌরব নষ্ট হইবে না, লালন ফকিরের অসংখ্য গান সর্বত্র সর্বদাই গীত হইয়া থাকে। তাহাতেই তাঁহার নাম, ধর্ম, মত ও বিশ্বাস সুপ্রচারিত হইবে। তাঁহার রচিত গান নিম্নে উদ্ধৃত করা গেল।

গান

সব লোকে কয় লালন কি জাত সংসারে,
লালন ভাবে জাতের কি রূপ দেখ্‌লেম না এই নজরে।

১। কেউ মালায় কেউ তছবি গলায়,
তইতে যে জাত ভিন্ন বলায়,
যাওয়া কিম্বা আসার বেলায়
যাতের চিহ্ন বয় কার রে।।

২। যদি ছুন্নত দিলে হয় মুসলমান,
নারীর তবে কি হয় বিধান,
বামন চিনি পৈতা প্রমাণ,
বামনি চিনি কিসে রে।।

৩। জগৎ বেড়ে জেতের কথা,
লোকে গৌরব করে যথা তথা,
লালন সে জেতের ফাতা,
ঘুচিয়াছে সাধ বাজারে।।

পরিশিষ্ট : খ

দুদ্দু শাহ রচিত লালন-জীবনী : এই জীবনী এস.এম. লুৎফর রহমান ১৩৭১ সালের মাঘ মাসে মরহুম শাহ্ লতীফ আফি-আন্‌হুর কাছ থেকে নকল করার জন্য সংগ্রহ করেন এবং তাঁরই অনুমতিতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের মুখপত্র 'সাহিত্য পত্রিকা'য় প্রকাশ করেন (বর্ষা সংখ্যা, ১৩৭৪; জুন, ১৯৬৭)। এটি ১৪৭ চরণের কলমী পুঁথি। এই পুঁথিটির প্রামাণিকতা বিষয়ে সংশয় প্রকাশ করেছেন সুধীর চক্রবর্তী। বিশিষ্ট লালন গবেষক আবুল আহসান চৌধুরী ২২শে জানুয়ারি ১৯৯২ তারিখে সুধীর বাবুকে একটি চিঠিতে জানিয়েছেন যে, প্রবীণ বাউলতাত্ত্বিক ও লালনপন্থী সাধু যশোর জেলাধীন মাগুরার (এখন জেলা) কবিরাজ মনোরঞ্জন বসু তাঁকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে (১৭ অক্টোবর ১৯৯১) স্বীকার করেছেন, তাঁর বন্ধু শাহ আবদুল লতীফ আফি-আনহু আবিষ্কৃত (?) দুদ্দু শাহের লালনজীবনীর পুঁথি জাল। "পুঁথিটি রচনার কৃতিত্ব আফি-আনহুর। বিশেষ উদ্দেশ্য সাধনের জন্যই এটি তৈরি করা হয়।"[১] প্রবীণ বাউল ফকিরদের মধ্যে কেউই এই পুঁথি সম্বন্ধীয় গল্প বিশ্বাস করেন না।

যাই হোক, দুদ্দু শাহ বিরচিত লালন জীবনীটি, আমরা হুবহু তুলে দিলাম :

"মানুষ গুরু লালন সাই দরবেশের চরণ সহায়"

ধন্য ধন্য মহামানুষ দয়াল লালন সাই
পতিত জনার বন্ধু তাঁর গুণ গাই।
জাতি ধর্ম শাস্ত্র আদি মীমাংসা করিয়া,
নবসত্য প্রকাশিল মানব লাগিয়া।।
আমার দয়াল মুরশীদ কৃপা প্রকাশিয়া
তাঁর আত্ম কথা কিছু গিয়াছে বলিয়া।
তাঁর মহা আত্ম কথা আমি কি জানিব
যার কথা সে যদি না কয় কিসে প্রকাশিব।।
আলম ডাঙ্গা গ্রামে শুকুর সা'র আশ্রমে
আরজি করিনু আমি অতিব নির্জ্জনে।
দয়াল দরদি সাই করুণা করিয়া,
কহ কিছু আত্ম কথা এ দাসে বুঝাইয়া।
এত শুনি দয়াল সাই মোর পানে চায়,
মৃদু হাসি এই দাসে যাহা কিছু কয়।।
বহু দিন সেই কথা রাখিনু ঢাকিয়া
সাইজির ছিল মানা নাহি প্রকাশিবা।
নাহি জানি কবে আমি যাইব চলিয়া
তাঁর আত্ম কথা যাইবে গোপন হইয়া

এ কারনে শেষ কালে লঙ্গি তাঁর বাণী
একান্ত বিনয়ে লিখি তাঁর জীবনী।।
মুখ্‌তাছার তার কিছু বর্ণনা করিব
তাঁহার চরণ মূলে ফানা হয়ে যাব
এগারশো উন আশী কার্ত্তিকের পহেলা
হরিশ পুর গ্রামে সাই'র আগমন হইলা।।
যশোহর জেলাধিন ঝিনাইদহ কয়,
উক্ত মহকুমাধিন হরিশপুর হয়।
গোলাম কাদের হন দাদাজি তাঁহার।
বংশ পরম্পরা বাস হরিশপুর মাঝার।।
দরীবুল্লাহ্ দেওয়ান তাঁর আব্বাজির নাম
আমিনা খাতুন মাতা এবে প্রকাশিলাম।
শিশুকালে সাই জিরে তাঁরা ছাড়ি গেলা
অনাথ হইল চাঁদ বিধাতার খেলা।। (১/৩৩)
এমনিই নিদান কালে বৈশাখ মাসেতে,
আন মনে একাকী সে রহে ব'সে পথে।
সাইজির লীলা খেলা কে বুঝিতে পারে
সিরাজ সা দরবেশে দেখে নিল তাঁরে ঘরে।।
কুলবাড়ী হরিশপুরে সিরাজ সা'র বাস,
পাল্কী টানিয়া করে জীবিকার অন্বাষ।
কালক্রমে সাই তারে বায়াৎ করিল,
মানুষ তত্ত্বাদি সব বুঝাইয়া দিল।
ছাব্বিশ বৎসর যবে বয়স তাঁহার,
উহারাও ছাড়ি গেল নিজ ঘর।
এমনিই কিশোর কালে ফকিরের বেশে,
নবদ্বীপ ধামে গিয়া আপনি প্রকাশে।।
পদ্মাবতী নামে এক বিধবা রমণী।
নিজাবাসে ল'য়ে গেল সেহি ক্ষত্র ধনী।
পদ্মাবতীর গৃহে কিছুকাল যায়।
একদিন যান এক পণ্ডিত সভায়।।
পণ্ডিত মণ্ডলী তাঁরে বিবিধ পুছিল।
সাইজি নাম ধাম সকলি বলিল।।
সেবার সময় হইল পণ্ডিত সভায়।
যবন বলিয়া দূরে সেবা দেয় তাঁর।।
সাইর লীলা কিছু মাত্র বুঝা নাহি যায়।

প্রতি এক জনার মাঝে লালনে দেখায়।।
উহা দেখি পণ্ডিতগণ চমকিত হইল।
সবে ভাবে মনে মনে কোন জন আইল।।
ছলিতে আইল বুঝি গৌরাঙ্গ সুজন।
দূরে রেখে সেবা দিনু কাহারে এখন।।
তখনি সকলে মিলি গৌরধ্বনি করে।
কর জোড়ে নতশিরে দুটী পদ ধরে।।
মিনতি করিয়া কাঁদে দয়াল গোসাই।
মোদের ছলিতে এলে মোরা বুঝি নাই।
ক্ষমা কর দীন বন্ধু পাতকী জনারে।
গড়াগড়ি যায় আর এ মত ফুকারে।। (২/৬৫)
তখনই দয়াল সাই বুঝাইয়া বলে,
বিভিন্নতা করিও না জাতিধর্ম্ম বলে।
আলেখ অধর সেই দয়াময় সাই।
সৃষ্টি স্থিতি জুড়ে তার জাতি গোত্র নাই।।
জাতি ধর্ম কুলগোত্র মানুষের সৃজন,
ভিন্ন বলে কিছু আমি দেখি না কখন।
সকল জনার মাঝে একই সেই ঈশ্বর
নানা স্থানে নানা রূপে করেন বিহার।।
এই মতে একে একে নানা মহা লীলা,
কাশী বৃন্দাবন ধামে গিয়া প্রকাশিলা।
যুগ অবতার বলি সর্ব্বভক্তগণ।
করিতে লাগিল তাঁর চরণ বন্দন।।
হেনকালে একদিন খেঁতরি গেরামে।
উপনীত হইলেন ভ্রমণ কারণে।
তথা হইতে নৌকা যোগে ভ্রমণ কারণ।
দক্ষিণ পূর্ব্ব দেশে করিলেন গমন।।
কি জানি কেমনে তিনি বসন্ত ব্যাধিতে
আক্রান্ত হইলে তাঁরে ফেলায় নদীতে।
ভক্ত বৃন্দ নাহি ছিল সঙ্গেতে তাহার
মাঝিগণ ফেলে তাঁরে দরিয়া মাঝার।।
ভাসিতে ভাসিতে তিনি কালীগঙ্গা তীরে।
ছেউড়িয়া গ্রামের পাশে এক ঘাট ধারে।।
ভাসিতে ছিলেন যবে অচেতন হালতে।
দেখি পরমাত্মা ভাই মলম নামেতে।।

সযতনে তুলে আনে আপনার ঘরে।
দুগ্ধ আদি নানা পথ্য দিয়া সেবা করে।।
এই রূপে একমাস গুজারিয়া যায়।
ব্যাধিমুক্ত হন তিনি খোদার কৃপায়।।
একদা মলম মম পরমাত্মা ভাই।
অমন ভক্ত পদে প্রণাম জানাই।।
নিজমনে তেলাওত করেন কোরয়ান।
সাই ভুল ধরি তারে করেন ফরমান।। (৩/৯৫)
কি পড় কোরআন মিঞা এত ভুল করি।
শুনিয়া মলম ভাই পুলকিত ভারি।।
মিষ্ট বচনে তবে তাঁহারে শুধায়।
কি করে জানিলে তুমি পাঠে ভ্রান্তি হয়।।
এত শুনি সাই তারে বোঝাইয়া দিল।
নাহি জানি লেখাপড়া ইহাই বলিল।।
দয়াল মুরশীদ মোরে লাদুন্নির জ্ঞান।
কিঞ্চিত দিয়াছে তায় করিনু বয়ান।।
এই ভাবে দিনে দিনে দিনগত হইল।
মলম সা ভাই তারে গুরু করে নিল।।
বাড়ীর দক্ষিণ দিকে তেঁতুল তলায়।
আস্তানা করিয়া দিল মুরশীদ সেবায়।।
স্বামী স্ত্রী দুইজনে তাহার কদমে।
হাজের হইয়া রহে হুজুরী মোকামে।।
তখন তাহার বয়স তেতাল্লিশ হইল।
চারিদিক হইতে বহু ভক্ত জুটিল।।
নানা দেশ হতে শেষে আসে নানাজন।
তর্ক করিতে কেহ করে আগমন।।
চক্কর ফক্কর আর মাণিক মলম।
কোরবান মনিরুদ্দিন আসে কত জন।।
কতজন ছিল মোর প্রভুর গোলাম।
কি কব তাদের পদে হাজার সালাম।।
বাহাছ করিতে গিয়া বায়াৎ হইনু।
আমি অতি অভাজন লালনসাই বিনু।।
বারশত পচানব্বই বাঙ্গালা সনেতে
পহেলা কার্ত্তিক শুক্রবার দিবা অন্তে।।
সবারে কাঁদায়ে মোর প্রাণের দয়াল।
ওফাৎ পাইল মোদের করিয়া পাগল।।
মো অধমে বাবা বলে কে আর ডাকিবে।

আমার এই দীন মুখে চুম্বন করিবে।।
অমন মধুর বাণী কে আর শোনাবে।
আরকি ছেঁউড়িয়া ধামে করুণা বর্ষিবে?
চাঁদের বাজার কে গো মিলাইবে আর।
হিন্দু মুছলমান সবে করে হা হা কার।।
আমি দীন দুদ্দু নাম দ্বীনের অধিন।
সারা অঙ্গে আজু মোর আজারির চিন।। (৪/১৩১)
বেলতলা হরিশপুরে জনম আলয়।
কেহ কেহ কুল বাড়ী হরিশপুর কয়।।
শাস্ত্র ধর্ম তীর্থ আদি সর্ব্ব প্রবচন।
সকল ছাড়িয়া দিলেন মানুষ ভজন।।
বস্তু ছাড়া নাহি আর আল্লা কিংবা হরি।
এহি মত দেখ সবে নর বস্তু ধরি।।
যাহা বুঝিয়াছি আমি তাঁহার কৃপায়।
কাহারে বুঝাব উহা অধর কোথায়।।
রজঃ বীর্য্য এই দুই বস্তু যেবা চিনে।
লালন সাইজিকে সেই জন জানে।।
মানুষ অবতার সাই তাহার মহিমা।
কি বলিব আমি হীন নাই তার সীমা।।
ওলিয়ে আরেফ্ সাই বাঙ্গালা দেশেতে।
দীনহীন দুদ্দু ভণে তাঁহার কৃপাতে।।
দয়াল মুরশীদ সাই আল্লাহু আলেখ্।
যারে ধ'রে মিলিয়াছে বরজখ্ ছালেক।। (৫/১৪৭)

সন ১৩০৩ সাল ১লা
বার্ষিক অধিবাস ছেঁউড়িয়া
থানা ভালুকা জেলা নদীয়া (৫/১৫০)

পরিশিষ্ট : গ

মৌলবী আবদুল ওয়ালী রচিত ইংরেজী প্রবন্ধে লালন পরিচিতি : ১৮৯৮ সালের ৩০শে নভেম্বরে মৌলবী আবদুল ওয়ালী 'On some curious Tenets and practices of a certain class of Fakirs of Bengal' শিরোনামে একটি প্রবন্ধ পাঠ করেন বোম্বাইয়ের অ্যানথ্রোপলজিকাল সোসাইটিতে। পরবর্তীকালে ১৯০০ সালে সোসাইটির ৫ম খণ্ড, ৪র্থ সংখ্যা জার্নালে মুদ্রিত হয়। আবদুল ওয়ালী জানিয়েছেন—

"I regret that a considerable portion of this paper describing the secret acts of the devotees was found unsuited for this Journal, and consequently not published."

—তাই মূল প্রবন্ধের আংশিকই জার্নালে মুদ্রিত হয়েছিল। নিম্নে আমরা তা উদ্ধৃত করে দিলাম :

THE JOURNAL
OF THE
ANTHROPOLOGICAL SOCIETY
OF
BOMBAY

ORDINARY GENERAL MEETING, held on Wednesday, the 30th November 1898.

Lieutenant-Colonel G. WATERS, I. M. S., President, took the chair.

The following paper was then read :

On CURIOUS TENETS *and* PRACTICES *of a* CERTAIN CLASS *of* *FAQIRS in* BENGAL.

By MAULAVI ABDUL WALI, Member, Asiatic Society of Bengal, Sailkupa, District Jessore.

Preliminary

In the Districts of the 24-Parganas, Nadia, Jessore and Pabna mendicants is to be seen who are called by different names, and whose secular habits, unshaven hair, and repulsive manners are as much a curiosity to a stranger, as the rigid secrecy they maintain with regard to their tenets and practices is inexplicable. What these men believed and practiced are only known to the members of the "mystic cult," but never to others, –even to those intimately connected with them. My attention to them was attracted first in this way. I had in my employ a servant aged apparently 22, who had been suffering from intestine cholic, which had reduced him to a mere skeleton. He tried several medicines while in my

employ, and after he had left it, with no effect. Tnose who are acquinted with the disease, can testify that it is very hard to cure, and baffles the skill of physicians. For a time I did not see the young man. Inquiry revealed that a Faqir–commonly called Nara'r Faqir–had cured him of the malady. When I next saw him. I found him a new man–hale, hearty, and robust. I tried my best to have a talk with the Faqir, and to procure from all other sources information regarding the mode of the treatment, and the medicines used. But beyond the fact that they can cure all diseases that flesh is heir to, I could gather no useful information. Several persons who had seceded from the tenets of these Faqirs, and also some of their disciples were approached through a man, which gave me for the first time a glimpse into their secret life. But the information, though correct, was of a fragmentary nature, and required further investigation and confirmation. The Faqirs would in no case meet me, the books and tracts written by them were all composed in their own "mystic language," and the refutations of some of them were written by men without any knowledge and insight into their character. Such being the case, I despaired of adding to my scanty knowledge as to their abominable character and habits. The songs of Lalan Shah, Siraj Shah, and other Faqirs, sung by boat-men and others, were very good in their own way, but did not solve the mystery.

Fortunately, I then met with a Bengali work entitled "The Manaranjan Ucit Katha...[1] The Author Qazi Karamat-u-llah of 24-Parganas District–mentions, in chapter 1 of his book how be first became the disciple of a renowned Faqir, and how through him came to know the secrets of this class of men. At first he would not disclose anything, but the author continuing to visit him, day after day, was only able, after a vow of secrecy, to learn from him the outward signs of the "cult." But persisting for long years, and after being subjected to various unplesant trials, he became possesed of the "secret" of the so-called holy men, including the mystic formula. He learnt from nine other Faqirs various other details. The beliefs and practices, state by the enthusiastic Qazi, are substantially the same that were disclosed to me by my informants. The author has, it is to be regretted, huddled together all his informations, and out of religious zeal, destroyed the harmony of description by adding his own reflections. Some of his statements are vague and lacking clearness. But our thanks are due to a man, who in this prosaic age, and malarious Bengal, should try to add to our knowledge of a sect whose beliefs and practices are a sealed book to all those who are outside their pale, and who though recruited from the lower order of society– comprising Hindus, Musalmans, and others–are only known by their healing art, delightful songs, peculiar habits, and periodical festivities, but none has suspected them to be secretly and from unknown generations pursuing a life of abomination, of guilt, of shame, and of filth, for the purpose of subverting the existing

order of things. The learned author of the "Dabastan-i-Mazahib," Mirza Muhsin-i-Fani, some 250 years ago, endeavoured to learn the beliefs and practices of various sects by enlisting himself as such, but he was a Panjab Muhammadan, while the author of the *Ucit Katha* is a plain Bengal Musalman of our own times.

I do not think myself qualified to discuss here the origin of these so-called holy persons. they may be a sect of Caktas and Baisnavas, as most of the beliefs and practices of the sect mentioned in the Dabastan-i-Mazahib, and other works in Sanskrit are identical with the beliefs and practices of these classes of devotees.

The cult and their beliefs

In north Jessore, and the greater part of Nadiya, these devotees are called Naras,[2] Kalas,[3] or simply Darvishes. In the district of the 24-Parganas their beliefs are called "Faqiri Mat."

The real Faqirs, they say, are Aul, Baul, Darvish, Sain.

"Aule Faqir Allah, Baule Mahammad.
Darvish Adam Safi ei tak had
Tin Mat ek sat kariya je Ali
Prakac Kariya dilo Sainmat bali."

It is not clear what is meant by the words, Aul,[4] Baul.[5] and Sain.[6] But the abvoe verse signifies that God, Muhammad and Adam are respectively Aul, Baul, and Darvish. 'Ali founded the fourth sect–Sain–out of the first three. There are several other sub-divisions, e.g., Carva-tyagi. Mlecha, Ghospara'r-mat, pagaler-mat, Karta bhaja. Satighar'er-Madari, &c., &c.

There are diverse opinions and practices prevalent among these mendicants. But they allegeth at although they differ in many things, the mode and manner of their attaining the end are the same. There is only one belief and different kinds of Jajan, all aiming at the same end.

The illiterate, the lowly Hindus and Muhammadans are the classes from among whom these Faqirs and mendicants are generally recruited,

although Brahmans and others are sometimes found among their votaries. [7]

Music in which they excel, and which they much practice, is one of their chief instruments of winning the hearts. Women–generally widowed, out-casted, and falledn of any pursuasion–generally widowed, out-casted, and fallen of any pursuasion–are their next instrument.[8] They are expert medicine men, and are generally seen curing those maladies which generally baffle the ingenuity of ordinary doctors of medicine. Through their healing art they gain disciples! For example, a man who happens to be the disciple of a Faqir encounters a man suffering from a severe disease. He gives him his secret advice, and perhaps pills, and teaches him how to sing and pray. As soon as the patient feels better, his devotion and belief increase. Then the Guru, or the principlal Faqir, is invited, a Sadhusebagiven, and a few men are entertained according to the means of the patient. In this way, and through the instrumentality of the above three things, disciples are gained.

So For as I am aware, these beliefs arfe formerly confined to a class of Hindu Tantiris and Bairagis of the Baule order, but since a period of 30 or 40 years men of other castes, e.g., Musalmans of the lower order, are believing in their satanic beliefs. Inwardly and outwardly they are the same–Hindu and Muhammadan prayer words are used in their worship.

There is a common bond of fraternity and sympathy among them, although to different castes or creeds they might have orginally belonged.

It is curious that those Faqirs who would call themselves out wardly Musalmans do not believe in Islam or say their prayers according to the Islamic tenets. If a Maulavi happens to go to them, they would talk as if they were true believers. They deny having belonged to the sect of Nara or Kala and similar order sects. They say, they belong to the Muhammadan creed–of Shari'at, Tariqat, Haqiqat, and M'arfat. From these have sprung up seven other classes, e.g., Nara Kala Chedi, and Maya (Woman) &c., A beginner, they say, has to conform to the outward practices of the religion (Shari'at), but gradually as he improves, he abandons his former beliefs, and learns to be a true devotee (Ma'rfati Faqir). Some say their originators were 'Ali and Fatima. They do not beget children, as they consider themselves dead men–the dead have no children.

Currously enough these Faqirs trace their spiritual succession to the recognised Muhammadan orders of Cishtiya. Qudiriya Naqshbandiva,

Muj..ddadiya & c., in order. I daresay, to beguile the unwary or perhaps, as they like, to include themselves in those orders. These devotees cite as their guides Christ, Mosses, Abraham, Muhammad, Krisna and others, and interpret their actions and beliefs according to their own, and often invent things never said or done by them.

As will be explained hereafter, the chief and only means of their attaining the end are through *woman*, who is the middle of the earth, the mother of mankind. A woman is at once a wife, a sister, and a mother. With the aid of Yoga and Yugal, ganja, and bhang, eating and drinking, music and their special services and prayers, these human brutes try to get their *material* god, attain superhuman power, and acquire spiritualism. According to them, all the current opinions, religious, moral, social, and individual are radically defective and wrong.

They argue thus :– Whatever that is in the universe is in the human body. So it is necessary to make love with the human body. The Murshid, Guru or Spiritual-guide is to be found in it. He can only be found through *woman*. The temple of God is said to be in the *middle* of the earth, but, in fact, that temple is in the centre of the human body. God is present everywhere, and in everything. So to sanetify one thing, and to abuse the other, to eat some as clean, and to reject others as unholy, are not proper. Nay the very things rejected as unholy and unclean ought to be partaken of in preference to the other things because man's body is unholy, and unless *unholy* is mixed with unholy, man does not attain spiritualism. When a fan is used in winnowing the rice, the *real thing* may be thrown away with the refuse. Nothing that comes forth from the human body should be thrown away or looked down upon – e.g., a big net is as much necessary to catch big fish as small nets to secure small ones, so one thing is as much necessary as the other. Nothing is superfluous, and nothing should be cultivated, and through which only the whereabout of the Murshid may be traced.

Again :– The ordinary Quran is in 30 sections, but the remaining 10 sections are with the Faqirs. It is not written but the heart communicates its contents. Within the heart rise billows. To know oneself is – the Faqiri. In the unwritten scripture of the mind we have faith, and not in the written Quran. It is of no use to pray or to fast without knowing the secrets of the life. So we sing deho-tatva (on the secrets of the life). We make the milk sour, in order to convert it into *ghi* (clarified butter). We pursue a different course from the ordinary religions to arrive at the desired end. The prayers and fastings prescribed by the ordenary religions are not the means to the end. If one can prostrate *once* only and fast *a day* in appropriate time. It will suffice in one's life. That time is known to the devotees. Who have no faith in outward prayer. If one's mind is fixed,

there is no necessity to pray and fast.

Water, fire (sun), earth, and wind are man's common property – they give benefit to *all*, irrespective of caste, creed, and colour. So the devotees never distinguish between man and man as well as between men of different presuasions. If the believer be a true devotee, although outwardly a Hindu, or a Muhammadan, or a Christian, he will shape his course according to his cardinal belief's, and not to the outward garments.

They periodically give feasts, in which a large number of the devotees are invited. The host and hostess receive every guest with due reverence. Their feet are washed as they arrive, and they are then conducted to their seats on the arms of the host or hostess or their friends according to the sex of the arrivals.

Fish, vegetables, and sweets are consumed ganja and bhang freely smoked, mystic songs sung, and musical instruments, such as Saringi, Dugdugi, and Khunjuri are struck and played upon. In this Mahatsab – or Sadhu-Seba, as it is called – the devotees, in their mystic language, discuss their secret actions as to how much each of them may have acquired spiritualism or sanctity. It is, however, often seen that they pick up quarrels and nearly come to blows. Men and women of this class never eat meat, and refrain from the food touched, or plates and cooking-utensils used by someone else.

As I have said these sectaries guard their beliefs and practices with rigid secrecy, and so avoid meeting with men of culture, education, and birth. They work among the unlettered and lowly, and men, who believe, in fact, in no faith, or order of religion.

The first and preliminary injunctions they give to the would be disciple are to doff the ordinary dress, to don Gerue-basan,[10] Kapni,[11] or khilka,[12] to wear iron *bala* (bracelet) on the wrist, not to shave and let the hair grow, not to put on shoes made of leather, to provide himself with a rosary, and a long smoking-pipe, a *cimta* or pair of pincers for taking fire, to drink water out of karwa or kisti, to give up prayer (namaz and fasting), to use narcotic drugs, bhang and ganja, and to recite or repeat their mystic formula many times as an act of worship.

Centain terms and practices explained.

The following facts and technical terms are worth recollecting in order to fully understand some of their secret and other acts.

The *sun* means father; and the *moon* mother. In a week, four days – Sunday, Tuesday, Thurday, and Saturday – are sacred to the sun; and three days – Monday, Wednesday, and Friday – are sacred to the moon. The day is to be reckoned from the night, i.e., day follows night.

From both the nostrils the sun's and the moon's rays pass (flow) regularly – from the right hole pass the sun's rays, and one moon's day, the moon's rays are to be secured (by arresting the breath of the right or left nostril, as the case may be), and the appropriate mystic formulax repeated.

Bhajan means *bacan*, or mystic formula, or enchant, or repeat them, to pray : *Sadhan* is to eat or drink, and also to worship. Bhajan increases *bhakti* or devotion; Sadhan strenght. One can never become a devotee unless one gives up rank, family distinction, and fear, or practices *bhajan sadhan*.

The devotees meet on Saturday night at a pleace – akhra, – with musical instruments, bhang, ganja and liquor. Men and women in the midst of nareoties and music commence reeiting the mystic formula many times. Thus by the commingling of many minds *bhajan* is accomplished.

They say that the mind connot be fixed without nareoties and intoxicating liquor; and no orison or bhajan is of any efficacy without the mind being steady or fixed. Religious men do not allow these things, but the people by fixing their mind may tread the right path. There is nothing unclean, except the man's fleash. So that if any one may have no means – ganja only will suffice to attain his objects.

The Muhammadan devotees (those who outwardly profess Muhammadanism),. I am told, repeat in prayer (bhajan) the Muhammadan recognised formula. This they do only outwardly; but in reality their practices are as depraved and immoral as those of the others.

They offer prayer in the evening, middle of the night, or end of it, either seated, or walking. The evening prayer, if offered seated, is called *Daira*, and if offered walding *Dairacalti*, *Similary*, the nocturnal prayers, that are offered in the middle or end of the night, are called respectively *Daira* and *Paira-calti*, as they are offered seated or walking.

Six kinds of prayer words are known to the author of the *Ucit-Katha*. They are repeated in the way the devotees are seen to – that is, the words are recited with long accents, while the body is rocking to and fro, the head moving, and the locks of the head violently struck on the ground. Every day each word should be repeated not less than a hundred times.

Healing Congregation

For the advent of the spirit, the devotees place upon a *piri* (stool) a small jar of water covered with a piece of cloth, along with betelleaf, betel-nut, paddy, durva grass (*panicum dactylon*), mango twig, sweet-

meat, and an asan (seat). This done, the head medicant stands facing the above articles with a piece of cloth round his neck (a sign of supplication), prostrates himself and strikes his forehead on the ground, while repeating the following eight names mentally Ma-khaki, Bana-Brahma, Bisnu, Mahadeva, Bhagavati Ma-kali Ma-Barkat, Baba-Paighambar." Then holding his breath, and with folded hands he looks towards the light and repeats mentally the following verse, each time prefixing these four names, "Ma-khaki, Mahadeva, Ma-Bhagavati, Ma-kali."

Eirogi'r karan asan kari, tomar pristher upar.

Cighra kari ei rag tule lao dohai tomar' Allah'r

Translation.

I take my seat on account of this patient on your back; take away the disease immediately, I appeal to your god.

The congregation of devotees also sing various tie melodies, e.g.,

Guru deo dekha dina-hine.
Ami parechi go tufane
Kripa kari ei nibare,
Baso ese hridasane,
Se je akul pathar
Ami kemane habo par
Tomar nija-gune daya kare
Guru par kare nyao adhine.
Cankate parechi ami.
Kripa dristi kara tumi.
Tumi na tarale ami.
Par haibo kemane.
Hae tabo smranagato.
Dakitechi avirato.
Duhkha kena deogo eto.
Aci pare Cricarane.

Translation

Guru! show yourself to this humble individual; I am in the midst of a tempest. *Kindly at this juncture* (?) come and sit on my breast. It is a wide ocean, how shall I be able to pass over it ? Kindly through your own amiable disposition. O Guru! take my humble self over the ocean. I am placed in a critical position, look to me with compassion; unless you save me, how shall I be able to get over (the ocean)? Being devoted to you, I am ever at your feet.

At this stage lo! the spirit with his hosts arrive. The congregation of devotees at the height of ecstasy, and at their instance, the patient and his relatives, continue making them low obeisances, Seeing the spirit, the devotees consider themselves very holy, and believe the spirit to be – God Himself. The head mendicant then tells the patient, "Look, thou art cured, what dost thou want to eat?" The patient then recovers health, and gets to eat whatever he likes.

For the recovery of the patient, all classes of devotees hold congregations, only *the secret* words are different with each class. Having furnished the *asan* (or seat) if the *bhajan* be enchanted while looking steadfastly towards the flames of the burning lamp, all sorts of illness will go. If the patient be suffering from *delirium*, a new earthen pitcher should be procured, and filled up with water, and the same *bhajan* blown with mouth into it. The patient will see his own image in the water. The more do they indulge in tobacco, ganja bhang, and pan, the speedier will be the recovery. Here is some of the *secret words.*

According to the tenets of that class of the mendicants known as "Pagal" – and who belive in.

"Murshid satya. Mursider bakya satya, Apanar hjajanar katha, kahio na jatha tatha. Apanar apani hushiyar."

The following words (bhajan) should be repeated both by male and female devotees, for unless both be of the same mind, no good will come out of it – and blown with the mouth on the water, and given to the patient to drink, the patient will be cured of his disease.

"Udui Brahma, Fatima, Hakdin, Qudrat sain toma bai ar dhyan nai, Murshid satya, Murshid satya."

Also during night after smoking ganja and bhang, when the mind becomes light (nirmal, or transparent), both the eyes should be shut, the figure of the Murshid meditated upon, and the above bhajan repeated, then the figure of the Murshid will be visible. This is the *mawakkil* who will tell everything, and through him one will be aware of what is right and what is wrong. When the mind would become vacant, and wandering through the influence of narcotics, the devotee should pronounce in mind, "Ya-rab ghani. Ya-rab ghani," meditate the spiritual guide, and sing mystic songs (bhajan bakya). By this means is man saved in this world, and the world to come.

This is a mystic verse.

Murshid deo dekha nijgune.
Ami pare achi Cricarane.
Hae sakha deogo dekha.
Ogo paine keno Sadhane
Bhabanadi karte par.

Toma bine naiko ar.
Daya karo Murshid amar.
Ami achi base sadhane.
Bhaba nadir tufan bhari.
Dubitese deho tari.
Par karogo O kandari.
Dublo tari tufan'e.

Translation.

Murshid (guide) give me a visit through your amiable disposition. I am lying at your feet. Show yourself to me as a friend. Oh! why do I not get you, although I worship you. There is none but you to ferry me across the river of life. Have mercy on me, my Guide. I am (ever) in your contemplation. The hurricane of the river of life is severe, the corporal boat is sinking; carry me across it. O ye pilot 1 the boat is about to go down.

The "secret words" according to the "Sati ghare'r mat" are these :–

Guru[13] satya. Thakur satya, Hari satya,
Tomar anga'te byamaho mukta
And according to "Madari mat"
"Niharan nihara, Silla o misbe.[14]

This is the "secret words" of those professing "M'arfat" mat" –

M hi rra ni ma ha rra hi lla me s be

which apears to be the converse of Bismilia-hir Rahmanir Rahim.

The devotees allege that there is only one belief, but different sorts of *Yajan*; one practices one kind of *bhajan*, the other a different kind, but all aiming at the same end.

Those Faqirs who practice "*panca-ras*" with yugal can accomplish whatever they wish, and they remain secure from evils, As soon as a patient is approached by one of them, the disease flees from fear on seeing him, saying :– "That sinner, and profligate and heretical man has eaten so many tilthy things, that his body and tongue have become unclean. If he will blow from his mouth on the body of this patient. I too shall become unclean. Again, he has with him in *kautas* (small wooden boxes) yog-dhara things, Lal Yaturmukh, and Garam candra, pills, which if given to the patient, his future will be ruined, and I shall never be able to come again to this unhold body. So let me go." The patient at once recovers and is given milk, curd, and butter-milk as diet.

· Khak-Sadhan.

Whenever the devotees happen to go to any place or congregate into a new spot, they worship (Sadhan) or propitiate the earth, so that no evil may happen, by reciting the folloing formula :–

Bismillah, Bismillah, ma Basamata.[15]

Tumi amar ma, ami tomar beta

Jaha karo ma basta basa mata.

Translation

In the name of God, in the name of God, Mather Earth! you are my mother, I am your son. Whatever you may do, Mother! you are really basamata.

Appendix.

There are several renowned devotees and Faqirs who are considered to be good and pious men. They possess some sort of learning. Their poetical *stanzas* are not only melodious but expressive of their own secret beliefs. They are enchanted accompanied by musical instruments, or without them, by male and female devotees. They are sung too by others – often without musical instruments.

The author of the "Ucit Katha" mentions several Faqirs. One is Shah Shir' Ali – probably of the 24 parganas District – who has written the following works :– "Shah Shir 'Ali," "Qaulil 'Arifin," "Ramzul 'Arifan," "Najatul shar a," all in Bengali. In Qaulil ' Arifin occur Aribic traditions, presian poems, Rekhta and osta Ghazals, and mystic.dhuya songs.

Budhu Shuh – probably of the same locality – is the author of "Maula-i-Maula," "Jalsa Namah," "Didar-i-Hahi," "Bidaril Ashiqin." In the first named work is mentioned the story of Krisna and his 1600, Milkminds. He writes, "Strike and seize, eat and take, and banish the world away."

Shir 'Alo in a song says, "Ki hale acho man ki range bhule, bina bastu khele kathai kiphate." Mind! how thou art, and why so forgetful of thy mission; on good will result from (mere) words unless the "bastu" (thing) is eaten," Again, "Ajapa[16] jap kara japana." "Worship that which is ajapa."

Here is one of his songs :–

"Sur Baul."

Purnima'rcad dharbi kere[17]

Tora dekh ceye tribini'r uttar dakhin

Rabi caci tar dui kenare,
Baper ghare rabir kiran
Cacir ghare mar darcan
Tora dekhre pele habi Sujan
Bachadhan tai cine nere
Ki kare cini cakkare
Udar bhare a aksare
Tore ruhinir cad, dharbi jadi
Phad pat-le hridai-pure
Shaha Shir Alir hridai pure.
Kene roecho Ghumer ghare
O tor premer cakse dekhna cae
Tor nagar cad nagarer pare.

Translation

Who among you are going to catch the full-moon. Look well to the north and south of the tribini (meeting of three rivers) the sun and the moon are on (its) either sides. The sun's rays are in the abode of the father, (While) the mother can be met within the abode of the moon. If thou couldst see (? them) thou wouldst be good-natured. Dear children so try to know (? them). What is sugar to it; one becomes satiated (the stomach becomes full) with half a letter (of it). If thou art willing to catch the "moon of Ruhini," set the snare in the abode of heart (hridaipur), in the hridaipur belonging to Shah Shir Ali. Why art thou in the abode of the sleep, O look! with thine eyes of love, thy nagar cad (wicked one, or gallant) is in the city.

Another renowned and the most melodious versifier, whose "dhuyas" are the rage of the lower classes, and sung by boatmen and others, was the far famed "Lalan Shah." He was a disciple of "Siraj Shah" and both were born at the village Harispur, sub-division Jhenedah, District Jessore. Having travelled long and made pilgrimages to Jagannath and other shrines, and met with all sorts of devotees, he at last settled at Mauza Siuriya, near the Sub-divisional head-quarter of Kushtiya (Nadia). Here he lived, feasted, sang, and worshipped and was known as a kayastha, and where he died some ten years ago.

It is to be regretted that both the author of the "Ucit Katha" as well as myself have got our information through men who outwardly profess Muhammadanism. Hence, most of the songs and phrases used are Muhammadan rather than Hindu. The so-called Musalman Faqirs when speaking to another Musalman try their best to argue against Islam, and to misinterpret or misquote passages in support of their doctrines.